اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দ্বীন ও দুনিয়া (২)

ভলিউম-৬

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আজীজ
প্রাক্তন মোদার্‌রেস, আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা, বড় কাটরা, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

সূচী-পত্র

—×—

আলেম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনী আলেমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ওয়ায খোর্জা জনাব হেকমতুল্লাহ্ খান সাহেবের বাংলাতে ৮ই জমাদিউস্সানী ১৩৩০ হিঃ রবিবার প্রায় দুইশত শ্রোতার উপস্থিতিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। ইহা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। মাওলানা ছায়ীদ আহ্মদ ছাহেব থানবী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

খোদাতা'আলা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি এই জন্য দিয়াছেন, যাহাতে সে পরিণামের কথা চিন্তা করিতে পারে। দুনিয়াতে থাকা নিশ্চিত নহে; তাসত্ত্বেও দুনিয়ার কাজ-কর্মে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। পক্ষান্তরে আখেরাতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আখেরাতের পরিণামের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু আফসোস, আমরা আখেরাত হইতে এত বেশী গাফেল যে, উহা স্মরণেই আসে না।

بسم الله الرحمن الرحيم ○

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم -

اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى - ادعوا ربكم تضرعا وخفية ط انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ط ان رحمت الله قريب من المحسنين *

আয়াতের অর্থঃ গোপনে ও অনুনয় সহকারে তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট দোআ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তোমরা পৃথিবীর সংস্কারের পর উহাতে ফাসাদ ছড়াইও না এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত সৎকর্মীদের নিকটবর্তী।

॥ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্তা ॥

এক্ষণে যদিও আমি দুইটি আয়াত তেলাওয়াৎ করিয়াছি। ইহাতে সকলেই হয় তো ইহাদের তফ্‌সীর শুনিতে চাহিবেন। কিন্তু এখন এই আয়াতের মধ্য হইতে মাত্র একটি অংশ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সেই অংশটি হইল— لا تفسدوا في الارض ইহা হইতে একটি দাবী বাহির করিব এবং পূর্বাপর বর্ণনাকে সেই দাবীর সমর্থকরূপে প্রতিপন্ন করিব। তাছাড়া পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারা এই দাবীর দলীলও উপস্থিত করিব।

যে দাবীটি প্রমাণিত করিব, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও একেবারে সত্য, পরিচিত ও বাস্তবসম্মত হইবে। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, দাবীটি পূর্ব হইতেই সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল; কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য না করার দরুন তাহা সর্বজন স্বীকৃত থাকে নাই। শুধু তাহাই নহে, কেহ কেহ ইহার বিপরীতেও দাবী করিতে শুরু করিয়াছে'। কিন্তু সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, দাবীটি একেবারেই স্বভাবসম্মত। আলেমদের নিকট তাহা স্বভাবসম্মত হওয়া তো স্বীকৃতই; তথাকথিত যুক্তিবাদিগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাসত্ত্বেও আমি এই দাবীটিকে বিস্ময়কর বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। কারণ, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বহু সংখ্যক লোক ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বয়ং এই দাবীটিই আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহার বিপরীত দাবীটিই আকায়েদ তথা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু উহা সর্বসাধারণের মনোভাবের পরিপন্থী এবং বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত; এই কারণে এই দাবীটি আজকাল বিস্ময়কর হইয়াছে।

এই দাবীটি হইল একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীতে কাহার সত্তা সবচাইতে বেশী প্রয়োজনীয়? এই প্রয়োজনও দুনিয়ার দিক দিয়া—যাহা সকলের মনঃপুত ও অভীষ্ট। ধর্মের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় বলা হয় নাই—যাহা সকলেই ছাড়িতে বসিয়াছে। এই বর্ণনার ফলে প্রশ্নটি সকলের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হইবে। তাহারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিবে যে, সাংসারিক মঙ্গলের জন্যও সবচেয়ে বেশী জরুরী—এই বিষয়টি কি হইতে পারে?

॥ সাধারণের দৃষ্টিতে আলেম সম্প্রদায় ॥

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হইল আলেম সম্প্রদায়ের সত্তা। এই দাবীটি যে সাধারণের মনোভাবের খেলাফ, তাহা কাহারও অজানা নাই। কেননা, সাধারণতঃ সকলেই তাহাদিগকে নিষ্কর্মা মনে করে। যাহারা একটু স্পষ্টভাষী, তাহারা পরিষ্কার বলে যে, এই সম্প্রদায়টি এতই নিষ্কর্মা

যে, তাহারা অন্যদিগকেও নিষ্কর্মা বানাইয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভদ্রতা প্রদর্শন করে, তাহারা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে এইরূপ না বলিলেও তাহাদের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করার লক্ষণাদি দেখা যায়। ফলে তাহারাও আলেমদের সম্পর্কে কার্যতঃ ঐ দাবীই করে। কার্যতঃ দাবী মৌখিক দাবী হইতেও জোরদার হইয়া থাকে।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি মুখে বলিল, আমি পানি পান করিব; কিন্তু অপর ব্যক্তি কোনকিছু না বলিয়া পানি পান করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখে যদিও পানি পান করার দাবী করে নাই; কিন্তু তাহার কাজ প্রথম ব্যক্তির মৌখিক দাবীর তুলনায় বেশী জোরের সহিত তাহার দাবীকে প্রমাণিত করিতেছে। আলেম সম্প্রদায় নিষ্কর্মা বলিয়া যাহারা মনে মনে বিশ্বাস করে, তাহাদের লক্ষণ এই যে, তাহারা এই সম্প্রদায় হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে, তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া পছন্দ করিবে না; বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে অন্যান্যকেও নিষেধ করিবে।

এখন লক্ষ্য করুন, সমসাময়িক যুক্তিবাদীদের মধ্যে এইসব লক্ষণ পাওয়া যায় কি না। ইহা জানা কথা যে, তাহাদের মধ্যে এই সব লক্ষণ পাওয়া যায়। এই কারণেই আমি বলি যে, সাধারণ লোক ব্যাপক ভাবেই আলেম সম্প্রদায়কে অকেজো মনে করে। ফলে তাহাদেরই সত্তা সবচেয়ে বেশী জরুরী বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা রীতিমত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

॥ একটি ভুল বুঝাবুঝির নিরসন ॥

এক্ষণে আমি উপরোক্ত দাবী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব; কিন্তু তৎপূর্বে আতঙ্ক দুর করার উদ্দেশ্যে আরও একটি কথা বলিতে চাই। তাহা এই যে, দাবীটি প্রমাণ করার পিছনে আমার লক্ষ্য এই নয় যে, সকলেই মৌলবী হইয়া যাউক। এই সম্প্রদায়টি সবচেয়ে জরুরী—ইহা শুনিয়া কাহারও মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, এখনই সকলকে মৌলবী হইয়া যাইতে বলা হইবে। তাই মনের এই খট্‌কা দূরীকরণার্থে প্রথমেই বলিতেছি যে, আমার এহেন উদ্দেশ্য নাই।

আমার উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি সম্প্রদায় থাকা উচিত এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখা অন্যান্য সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে শ্রোতাদের মনের আতঙ্কভাব দুর হইয়া যাওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যেককেই মৌলবী বানাইবার চেষ্টা করা হইতেছে না। শুধু এতটুকু সংস্কার করা হইতেছে যে, এই দলটিকে অনর্থক মনে করিবেন না। ইহাতে নিজেদের কোন কাজ, কোন উন্নতি কিংবা কোন চাকুরী নকরীর ব্যাঘাত হইবে না। হাঁ, আপনি যে ভুল ধারণায় পতিত ছিলেন তাহা দুর হইয়া যাইবে। তাছাড়া আপনি বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের বরকত হইতে যে বঞ্চিত

আছেন, যখন তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, তখন আপনি তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইবেন। তবে বর্তমান অবস্থা ও এই অবস্থার মধ্যে একটি পার্থক্য অবশ্যই থাকিবে। আপনি উহাকে সাংসারিক ক্ষতি কিংবা উন্নতি বোধ মনে করিলে করিতে পারেন। পার্থক্য এই যে, বর্তমানে আপনি খোদায়ী দণ্ডবিধির অনেকগুলি অপরাধে লিপ্ত রহিয়াছেন। আলেমদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলে তাহা থাকিবে না। এক্ষণে আপনি ইহাকে ক্ষতি মনে করুন কিংবা লাভ। আপনার অভ্যাসও পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। তবে খুবই নম্রতা ও ধীরতার সহিত।

ইহার প্রমাণ এই যে, কেহ কোন অপরাধে লিপ্ত হইলে বিবেক বলে যে, অনতিবিলম্বে অপরাধটি ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু শরীয়তের নিয়ম-কানুন কোন কোন গোনাহ্ তথা অপরাধ সম্বন্ধে এরূপ বলে যে, উহা দ্রুততার সহিত ত্যাগ করিও না ; বরং প্রথমে উহার বিকল্প পন্থা অবলম্বন করিয়া লও, অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে গোনাহ্‌গার মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। অন্য ব্যবস্থা হইলে গোনাহ্‌র কাজটি ত্যাগ কর। জিজ্ঞাসা করি, দুনিয়ার কোন আইনে এত সহজ নির্দেশ আছে কি ? খোদার কসম, শরীয়তের সৌন্দর্য ও মেহেরবানীর কথা ভাবিলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখে এই কবিতা উচ্চারিত হইয়া যায় :

ز فرق تا به قدم هر کجا که می نگرم + کرشمه دامن دل میکشد که جا اینجا ست

(যে ফরক তা কদম হরকুজা কেহ্ মী নেগারাম
কেরেশমা দামানে দিল মীকাশাদ কেহ্ জা ইঁজা আস্ত)

'অর্থাৎ, মাথা হইতে পা পর্যন্ত যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, তাহার সৌন্দর্য অন্তরের আঁচলকে টানিয়া বলে যে, ইহাই প্রকৃত স্থান।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ শরীয়তকে কখনও তথ্যানুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখে নাই। ফলে তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা একটি রক্ত পিপাসু দৈত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বন্ধুগণ, শরীয়ত আপনার সাহায্য করে। এমনকি, কোন কোন অপরাধের বেলায়ও। যেমন নাজায়েয চাকুরীতে এই অনুমতি রহিয়াছে যে, বর্তমানে অন্য ব্যবস্থা না হইলে এবং জীবিকার অন্য কোন উপায় না থাকিলে প্রথমে অন্য ব্যবস্থা করিবে অতঃপর উহা ত্যাগ করিবে। এরপরও শরীয়ত দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইলে তাহার দায়িত্ব আমাদের নহে।

মোটকথা, এল্‌ম ও আলেমদের সহিত মেশামেশি থাকিলে কোন সাংসারিক প্রয়োজন বা মঙ্গল নষ্ট হইয়া যায় না। শুধু অন্যায় কাজ-কর্মের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তাহাও অতি সহজ উপায়ে। আমি বলিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক রাখিলে এই ক্ষতি হইবে যে, গোনাহ্‌র অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে— আমার এই উক্তি কোন একজন কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তির ন্যায় :

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ + بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

'বহু লস্করের সহিত তরবারি চালনার কারণে তাহাদের তরবারিতে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে—উহা ছাড়া তাহাদের আর কোন দোষ নাই।'

যাক, ইহা একটি অতিরিক্ত কথা হইল। এখন ঐ দাবী আরম্ভ করিতেছি এবং সতর্কতার জন্য আবার বলিয়া দিতেছি যে, আপনি ইহাতে সকলকে মৌলবী বানানো উদ্দেশ্য ভাবিয়া আতঙ্কিত হইবেন না। আমি কখনই সকলকে মৌলবী বানাইতে চাই না। তবে আলেমগণ নিষ্কর্মা বলিয়া আপনি যে ভুল বিশ্বাস পোষণ করেন, তাহা পরিবর্তন করিতে চাই মাত্র। বাস্তবিকই আমাদের যুক্তিবাদীদের অধিকাংশই মনে করে যে, প্রথমতঃ ব্যাপকভাবে আলেম সম্প্রদায় দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষাদান কার্যে রত আছেন, সকলেই নিরেট বেকার ও নিষ্কর্মা লোক। যাহারা ওয়ায করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ কেহ কাজের লোক মনে করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে কাজটি সর্বাধিক জরুরী, উহাকেই সবচেয়ে বেশী অনর্থক মনে করা হয়।

বন্ধুগণ, আপনাদের দেশবাসী হিন্দু সম্প্রদায় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, শিক্ষা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে তাহাদের প্রচুর সংখ্যক লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কারণ, অন্যান্য সকল বিভাগই ইহার শাখা। কাজেই শিক্ষা বিভাগে প্রভাব বিস্তার করা জাতীয় উন্নতির উপায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমরা আজ পর্যন্তও ইহার খবর রাখি না। অথচ নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করিতেছি। অন্যান্য কাজের তুলনায় শিক্ষার মর্যাদা গাড়ীর ইঞ্জিনের চাকার ন্যায়। ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিলে সমস্ত গাড়ীই চলিতে থাকে এবং ইহা থামিয়া গেলে সমস্ত গাড়ীই থামিয়া যায়, তা সত্ত্বেও মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই জন্য উপলব্ধি করিতে পারে না যে, যে বস্তুর উপর অন্যান্য কাজকর্ম নির্ভরশীল, উহা প্রায়ই অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং। ইহার উপর ঘড়ির কার্যকারিতা নির্ভরশীল। মূর্খ ব্যক্তি ঘড়ি দেখিলেই মনে করে যে, ঘন্টার কাঁটাই ইহার আসল বস্তু। কিন্তু ঘড়ির স্বরূপ সম্বন্ধে যাহারা অবগত, তাহারা জানে যে, ঘন্টার কাঁটার গতি সম্পূর্ণরূপে হেয়ার স্প্রিংয়ের উপর নির্ভরশীল। হেয়ার স্প্রিং থামিয়া গেলে ঘন্টার কাঁটা একবারও নড়াচড়া করিতে পারিবে না।

তেমনিভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সকল বিভাগের প্রাণ। বক্তৃতা, লেখা, পুস্তক রচনা ইত্যাদি সমস্তই উহার শাখা। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে উহাকেই সবচেয়ে বেশী অনর্থক মনে করা হয়। ইহার লক্ষণ এই যে, সাধারণতঃ জনসাধারণের দৃষ্টিতে আলেমদের গুরুত্ব কম। এই লক্ষণেরও বড় লক্ষণ এই যে, আপন সন্তানদের জন্য

এলমে দ্বীন কমই মনোনীত করা হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাদ্রাসায় চাঁদাও দেয় এবং দ্বীনী মাদ্রাসার আবশ্যকতা মৌখিকভাবে স্বীকারও করে। এজন্য মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের খুব শুক্‌রিয়াও আদায় করে—যাহাতে তাহারা আরও বেশী আকৃষ্ট হয়; কিন্তু বাস্তব পক্ষে মাদ্রাসাসমূহের প্রতি তাহাদের মোটেই আন্তরিক আকর্ষণ নাই।

॥ দারিদ্র্যের গুরুত্ব ॥

বন্ধুগণ, মনের আকর্ষণ কাহাকে বলে, তাহা হুযুর (দঃ)-এর কাজ হইতে বুঝুন। দারিদ্র্য ছিল তাঁহার প্রিয় বস্তু। তিনি আপন সন্তানদের বেলায়ও ইহা কথায় ও কাজে অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন। কথায় এইভাবে অবলম্বন করিয়াছেন যে, তিনি খোদার দরবারে দোআ করিয়াছেন : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا 'আল্লাহ্! মোহাম্মদের সন্তানদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী রিয্‌ক নির্দিষ্ট করুন।' কাজে অবলম্বন করা একটি ঘটনা দ্বারা জানা যায়।

পরিবারের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন হুযূর (দঃ)-এর সবচাইতে বেশী প্রিয়তমা। তাঁহাকে দেখিলেই স্নেহ মমতার আতিশয্যে হুযূর (দঃ) দাঁড়াইয়া পড়িতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : سيدة نساء اهل الجنة فاطمة رض 'জান্নাতে মহিলাদের নেত্রী হইবেন ফাতেমা (রাঃ)।' একবার হযরত আলী (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হুযূর (দঃ) বলিয়াছিলেন : يوذيني ما اذاها 'ফাতেমার জন্য যে বিষয় কষ্টজনক, আমার জন্যও তাহা কষ্টজনক।' এত আদরের দুলালীর একবার যাঁতাকল চালাইতে চালাইতে হাতে ফোস্‌কা পড়িয়া যায়। আজকাল মহিলাদের জন্য যাঁতাকল চালানো খুবই নিন্দনীয় মনে করা হয়। আমি আমার পরিবারের মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, যুবতী মেয়েদের দ্বারা যাঁতাকল চালাও। আজকাল অধিকাংশ ধনী পরিবারের মধ্যে অসুখ-বিসুখ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ স্বাস্থ্যের ন্যায় খোদার অমূল্য নেয়ামত যাহার নাই; তাহার ধনী হওয়ার মূল্যই বা কি? ধনীদের এইসব অসুখ-বিসুখের মূলে হইল তাহাদের আরামপ্রিয়তা। কাজেই পরিবারের মেয়েদিগকে উপরোক্তরূপ পরামর্শ দেওয়ায় কেহ কেহ বলিল, খোদা না করুন, তুমি এরূপ অমঙ্গল চিন্তা কর কেন? এমন কি আমরা এত বড় লোক হইয়াছি যে, আমেদের অধিকাংশ মেয়েরা চরকায় সূতাকাটা একেবারেই ত্যাগ করিয়া দিয়াছে।

আমাদের দেশের জনৈকা মহিলা চরকায় সূতা কাটিতেছিল। তখন তাহার শ্বাশুড়ী পরলোকগতা ছিল। ফলে অন্য কোন মহিলা শোক প্রকাশের জন্য তথায় আগমন করিলে শব্দ পাইতেই সে চরকা উঠাইয়া অস্থির অবস্থায় অন্য কক্ষে নিক্ষেপ

করতঃ তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করিয়া দিল—যাহাতে আগন্তুকা মহিলা চরকার কথা জানিতে না পারে।

মোটকথা, হযরত ফাতেমার হাতে ফোস্‌কা পড়িয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হুযুর (দঃ)-এর নিকট হইতে কোন একটি বাঁদী বা গোলাম চাহিয়া আন। সে তোমার কাজের সাহায্য করিতে পারিবে। সেমতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) আপন কাজ সহজ করা কিংবা স্বামীর আদেশ পালনার্থে হুযুরের বাসগৃহে গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি হযরত আয়েশার নিকট আপন মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিয়া চলিয়া আসিলেন। হুযুর (দঃ) বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিলে হযরত আয়েশার মুখে সবকিছু শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত ফাতেমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত ফাতেমা তখন শায়িতা ছিলেন। পিতাকে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি উঠিতে লাগিলে হুযুর (দঃ) বলিলেন: উঠিবার দরকার নাই—শুইয়া থাক। মোটকথা, তিনি পিতাকে আবার মনোবাঞ্ছা জানাইলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন: যদি বল, গোলাম কিংবা বাঁদী দিতে পারি। আর যদি বল, এরচেয়ে উত্তম বস্তুও দিতে পারি। ইহা শুনিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঐ উত্তম বস্তুটি কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না; বরং তৎক্ষণাৎ আরয করিলেন: উত্তম বস্তুটিই দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যহ শয়নের সময় سبحان الله (সোবহানাল্লাহ্) ৩৩ বার, الحمد لله (আলহামদু লিল্লাহ্) ৩৩ বার এবং الله اكبر (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পাঠ করিও। ইহা গোলাম ও বাঁদী হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। খোদার বাঁদী ফাতেমা (রাঃ) সানন্দে ইহা গ্রহণ করিয়া লইলেন।

দেখুন, হুযুর (দঃ) নিজে দারিদ্র্য পছন্দ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন সন্তানদের জন্যও তাহা পছন্দ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। এছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার বংশধরের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা হালাল নহে। তিনি কি এমন কোন আইন রচনা করিতে পারিতেন না, যাহার ফলে সমস্ত টাকা-পয়সা শুধু তাঁহাদের হাতেই যাইত? কিন্তু হুযুর (দঃ) তাহা করেন নাই। ইহাকেই বলে মনের আকর্ষণ।

॥ ধর্মের প্রতি বিমুখতা ॥

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যাহারা মাদ্রাসায় চাঁদা দেন, তাঁহারা আপন সন্তানদের জন্যও কি কোন সময় এই শিক্ষা পছন্দ করিয়াছেন? আজকালকার অবস্থা শুনুন। রামপুর রাজ্যের জনৈক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে পরামর্শ দেয় যে, আপনার যে ছেলেটি কোরআন পড়িতেছে, তাহাকে ইংরেজী শিক্ষায় ভর্তি করিয়া দিন। বন্ধু বলিল, কোরআন খতম হইলে ইংরেজীতে ভর্তি করা যাইবে। প্রশ্ন হইল, কোরআন

কতটুকু পড়া হইয়াছে এবং কত দিনে হইয়াছে ? উত্তর হইল, দুই বৎসরে আধা কোরআন হইয়া গিয়াছে। বন্ধুবর বলিলেন, দুইটি বৎসর তো অনর্থক নষ্ট করিলেন। বাকী আরও দুই বৎসর কেন নষ্ট করিতে চান ? বন্ধুগণ, সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, খোদাকে স্বীকার করে, আখেরাত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—এরপরও মনে এইরূপ ভাব এবং মুখে এইরকম বিধর্মীসুলভ উক্তি !

জনৈক ধার্মিক দার্শনিকের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি জনৈক বিবর্তনবাদ বিশ্বাসী ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন, দার্শনিক ডারউইন খোদায় বিশ্বাসী ছিল না। কাজেই বিবর্তনবাদ স্বীকার করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল। যে বিষয়ে সে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে সে অনুমানের উপর মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিল। মানব সৃষ্টিও একটি বিরাট ঘটনা। এসম্বন্ধেও তাহাকে একটি মতবাদ কায়েম করিতে হইল। কাজেই সৃষ্টিকর্তা অস্বীকার করার পর বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদায় বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে এই অনুমানের উপর চলিবার প্রয়োজন কি ? সে যদি বলিয়া দেয় যে, মানুষকে খোদা পয়দা করিয়াছেন, তবে তাহাতে আপত্তি কি ? সুতরাং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার পর বিবর্তনবাদ স্বীকার করা খুবই অযৌক্তিক ব্যাপার।

তদ্রূপ আমিও বলি যে, যে ব্যক্তি আখেরাত স্বীকার করে না, তাহার পক্ষে কোরআন শিক্ষাকে অনর্থক ও 'সময় নষ্ট করা' বলিয়া অভিহিত করা আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মুখ হইতে এই ধরণের উক্তি নির্গত হওয়া যারপরনাই উদ্ভট বলিয়া মনে হয়। আখেরাত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিলে কি কোরআন শিক্ষার কোন ফল পাওয়া যাইবে না ?

॥ আখেরাতের চিন্তার আবশ্যকতা ॥

বন্ধুগণ, পরিণাম চিন্তা করার জন্যই খোদা তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করিয়াছেন। লেখাপড়া করিলে ডেপুটি কালেক্টর হওয়া যাইবে—এই পরিণামটি যেমন চিন্তার যোগ্য, তেমনি আখেরাতে কি হইবে, তাহাও গভীরভাবে চিন্তা করার যোগ্য। মৃত্যুর পর কোন পরিণাম নাই—এরূপ বিশ্বাস থাকিলে আপনার সহিত কোন কথাই নাই। তবে যেহেতু আপনি এর পরও পরিণাম আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সেখানে কি কোন পুঁজির প্রয়োজন হইবে না ? হইলে কোরআন শিক্ষাকে কোন্ মুখে অনর্থক সময় নষ্ট করারূপে অভিহিত করা হয় ? পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার জিন্দেগী নিরেট অনিশ্চিত ও কল্পনাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও ইহার জন্য আয়োজনের অন্ত নাই। কিন্তু আখেরাতে গমন সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তজ্জন্য পুঁজি সংগ্রহ করাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা বলিয়া মনে করা হয়।

আসলে মানুষ স্বয়ং আখেরাত সম্বন্ধেই এত গাফেল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা স্মরণেই আসে না।

একবার আমি সাহারানপুর হইতে কানপুর যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে কিছু ইক্ষুও ছিল। আমি উহা ওজন করাইতে চাহিলাম। যাহারা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল, তাহারা আমার এই ইচ্ছার বিরোধিতা করিল। এমন কি, স্বয়ং ষ্টেশনের কর্মচারীরাও বলিল, আপনি এইগুলি ওজন ছাড়াই লইয়া যান। আমরা গার্ডকে বলিয়া দিব, কেহ বাধা দিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গার্ড কোন্ পর্যন্ত যাইবে ? উত্তর হইল, গাজিয়াবাদ পর্যন্ত। আমি বলিলাম, এর পরে আমার কি হইবে ? উত্তর হইল, এরপরে এই গার্ড অন্য গার্ডকে বলিয়া দিবে। আমি বলিলাম, এরপর কি হইবে ? উত্তর পাইলাম, ঐ গার্ড কানপুর পর্যন্ত থাকিবে। আমি বলিলাম, এরপরে কি হইবে ? উত্তর হইল, এরপর আর কি ? সফরই শেষ হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, ভুল কথা, এরপরে আসিবে আখেরাত। সেখানে কোন্ গার্ড আমাকে বাঁচাইবে ? ইহাতে সকলেই চুপ হইয়া গেল। অবশেষে আমার মালের মাশুল গ্রহণ করা হইল। মোটকথা, এই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক হইতে আখেরাতের কথা একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তাহা এই যে, উপরোক্ত ঘটনায় কর্তৃপক্ষদের মন রক্ষার্থেও ওজন না করাইবার সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা শরীয়তের শিক্ষার প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকাল কোন সভ্য ব্যক্তি এরূপ করিতে পারে কি ? হকদার তাহার হক সম্বন্ধে জানে না, তবুও তাহার হক আদায় করা হয় - এরূপ ঘটনা আজকাল খুবই বিরল। শরীয়ত ইহাকে খুবই দরকারী মনে করে। এখন শরীয়ত ও নিজেদের কল্পিত সভ্যতার তুলনা করিয়া দেখুন। খোদার কসম, আমি দেখিয়াছি—দরিদ্র দ্বীনদার—যাহাদিগকে নির্বোধ মনে করা হয় তাহারাই এইসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কিন্তু আমাদের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, এদিকে মোটেই খেয়াল করে না। বন্ধুগণ; যে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সে-ই বুদ্ধিমান। কাজেই যাহার মধ্যে ধর্ম-কর্ম নাই, সে কিরূপে বুদ্ধিমান হইতে পারে ? আজকাল বুদ্ধি ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করা হয়। অথচ আমাদের বুযুর্গগণ যেমন বুদ্ধিতে পাকাপোক্ত ছিলেন, তেমনি ধর্ম-কর্মেও সর্বদা কামেল ছিলেন।

হেরাক্লিয়াস (রোমের খৃষ্টান বাদশাহ্) হযরত ওমর (রাঃ) সম্বন্ধে ইসলামী দূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি কেমন লোক ? দূত উত্তরে বলিয়াছিল, তাঁহার অবস্থা হইল এই যে, لا يَخدع و لا يُخدع অর্থাৎ, "তিনি কাহাকেও ধোকা দেন না এবং অন্য কেহও তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে না।" ইহা শুনিয়া হেরাক্লিয়াস বলিল,

তিনি বাস্তবিকই এরূপ হইলে কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। কেননা, যিনি একই সঙ্গে ধার্মিক ও জ্ঞানী, তাঁহার শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব নহে।

এই পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা শেষ হইল। আমি বলিতেছিলাম যে, আখেরাত সম্বন্ধে অজ্ঞানতা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহার সীমা এতদূর পৌঁছিয়াছে যে, কেহ এসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া ইহার চিন্তা করিলে, তাহাকে বোকা মনে করা হয়।

আমার জনৈক বি, এ পাশ ধার্মিক বন্ধু তাঁহার নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার সময়াভাবে মালপত্র ওজন না করাইয়াই আমি গাড়ীতে উঠিয়া পড়ি। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে টিকেট কালেক্টরকে ইহা জানাইয়া মাল ওজন করাইয়া ভাড়া দিতে চাহিলাম। টিকেট কালেক্টর বলিল, লইয়া যান, ওজন করাইবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম, আপনি মাফ করার অধিকারী নহেন। কেননা, আপনি মালিক নহেন। ইহাতে সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমাকে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট লইয়া গেল। সেখানেও আমি আমার পূর্ব বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিলাম। ইহাতে তাহারা উভয়েই পরস্পরে ইংরেজীতে বলিতে থাকে যে, মনে হয়, লোকটি মদ্য পান করিয়াছে। —অন্যের হক আদায় করিতে যাওয়া এতই বিস্ময়কর ব্যাপার হইল যে, এইরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে নেশাখোর বলিয়া ধারণা হয়। ঠিকই, বন্ধুবর বাস্তবিকই খোদার মহব্বতের নেশায় বিভোর ছিলেন। এই নেশাই তাহাকে মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল।

অবশেষে বন্ধুবর জানাইলেন যে, জনাব আমি মদ্য পান করি নাই। ইহাতেও ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে ভাড়া লইল না। বাধ্য হইয়া তিনি অন্য পন্থায় উহা শোধ করিলেন। ঐ পন্থা এই যে, আমাদের যিম্মায় রেলওয়ের প্রাপ্য থাকিলে ঐ মূল্যের ঐ লাইনেরই টিকেট কিনিয়া ছিড়িয়া ফেলিবে। উহা ব্যবহার করিবে না।

এই ঘটনাটি এই জন্য বর্ণনা করিলাম—যাহাতে পরিণামের প্রতিও লক্ষ্য থাকে। বিশেষতঃ দুনিয়ার কাজে যখন তোমরা পরিণাম দেখিয়া থাক, তখন আখেরাতের কাজে তাহা অবশ্যই দেখা দরকার। বন্ধুগণ, মৃত্যুরূপী পরিণাম কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে কি? কাফেরেরাও এই পরিণতিটি অস্বীকার করে না। তবে তাহাদের একটি ক্ষুদ্র দল কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না। তাহারা অবশ্য আখেরাতও স্বীকার করে না। এই দলটি নিতান্তই নগণ্য। মোটকথা, আখেরাত যখন সত্য এবং উহার জন্য আ'মলের প্রয়োজন। তখন তার জন্য এল্‌ম হাছিল করা ও শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখার কি অর্থ? এতদসত্ত্বেও অনেকে ইহাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা মনে করে। মনে মনে এরূপ বিশ্বাস না করিলেও আমল এইরূপই করে। ফলে বিশ্বাসও এক প্রকার দুর্বলতায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

এল্‌মে-দ্বীনের প্রতি মনের আকর্ষণ থাকিলে আলেমদিগের অবহেলা করার কি কারণ? আর যদি আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তবে নিজ সন্তানদিগকে দ্বীনী শিক্ষা না দেওয়ার কারণ কি? ইহা হইল আকীদায় ত্রুটির লক্ষণ।

॥ শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে ॥

আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার ব্যাপারে কেহ কেহ এইরূপ ওযর বর্ণনা করে যে, আমরা আলেমদের ওয়ায শুনিয়া তাহাদের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধাও জন্মে, কিন্তু সর্বশেষে তাহাদিগকে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিতে দেখিয়া সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ধুইয়া মুছিয়া ছাফ হইয়া যায়। আমি বলি, আপনাকে ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যে ঔষধ বিক্রেতাদেরে প্রতারণামূলক কাজ করিতে দেখিয়া হাকীম আবদুল আজীজ সহ সকল হাকীমের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে। আপনি এই ব্যক্তিকে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মনে করিবেন কি? আপনিও কি এই কারণে সমস্ত বিচক্ষণ চিকিৎসককেই ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন? যেসব ওয়ায়েযের ঘটনাবলী আপনি শুনিয়াছেন, তাহারা বাস্তবেও আনাড়ি এবং অশিক্ষিত হাকীম। হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ার পরেও আপনি চিকিৎসক সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কয়েকজন ভিক্ষুকদের কারণে আপনি সূক্ষ্মদর্শী মৌলবীদিগকেও ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। মৌলবীদিগকে ত্যাগ না করার অর্থ এইরূপ বলি না যে, তোমরা শুধু তাহাদের ভক্ত সাজিয়া থাক এবং তাহাদের হাত চুম্বন কর। আমরা নিজেরাই তোমাদের হাত চুম্বন করিব। আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে আলেমদের নিকট হইতে উপকার লাভ কর।

বর্তমানে মৌলবীদের প্রতি তোমাদের যে শুষ্ক বিশ্বাস রহিয়াছে, উহার একটি উদাহরণ শুন। কথিত আছে, দুই ব্যক্তি খুবই কৃপণ ছিল। এক দিন একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আহার কর কিরূপে? সে উত্তরে বলিল, ভাই কি বলিব, প্রতিমাসে এক পয়সার ঘি খরিদ করি। আহারের সময় উহা সম্মুখে রাখিয়া বলি, আমি তোকে খাইয়া ফেলিব। এই ভাবে পূর্ণ মাস কাটাইয়া দেই। অবশেষে এক দিন উহা খাইয়া ফেলি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি বড়ই অপব্যয়ী। আমার কথা শুন। আমি রুটি পাকাইয়া গলিতে ঘুরাফিরা করি এবং যেখানে গোশ্‌ত ভাজার গন্ধ পাই, সেখানে দাঁড়াইয়া গন্ধ শুঁকিতে থাকি এবং রুটি খাইতে থাকি।

এই দুই ব্যক্তিও ঘি এর ভক্ত ছিল। ঘি এর সহিত তাহাদের এক প্রকার সম্পর্ক ছিল; কিন্তু ইহাতে তাহাদের কি লাভ হইল? ঠিক তেমনি শুধু ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা আপনার কি উপকার হইবে?

॥ সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ॥

মোটকথা, এইসব লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, এইসব লোক আলেমদিগকে একেবারে বেকার বস্তু মনে করে। আমার সহিত জনৈক ব্যক্তির আলাপ হয়। সে বলিল, আপন ভাতিজার জন্য আপনি কি পছন্দ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, সে আরবী পড়িতেছে—যেন ধর্মের খেদমত করিতে পারে। লোকটি বলিল, দেওবন্দ মাদ্রাসা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়শত আলেম পাঠ সমাপনান্তে বাহির হইতেছে। ধর্মের খেদমতের জন্য তাহারাই যথেষ্ট। আপনি তাহার জন্য ইংরেজী শিক্ষা মনোনীত করিলেন না কেন—যাহাতে সে পার্থিব উন্নতি করিতে পারিত? আমি বলিলাম: জনাব, ধর্মের খাদেম হওয়া যদি লাভজনক ব্যাপার না হইয়া থাকে, তবে দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যও এই নীচ কাজ মনোনীত করা হইবে কেন? আপনি যাইয়া তাহাদিগকেও পরামর্শ দিন যে, এসব ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষা অর্জনে লাগিয়া যাও। কেননা, তাহারাও জাতির সন্তান। পক্ষান্তরে ধর্মের খাদেম হওয়া লাভজনক ব্যাপার হইলে আমার ভাতিজার জন্য তাহা পছন্দ করিব না কেন? এরপর লোকটি একেবারে চুপ হইয়া গেল।

আফসোস, দেওবন্দের ছাত্ররা এতই ঘৃণিত যে, যে-কাজকে আপনি অনর্থক ভাবিতেছেন তাহা তাহাদের জন্য পছন্দ করিলেন। পক্ষান্তরে আপনার সন্তান এতই প্রিয় ও সম্মানিত যে, তাহার জন্য ডেপুটি কালেক্টরী, তহ্‌শীলদারী ইত্যাদি মনোনীত করিলেন। বন্ধুগণ, আমি ডেপুটি কালেক্টরী ইত্যাদি করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু আপনি সন্তানের ধর্ম-রক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও দেখা দরকার। আপনার সন্তান আখেরাতে উপস্থিত হইবে না বলিয়া কি আপনি নিশ্চিত আছেন? সে যদি আখেরাতে উপস্থিত হয়, তবে তাহার কি দশা হইবে? এতদসত্ত্বে আরও ভাবিয়া দেখুন যে, ধর্মের খেদমত করার জন্য খাদেমের প্রয়োজন আছে কি না, প্রয়োজন থাকিলে সকল মুসলমানের পক্ষেই তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া জরূরী নয় কি? আপনি ইহার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক লোক হয় তো আনন্দিত হইবে যে, তাহারা এই দোষ হইতে মুক্ত। কেননা, তাহারা অন্ততঃ একটি ছেলেকে আরবী শিক্ষায় প্রবেশ করাইয়াছে। আসলে ইহা আনন্দের বিষয় নহে। কারণ, যে মাপকাঠি অনুযায়ী আপনি এই ছেলেকে আরবী শিক্ষার জন্য মনোনীত করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী সে স্বয়ং এই উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট নহে। আজকাল মনোনয়নের মাপকাঠি হইল এই যে, যে ছেলেটি সবচাইতে বেশী স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ, তাহাকেই আরবী শিক্ষার জন্য পছন্দ করা হয়। অথচ দুনিয়া উপার্জনের জন্য খুব উচ্চমানের মস্তিষ্কের প্রয়োজন নাই। ইহা যাঁতাকল পিষার ন্যায়। ইহার সহিত যাহার সামান্যও সম্পর্ক থাকিবে, সে-ই

স্বচ্ছন্দে ইহা করিতে পারিবে। যে উদ্দেশ্যের জন্য পয়গাম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন, মস্তিষ্কের প্রয়োজন উহার জন্যই বেশী। আশ্চর্যের বিষয়, এখন ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গিয়াছে।

পয়গাম্বরদের সম্বন্ধে আপনি জানেন কি? বন্ধুগণ, দুনিয়ার জ্ঞানেও কেহ তাঁহাদের সমতুল্য নহে। তাঁহারা সবরকম জ্ঞান গুণই প্রাপ্ত হন। অতএব, তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে, উহার জন্যও পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। এখন আপনিই বলুন, কোন্ নিয়মে ছেলে মনোনীত করিতে হইবে? কর্মী ছেলের জন্য এল্‌মে দ্বীন পছন্দ না করার যে ধারণা, উহার উৎস হইতেছে এই যে, তাহারা মনে করে, আরবী পড়িয়া ছেলে রুজী-রোজগারের যোগ্য থাকে না।

॥ রুজী-রোজগারের প্রয়োজন ॥

প্রথমতঃ ইহা স্বীকৃতই নহে। কেননা, রুজী-রোজগার একটি সীমাবদ্ধ প্রয়োজন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী ইহা অর্জন করিতে পারে। অনেক বেশী রুজী সঞ্চয় করিলে, উহা তাহার কাজে খুব কমই আসে। মনের শান্তিই রুজী-রোজগারের আসল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অনেক গরীব লোক অনেক ধনী লোককে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে।

আমি জনৈক গরীব ও জনৈক ধনী লোকের একটি গল্প বলিতেছি। তাহারা ছিল পরস্পরে বন্ধু। গরীব ব্যক্তি খুবই সুস্থ ও স্থূল দেহী ছিল এবং ধনীর শরীর ছিল অত্যন্ত কৃশ ও রোগা। এক দিন সে গরীব বন্ধুকে বলিল, আরে ভাই, তুমি কি খাও যে, এত সবল ও মোটাতাজা হইয়াছ? বন্ধু বলিল, আমি তোমা অপেক্ষা সুস্বাদু খাদ্য খাই। ধনী ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, ঐ সুস্বাদু খাদ্য আমাকেও খাওয়াও। ইহাতে গরীব ব্যক্তি এক দিন তাহাকে দাওয়াত করিল। সময়মত তাহার বাড়ী পৌঁছিলে উভয়েই এদিক ওদিকের গল্পে মত্ত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর ক্ষুধার তাড়নায় ধনী ব্যক্তি খাওয়ার জন্য তাকীদ করিল। গরীব বলিল, এখনই আসিতেছে। এরপরও অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, কিন্তু খানা আসিল না। সে ক্ষুধায় আবার তাকীদ করিল এবং গরীবও এইভাবে পিছাইতে লাগিল। অবশেষে যখন ধনী ব্যক্তি খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়িল এবং জোর তাকীদ করিল, তখন গরীব বলিল, ভাই খাদ্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। তবে দিনের বাসি রুটি মওজুদ আছে, যদি বল, তবে লইয়া আসি। ধনী বলিল, আর দেরী সহ্য হয় না, এখন বাসি রুটিই নিয়া আস। সেমতে গরীব ব্যক্তি কয়েক টুকরা বাসি রুটি ও সামান্য শাক আনিয়া হাযির করিল। ক্ষুধার তাড়নায় ধনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সে উহা দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং খুব আনন্দিত হইয়া পেট ভরিয়া

আহার করিল। গরীব ব্যক্তি মাঝে মাঝে বাধা দিয়া বলে, দেখ ভাই বেশী খাইও না। সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ধনী বলিল, সাহেব, এখন ইহার চেয়ে সুস্বাদু খাদ্য আর কি হইতে পারে ?

তখন গরীব বলিল, আমি প্রত্যহ যে সুস্বাদু খাদ্য আহার করি, তাহা অন্য কিছু নহে ; বরং এই খাদ্য অর্থাৎ, যখন ক্ষুধা চরমে পৌছে, আমি তখনই আহার করি। ফলে যাহাই খাই তাহাই শরীরের অংশে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে তুমি শুধু নিয়মের কোঠা পূর্ণ কর। আহারের সময় হইলে চাকর আসিয়া বলে, হুযূর খানা প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি তাহা শুনিয়া আহার করিতে সম্মত হও যদিও তখন মোটেই ক্ষুধা না থাকে।

মোটকথা, কেহ মাসে বার তের শত টাকা রোজগার করিলেও আসল উদ্দেশ্য খাওয়া সীমাবদ্ধই থাকিবে। তবে রোজগার সীমাবদ্ধ হইবে না। কিন্তু খাওয়া সীমাবদ্ধ হওয়ার পর রোজগার সীমাবদ্ধ না হওয়ায় তাহার কি লাভ হইল ? আসল উদ্দেশ্য কম হইলে যাহা উদ্দেশ্য নহে তাহা বেশী হইলেও কোন লাভ নাই। অতএব, মৌলবী হইলে রুজী রোজগার করিয়া খাইতে পারিবে না—এই কথাটিই প্রথমতঃ বিবেচনাযোগ্য। কেননা, প্রয়োজনানুযায়ী প্রত্যেকেই রুজী রোজগার করিয়া খাইতেছে। যদি মানিয়াও লওয়া হয়, তবে আপনাদের কল্পিত খানা অর্থাৎ চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জরুরী কি না, তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। বিষয়টি এইভাবে অনুমান করা যাইবে যে, কোন খাদেমে দ্বীনকে অন্নহীন ও বস্ত্রহীন দেখাইয়া দিন। দ্বীনের এই খেদমত শিক্ষকতার মাধ্যমেই হউক কিংবা ওয়াযের দ্বারাই হউক ; কিংবা কোন খাদেমে দ্বীনকে ঘৃণিত অবস্থায় দেখাইয়া দিন। অন্ন, বস্ত্র ও সম্মান লাভের পর তাহাদের মধ্যে আর কি বস্তুরই অভাব থাকে ? হাঁ, কোন বস্তুর অভাব থাকিলে তাহা হইতেছে আপনার লালসা ও বাসনা। ইহার জন্য এই উত্তরই যথেষ্ট ঃ

حرص قانع نیست صائب ورنه اسباب معاش

آنچه ما درکار داریم اکثرے درکار نیست

(হেরছ ক্বানে' নীস্ত ছায়েব ওর না আসবাবে মাআশ

আঁচে মা দরকার দারীম আকছারে দরকার নীস্ত)

“হে ছায়েব! লালসাই তৃপ্ত হইতে চায় না, নতুবা জীবিকার যে-সব পন্থা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি, উহাদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় নহে।”

॥ সাংসারিক উন্নতি উদ্দেশ্য নহে ॥

আপনি আপনার ঘরের আসবাব-পত্রই একবার যাচাই করিয়া দেখুন। অর্ধেকের চেয়ে বেশী আসবাব-পত্র এমন বাহির হইবে যে, উহাদিগকে ব্যবহার করার প্রয়োজন

কখনও দেখা দেয় নাই। এক চতুর্থাংশেরও বেশী জিনিসপত্র এমন দেখা যাইবে যে, উহা ঘরে আছে বলিয়াও আপনি এত দিন জানিতেন না। এখন আপনিই বলুন, এই জাতীয় আসবাব-পত্র যোগাড় করার কি প্রয়োজন ছিল? আলেমগণ অকর্মন্য বলিয়া যদি আপনি এইরূপ বুঝাইতে চান যে, তাহারা উন্নতি করিতে পারে না, তবে এরূপ অকর্মন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং ইহাই খোদার প্রকৃত আনুগত্য। মাওলানা রূমী বলেন:

تا بدانی هر کرا یزد بخواند + از همه کار جهان بیکار ماند

(তা বেদানী হরকেরা ইয়ায্দ বখান্দ + আয হামা কারে জাহাঁ বেকার মান্দ)

"অর্থাৎ, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কাজের জন্য পছন্দ করেন, সে দুনিয়ার সব কাজে বেকার হইয়া যায়।"

আরও বলেন:

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم + مست آن ساقی و آن پیمانه ایم

(মা আগর কাল্লাশ ওগর দেওয়ানাইম + মস্তে আঁ সাকী ও আঁ পায়মানাইম)

"অর্থাৎ, আমরা দেউলিয়া ও পাগল হইলেও ঐ সাকী (আল্লাহ্) এবং ঐ পেয়ালার (এশ্কের) নেশায় মত্ত আছি।"

কিন্তু ইহা হইল মাওলানা রূমীর উক্তি। একমাত্র দিলদার (খোদা-প্রেমিক) ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। এক্ষণে আমি আপনাদেরই স্বীকৃত বিষয়-সমূহের মধ্য হইতে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। আপনার একটি চাকর আছে। আপনি তাহাকে মাসিক দশ টাকা বেতন দেন। সে আপনার খুবই বিশ্বস্ত চাকর। ঘটনাক্রমে এক দিন বাহিরের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিল যে, সে দশ টাকা বেতনের চাকর। ইহাতে আগন্তুক ব্যক্তি চাকরকে বলিল, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বিশ টাকা বেতন দিব এবং বর্তমানের কাজের চেয়ে অর্ধেক কাজ করাইব।

এখন নিজের মন পরীক্ষা করিয়া বলুন, এই চাকরের জন্য গৌরবের বিষয় কোন্‌টি হইবে? উন্নতির কথা শুনিয়া সে আগের কাজ হইতে ফসকাইয়া যাইবে, না পরিষ্কার বলিয়া দিবে যে, আপনি আমাকে প্ররোচিত করিতে আসিয়াছেন। নিশ্চয়ই, আপনি চাকরের শেষোক্ত কাজটিকেই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

এখন ইন্ছাফের সহিত বলুন, যদি কেহ খোদার বান্দা হইয়া পাঁচ টাকা মাসে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে এবং হাজার টাকায় লাথি মারে। যেমন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে জীবিকার পন্থা ত্যাগ করে, তবে তাহাকে ভীরুচেতা এবং উন্নতি-বঞ্চিত বলা হয় কেন? বন্ধুগণ, এরূপ ব্যক্তির আরও বেশী মূল্য হওয়া উচিত। তাহাকে শুষ্ক মস্তিষ্ক আখ্যা দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ভাইসব, আপনারা যাহাকে উন্নতি

নাম দিয়াছেন, উহা আসলে স্বার্থের পূজা ও নিজেকে লইয়া ব্যাপৃত থাকা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদিও উহার পিছনে সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা ও ধর্ম-কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাক না কেন। তাই কবি বলেন ;

عاقبت سازد ترا از دین بری + این تن آرائی و این تن پروری

(আকেবাত সাযাদ তুরা আয দ্বীন বরী + ই তন আরায়ী ও ই তন পরওয়ারী)

"অর্থাৎ, এই অঙ্গ সজ্জা ও এই আত্ম-প্রিয়তা পরিণামে তোমাকে ধর্মে বিমুখ করিয়া ছাড়িবে।"

অতএব, মাওলানা রূমীর উক্তিতে আপনি সন্তুষ্ট না হইলেও চাকরের উদাহরণে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, যে বিষয়ের প্রতি মনের টান থাকে না, উহাতে মানুষ উন্নতি করিতে পারে না :

انبیاء در کار دنیا جبریند + اشقیا در کار عقبی جبریند
انبیاء را کار عقبی اختیار + اشقیا را کار دنیا اختیار

(আম্বিয়া দরকারে দুনিয়া জবরিয়ন্দ + আশ্‌কিয়া দরকারে ওক্‌বা জবরিয়ন্দ
আম্বিয়া রা কারে ওক্‌বা এখ্‌তিয়ার + আশ্‌কিয়া রা কারে দুনিয়া এখ্‌তিয়ার)

"অর্থাৎ, নবীগণ প্রয়োজনের তাকীদে বাধ্য হইয়া দুনিয়ার কাজ করেন এবং হতভাগ্য দুনিয়াদারেরা অপারগ অবস্থায় আখেরাতের কাজ করে। নবীদের জন্য আখেরাতের কাজ পছন্দনীয় এবং হতভাগ্যদের জন্য দুনিয়ার কাজ পছন্দনীয়।"

মোটকথা, সকলেই অকর্মন্য এবং সকলেই কর্মঠ। তবে দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার কাজে কর্মঠ এবং আখেরাতের কাজে অলস। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ দুনিয়ার কাজে অলস এবং আখেরাতের কাজে কর্মঠ। যদি আপনার মতে এখনও ফয়সালা না হইয়া থাকে, তবে বুঝিয়া লউন :

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

"তোমরা আমাদের সহিত ঠাট্টা করিলে আমরাও তোমাদের ন্যায় তোমাদের সহিত ঠাট্টা করিব। অতি সত্বরই জানিতে পারিবে যে, কাহার উপর অপমানকর শাস্তি পতিত হয় এবং স্থায়ী আযাব কাহার উপর নাযিল হয়।" এবং :

فَسَوْفَ تَرٰى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ + اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارٌ

অর্থাৎ, 'এক ব্যক্তি গাধায় চড়িয়াছে এবং অন্য ব্যক্তি তাহাকে বলে যে, তুমি গাধায় সওয়ার হইয়াছ। কিন্তু প্রচুর ধূলিকণার কারণে সে সঠিক অবস্থা জানে না এবং বলে যে, আমি ঘোড়ায় চড়িয়াছি। এখন ঐ ব্যক্তি বলে যে, ধুলার জাল টুটিয়া গেলে তুমি বুঝিবে যে, তোমার উরুর নীচে গাধা রহিয়াছে, না ঘোড়া ?"

তদ্রূপ আমরাও বলি, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইলে সামান্য ছবর করুন। سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ 'কাফেরেরা অতি সত্বরই (মৃত্যুর পর) জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী ও আস্ফালনকারী ছিল।'

নতুবা উন্নতি কামনা না করা আপনার চাকরের পক্ষে গুণ ও আনুগত্যের কথা হইলে খোদার চাকরের পক্ষে তাহা হইবে না কেন? ভাই সাহেব, ইহাই হইল অকর্মন্য হওয়ার স্বরূপ। আপনার আপত্তির কারণেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি বলি, খোদার চাকরকে অকর্মন্য বলিলে সে দুঃখিত হয় না ; বরং ইহাতে সে গর্ববোধ করিয়া বলে, ইহাই তাহার কাজ :

عاشق بد نام کو پروائے ننگ و نام کیا
اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

"অর্থাৎ, বদ্‌নাম আশেকের পক্ষে দুর্নামের পরওয়া কি? যে নিজেই সফলকাম নহে, অন্যের সহিত তাহার কি সম্পর্ক?"

বন্ধুগণ, আজ যাঁহাদের জুতা পাইলে মস্তকে লওয়া হয়, তাঁহারা অকর্মন্যই ছিলেন।

॥ ধনীদের মনোযোগের প্রতিক্রিয়া ॥

এল্‌মে-দ্বীনের প্রতি বিমুখতার ইহাই ছিল উৎস। অর্থাৎ, মানুষ আলেমদিগকে অনর্থক মনে করে। ফলে তাহাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ নাই। মনোযোগ থাকিলে উহার লক্ষণ এই যে, নিজ সন্তানদের জন্যও এই শিক্ষা মনোনীত করিত।

বাদশাহ্ আলমগীরের একটি গল্প মনে পড়িল। (এই গল্পটি মৌখিক, লিখিত নহে) একদা তিনি কতিপয় তালেবে-এল্‌মকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার অভাবে জামে মস্‌জিদে পেরেশান অবস্থায় ঘুরাফিরা করিতে দেখিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ধনীদের কর্তব্য-বিমুখতাই ইহার কারণ। তিনি এই অবস্থা শুধরাইতে চাহিলেন। ওযূ করার সময় তিনি উযীরে আযমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে অমুক সন্দেহ দেখা দিলে কি করিতে হইবে? উযীরে আযম ইহার উত্তর দানে অসমর্থ হইলে বাদশাহ্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ফেকাহ্ শাস্ত্রের জরুরী মাসআলাগুলি শিখিয়া লওয়াও আপনাদের তৌফীক হয় না? ইহাতে দরবারের অন্যান্য উযীর ও আমীর ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তালেবে-এল্‌মদের খোঁজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যহ তাহাদের নিকট মাসআলা শিখিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে তালেবে-এল্‌মদেরও কোনরূপ কষ্ট বাকী থাকে নাই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, শত খুঁজিয়াও তালেবে-এল্‌ম

পাওয়া যাইত না। হযরত মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ ছাহেব (রাহঃ) বর্ণনা করিতেন, বাদশাহ্ আলমগীরের বার হাজার হাদীস মুখস্থ ছিল।

দেখুন, যদিও দরকার বশতঃই এই সম্প্রদায়ের প্রতি ধনীদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ধনীরা তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে শুরু করিয়াছে। আপনারাও যদি এই দলের প্রতি মনোযোগী হইতেন, তবে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার কোন আলেমের নিকট জরুরী মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। স্বয়ং তাহাদের নিকট না গেলেও তাহাদিগকে নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া লইতেন। বর্তমানে এসব বিত্তশালী কোথায় যাহারা নিজ এল্‌ম হাছিলের উদ্দেশ্যে আলেমদের নিকট উপস্থিত হয়?

আগেকার যুগের অবস্থা শুনুন। বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ ইমাম মালেকের নিকট শাহ্‌যাদাদিগকে হাদীস পড়াইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনার বংশ হইতেই এল্‌মে-দ্বীন সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আপনিই ইহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে চান? ইহাতে বাদশাহ্ বলিলেন, আচ্ছা শাহ্‌যাদাগণ আপনার দরবারেই পৌঁছিয়া যাইবে। তবে তাহাদিগকে প্রজাসাধারণ হইতে পৃথক রাখিবেন। আজকালও কোন কোন বিত্তশালী লোক জমাআতের নামাযে আসে না। তাহাদের ধারণা এই যে, ব্যাপক মেলামেশার ফলে জনসাধারণের অন্তর হইতে তাহাদের প্রভাব বা ভয় দুর হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, এখনও সামলাইয়া যান। এইরূপ আচরণ দ্বারা পরোক্ষভাবে শরীয়তের নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়। এইভাবে শরীয়তকে যেন দোষ দেওয়া হয় যে, ইহাতে এমন ক্ষতিকর আইন বিদ্যমান আছে! তাছাড়া মেলামেশার ফলে কখনও প্রভাব দুর হয় না; বরং উহাতে প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। পক্ষান্তরে মেলামেশাহীন প্রভাবে আতঙ্ক মিশ্রিত থাকে।

॥ খোদাভীতি ॥

খোদার আহ্‌কাম এত বিশ্রী নহে যে, উহাদের খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। লক্ষ্য করুন, জনসাধারণের উপর খোলাফায়ে রাশেদীনের কত গভীর প্রভাব ছিল। তৎসঙ্গে ইহাও দেখুন যে, তাঁহারাও জনগণের সহিত কত নম্র ব্যবহার করিতেন!

একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন: اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا অর্থাৎ, 'খলিফার নির্দেশ শ্রবণ কর ও উহা মান্য কর।' শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল: لَا نَسْمَعُ وَلَا نُطِيْعُ 'আমরা শুনিব না এবং মান্যও করিব না।' হযরত ওমর (রাঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, অদ্য জনগণের মধ্যে 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ মাল)-এর চাদর বণ্টন করা হইয়াছে। প্রত্যেকেই একটি

করিয়া চাদর পাইয়াছে কিন্তু আপনার গায়ে দুইটি দেখিতেছি কেন? মনে হয়, আপনি ন্যায়পরায়ণতার সহিত বণ্টন করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন: ভাই, তুমি আসল বিষয় জানার চেষ্টা না করিয়াই প্রতিবাদ করিয়া বসিয়াছ। আসল ব্যাপার এই যে, অদ্য আমার নিকট গায়ের জামা ছিল না। তাই আমার নিজের চাদরটি ইজার (পায়জামা) হিসাবে পরিধান করিয়াছি এবং আমার ছেলে আবদুল্লাহ্‌র চাদরটি ধার করিয়া জামার স্থলে গায়ে দিয়াছি।

এই ঘটনা হইতে আপনি আরও জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের নিকট ছোট বড় সকলেই সমান অংশীদার ছিলেন। আজকাল বড় লোকদিগকে দ্বিগুণ অংশ দেওয়া জরুরী বিষয়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। তবে মালিক যদি কাহারও জন্য নিজেই দ্বিগুণ অংশ নির্দিষ্ট করে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। মোটকথা, এই ধরণের নম্রতা সত্ত্বেও জনগণের উপর তাঁহাদের অসীম প্রভাব ছিল। একবার হুযূর (দঃ) বহু সংখ্যক ছাহাবী সমভিব্যাহারে কোথাও গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই যাহার উপর দৃষ্টি পতিত হয়, সেই হাঁটুর উপর বসিয়া পড়েঃ

هر که ترسید ازحق و تقوی گزید + ترسد ازوے جن وانس وهر که دید

(হরকেহ্‌ তরসীদ আয হক ও তাক্‌ওয়া গুযীদ
তরসাদ আয্‌ওয়ে জিন ও ইন্‌স ও হরকেহ্‌ দীদ)

"অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে, দুনিয়ার মানুষ জিন ইত্যাদি সব কিছুই তাহাকে ভয় করে।" অপরের উপর কাহারও ভয়ভীতির অভাব থাকিলে উহার একমাত্র কারণ হইল তাহার তাক্‌ওয়া তথা খোদাভীতির অভাব। তাক্‌ওয়া থাকিলে অবশ্যই ভয়ভীতি হয় এবং উহাতে আতঙ্ক বা ঘৃণা মিশ্রিত থাকে না। দূরে দূরে সরিয়া থাকা এবং মেলামেশাহীন অবস্থায় যে ভীতি হয়, উহা ব্যাঘ্রের ভীতির ন্যায়। এই মজলিসে এক্ষণে বাঘ আসিয়া পড়িলে সকলেই ভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িবে।

আজকালকার ধনীদের উপরোক্ত ধারণার ন্যায় বাদশাহ্‌ হারুনুর রশীদও মনে করিলেন যে, শাহ্‌যাদাদিগকে প্রজাদের হইতে পৃথক করিয়া পড়াইলে প্রজাদের উপর তাহাদের ভয় বাকী থাকিবে। তাই তিনি ইমাম মালেকের নিকট আরয করিলেন, যেন তাহাদের সহিত অন্য কাহাকেও বসিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরে ইমাম মালেক জানাইয়া দিলেন—ইহাও সম্ভবপর নহে। অবশেষে শাহ্‌যাদাগণ সাধারণ মহ্‌ফিলে হাযির হইয়াই হাদীস শুনিতেন।

ইহা হইল আগেকার যুগের বাদশাহ্‌দের গল্প। জনৈক আলেম খোলাখুলি উত্তর দিয়া দিলেন এবং বাদশাহও তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। আজকালকার অবস্থা এরূপ নহে। এখনও আলেমদের উচিত—নিজদিগকে কাহারও কাছে হেয় না করা। তবে খুব দূরে দূরে থাকাও সমীচীন নহে। ইহাতে দুনিয়াদারগণ একেবারেই

বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ, ধর্মীয় উপকার লাভের নিমিত্ত কেহ সম্মানের সহিত আলেমকে আহ্বান করিলে তাহার নিকট যাওয়া উচিত।

॥ ধর্মপ্রিয়তা ॥

আলেমদিগকে ডাকিয়া আপনারা তাহাদের নিকট আরবী পড়ুন, আমার কথার এই অর্থ নহে। কারণ ইহাতে আপনাদের অনেক ওযর দেখা দিবে। খোদার ফযলে উর্দু ভাষায়ও প্রচুর ধর্মীয় সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলে আপনাদিগকে আরবী পড়িতে হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখুন, ধর্মীয় কিতাব বলিয়া এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করেন, এমন আলেমদের কিতাব বুঝান হইয়াছে। নেচারী তথা প্রকৃতিবাদীদের বাজে কথা সম্বলিত পুস্তক বুঝান হয় নাই—যদিও তাহাদের নামের সহিত মৌলবী উপাধিটি যুক্ত থাকে।

একবার জনৈক নায়েবে তহ্‌শীলদার আমাকে জানাইল যে, সে ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করে। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, সে প্রকৃতিবাদীদের লিখিত কিতাব পাঠ করে। আমি তাহাকে বলিলাম, সাহেব, যদি আপনি গভর্ণমেণ্টের আইন বহি পাঠ না করেন এবং শুধু পত্রিকা পাঠ করিয়া যান, তবে আপনি গভর্ণমেণ্টের শাসন এলাকায় থাকিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন কি? কখনই নহে। কেননা, গভর্ণমেণ্ট যে পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিয়াছে, আপনি তাহা না দেখিয়া নিজের তরফ হইতে নূতন পাঠ্য তালিকা মনোনীত করিয়াছেন। তেমনি শুধু ঐ সমস্ত ধর্মীয় কিতাব পাঠ করুন, যাহা ধর্মীয় পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রেও মানুষ নিজেরা পাঠ্য তালিকা মনোনীত করিয়া লইয়াছে। সে মতে পুরুষগণ উপরোক্ত পাঠ্য তালিকা অর্থাৎ ধর্মচ্যুত লেখকদের পুস্তক পাঠে এবং মহিলাগণ বাজে ও কল্পিত গল্প, কাহিনীর পুস্তক পাঠে মন দিয়াছে। যেমন, 'নবী পরিবারে মোজেযা' ইত্যাদি নামের পুস্তক পাঠ করা হয়। অথচ এই পুস্তকটি যে একেবারেই বাজে, তাহা নাম হইতেই ফুটিয়া উঠে। কেননা, বাস্তবক্ষেত্রে নবী পরিবারের কোন মোজেযা নাই।

তাছাড়া এই পুস্তকটিতে হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর এই দোষ চাপান হয় যে, তিনি হযরত হাসান হুসাইন (রাঃ)কে কোন ফকিরের হাতে দান হিসাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ফকির পরে অন্য এক জনের হাতে তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছিল। এই ধরণের কাহিনী যাহারা পাঠ করে, তাহারা নিরেট মূর্খ বৈ কিছুই নহে। এইসব মূর্খদের চেয়েও বেশী সর্বনাশ কতিপয় মৌলবী দ্বারা হইয়াছে। তাহারা ব্যবসার উন্নতির জন্য এই জাতীয় কেচ্ছা-কাহিনী ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছে। মনগড়া বিষয় প্রকাশ করা না-জায়েয হেতু তাহারা নিজকে দোষমুক্ত রাখার জন্য পুস্তকের শেষাংশে

লিখিয়া দিয়াছে যে, এই কেচ্ছাটি মনগড়া। প্রথমতঃ ইহা প্রকাশ করার প্রয়োজনই ছিল না। তাছাড়া সর্বসাধারণ মওযূ তথা মনগড়ার অর্থ বুঝে না। আসলে লিখা উচিত ছিল যে, এই কাহিনীটি একেবারেই অমূলক এবং মিথ্যা। ইহা পাঠ করা জায়েয নহে। এরূপ লিখিলে পুস্তক বিক্রী হইত কিরূপে? এহেন ধর্ম-বিক্রেতাদের কবল হইতে খোদা রক্ষা করুন। এই কারণেই কবি বলিয়াছেন ঃ

بد گہر را علم و فن آموختن + دادن تیغست دست راہزن

(বদ-গহর রা এল্‌ম ও ফন আমূখতান + দাদন তেগাস্ত দস্তে রাহ্‌যন)

'অর্থাৎ, কু-জাতকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দস্যুর হাতে তরবারি উঠাইয়া দেওয়ারই নামান্তর।'

বলিতে পারেন যে, তাহা হইলে খাঁটি পুস্তক নির্বাচন করা খুবই কঠিন ব্যাপার মনে হয়। বাস্তবিকই আপনার পক্ষে ব্যাপারটি কঠিন। কিন্তু কোন আলেম দ্বারা নির্বাচন করিলে তাহা কঠিন থাকিবে না। শিক্ষার পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হইল। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহা আরও বেশী জরূরী যে, প্রথম হইতেই ছেলেকে কোন বুযুর্গের সংসর্গে মাঝে মাঝে রাখুন এবং নিজেও থাকুন। খোদা তা'আলা বুযুর্গের সংসর্গের মধ্যে সংশোধনের ক্ষমতা রাখিয়াছেন। তাই কবি বলেন ঃ

قال را بگذار مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو

صحبت نیکاں اگر یک ساعتست + بہتر از صد سالہ زہد و طاعتست

ہر کہ خواہد ہمنشینی باخدا + گو نشیند در حضور اولیا

(কাল রা বুগ্‌যার মরদে হাল শো + পেশ মরদে কামেলে পামাল শো
ছোহ্‌বতে নেকাঁ আগার এক ছাআতাস্ত+বেহ্‌তর আয ছাদ ছালা যোহ্‌দ ও তাআতাস্ত
হরকেহ্‌ খাহাদ হামনশীনী বা খোদা + গো নশীনাদ দর হুযূরে আওলিয়া)

'অর্থাৎ, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া 'হাল' অর্জনে ব্রতী হও। কোন কামেল ব্যক্তির সম্মুখে নিজেকে দলিত কর। নেক ব্যক্তিদের স্বল্পক্ষণের সংসর্গ শত বৎসরের বৈরাগ্য ও এবাদত হইতে উত্তম। যে-ব্যক্তি খোদার দরবারে বসিতে চায়, তাহার উচিত ওলী আল্লাহ্‌দের সম্মুখে উপবেশন করা।'

কিন্তু সৎসংসর্গ লাভের জন্য আমরা মোটেই যত্নবান নহি। আমি একবার এই বিষয়টি নিয়াই একটি স্বতন্ত্র ওয়ায করিয়াছি। এখন আবার বলিতেছি যে, যে ক্ষেত্রে সন্তানদের আরও বহু প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য কোন বুযুর্গের হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা দরকার। কমপক্ষে এক বৎসর পর্যন্ত বুযুর্গদের খেদমতে রাখা বাঞ্ছনীয়। বলিতে পারেন যে, ইহাতে তাহাদের দুনিয়ার শিক্ষার অনেক ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতি যাহাতে না হয়, সেজন্য আমি বলিতেছি যে, স্কুলের প্রত্যেকটি বন্ধের মধ্যে কয়েক দিন রাখুন।

এইভাবে কয়েকবার রাখিলেই এক বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হইবে। মোটকথা, সৎসংসর্গ এবং সূক্ষ্মবিদ আলেম দ্বারা নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষাদান এই উভয় বিষয়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এইভাবে সন্তানদের ধর্ম ঠিক থাকিতে পারে। সময়ের অভাব হইলে উর্দু পুস্তক পড়িবেন নতুবা আরবী পুস্তক পাঠ করিতে পিছপা হইবেন না। কেননা, গভীর জ্ঞান ও তথ্যানুসন্ধানের ইহাই উপায়।

॥ এল্‌মে-দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ॥

আমি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, ধর্মের খাতিরে আরবী না পড়াইলেও অন্ততঃ দুনিয়ার পারদর্শিতা ও যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য আরবী শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমি নিজে দেখিয়াছি, আরবী ছাড়াই যাহারা এম, এ পাশ করিয়াছে, তাহাদের তুলনায় আরবী সহ ম্যাট্রিকও নহে এমন ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রতিভা অনেক উর্ধ্বে। অতএব, দ্বীনের জন্য না হইলেও দুনিয়ার জন্য আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমি দুনিয়ার জন্য এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার পরামর্শ দিতেছি। আসল ব্যাপার এই যে, কোন না কোন সময় প্রতিক্রিয়া দেখানো এল্‌মে-দ্বীনের বৈশিষ্ট্য। যে-ব্যক্তি এই এল্‌ম অর্জন করে, তাহাকে ইহা দ্বীনদার বানাইয়া ছাড়ে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বলিয়াছি যে, দুনিয়ার জন্য হইলেও এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা কর। মোটকথা, যে ভাবেই হউক, এল্‌মে-দ্বীন হাছিল করা প্রয়োজন। ইহার সহিত ইংরেজী হইলেও ক্ষতি নাই। আমি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে নিষেধ করি না। কিন্তু বর্তমানে ইসলামই বিপন্ন হইয়াছে। ইহা সামলানো আবশ্যকীয় নয় কি? এই জন্যই পরামর্শ দিতেছি যে, দুনিয়া সামলানোর জন্য দ্বীনেরই প্রয়োজন। এই কারণে আমি ভূমিকায় দাবী করিয়াছি যে, মৌলবীদের দলটিই হইল সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দল।

॥ ফাসাদ ও সংস্কার ॥

এক্ষণে এই দাবীটি উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণ করিতেছি। উক্ত আয়াতদ্বয়ের একটি অংশ হইতেছে لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখন এই অংশটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবীতে সংস্কারের পর ফাসাদ ছড়াইও না।

এক্ষণে ফাসাদ ও সংস্কার কি তাহাই বুঝুন। ইহার মীমাংসার জন্যই আমি পুরাপুরি দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছি—যাহাতে পূর্বাপর অর্থ দ্বারা বিষয়টি নির্দিষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

'গোপনে ও বিনয় সহকারে আপন প্রতিপালকের নিকট দোআ কর।' এবং পরে বলা হইয়াছে : وادعوه خوفا وطمعا 'এবং ভয় ও আশা সহকারে তাঁহার এবাদত কর।'

'দোআ' (আহ্বান করা) দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ পরিচিত অর্থও হইতে পারে কিংবা দোআর অর্থ এবাদতও হইতে পারে। কোরআনে এবাদত অর্থেও দোআ ব্যবহৃত হইয়াছে : أُدْعُونِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতে কেহ কেহ দোআর অর্থ এবাদত লইয়াছেন। (অর্থাৎ, তোমরা আমার এবাদত কর আমি তাহা কবুল করিব।) আবার কেহ কেহ দোআর অর্থ দোআই রাখিয়াছেন এবং এবাদত শব্দের অর্থ দোআ লইয়াছেন। যেমন : إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ আয়াতে তাহা করা হইয়াছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ "ঐ ব্যক্তি হইতে কে অধিক পথভ্রষ্ট যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে।"

এখানে দোআর অর্থ এবাদত। মোটকথা, দোআ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত আয়াতে এবাদত অর্থ লইলে সারমর্ম এই হইবে যে, পূর্বে ও পরে এবাদতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে ফাসাদ ছড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এবাদত না করা ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা ইছলাহ্ তথা সংস্কারের অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, এবাদত আরম্ভ করার পর তাহা তরক করিও না।

পক্ষান্তরে দোআর অর্থ এবাদত না লইলে এবং উহাকে বাহ্যিক অর্থে রাখিলে আমার দাবী প্রমাণের জন্য আয়াতগুলি বাহ্যতঃ সহায়ক হইবে না। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, তখনও আয়াতগুলি আমার দাবীর স্বপক্ষে থাকিবে। কেননা, এবাদত দুই প্রকার। এক প্রকার এবাদতের উদ্দেশ্য শুধু ধর্ম এবং দ্বিতীয় প্রকার এবাদতের উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে দুনিয়াও হইয়া থাকে। সকলেই জানেন যে, এবাদত হিসাবে প্রথম প্রকার এবাদতই অধিক প্রবল।

এখন জানা দরকার যে, দোআ এমন এক প্রকার এবাদত যাহা দ্বারা দুনিয়াও তলব করা যায়। এই হিসাবে ইহা দ্বিতীয় প্রকার এবাদতের পর্যায়ভুক্ত হইবে। ইহা তরক করাকেই যখন ফাসাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তখন খাঁটি এবাদত তরক করা ফাসাদ হইবে না কেন? এতএব, কোরআন দাবী করিতেছে যে, এবাদত তরক করিলে পৃথিবীতে ফাসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া কোরআন এবাদত কায়েম করাকে সংস্কার আখ্যা দিতেছে।

প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, যখন এই আয়াত নাযিল করা হয়, তখন পৃথিবীর সর্বত্র কোথায় সংস্কার ছিল যে, উহার পর ফাসাদ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? তখন কাফেরেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারা সর্বদাই ফাসাদে লিপ্ত থাকিত। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংস্কার বলিয়া সংস্কারের আয়োজন অর্থাৎ নবী করীম (দঃ)কে প্রেরণ বুঝানো হইয়াছে। নবী প্রেরণই পৃথিবীর সংস্কারের আয়োজন ছিল। কাজেই আয়াতের মর্ম এই হইবে যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)কে প্রেরণ করিয়া সংস্কারের আয়োজন করিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে ইহার অর্থ হইবে পৃথিবীতে ফাসাদ করা। ইহার সারমর্ম এই যে, এবাদত অর্থাৎ দ্বীন না থাকা ফাসাদের কারণ। এখন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ করিতেছি।

॥ দ্বীন বা ধর্মের স্বরূপ ॥

ধর্ম কাহাকে বলে, প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন যাহাতে আয়াতের অর্থে আপনি কোনরূপ আশ্চর্যবোধ না করেন। ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বস্তুর সমষ্টির নাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধর্মের যে নির্যাস বাহির করিয়াছি তাহা এই যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ি আর বাস। কাহারও মতে নামাযও বাদ পড়িয়াছে। তাহারা مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ হাদীস-এর মনগড়া তফসীর করিয়া আপন মযহাব বানাইয়াছে। ইহার উপর কেহ কেহ আরও সর্বনাশ করিয়াছে। তাহাদের মতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যাংশটি জরূরী অংশ নহে। আমি উপরোক্ত হাদীসের তফসীর দেখিয়াছি। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলকে স্বীকার করার উপর নাজাত বা মুক্তি নির্ভরশীল নহে। (নাউযুবিল্লাহ্)

বন্ধুগণ, মৌলবী সাহেবদের কান্নাকাটির কারণ এই যে, আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে কিন্তু আপনি টের পাইতেছেন না। বিজাতীয়গণ ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমরা ইসলামকে ছাড়িয়া দিতেছি—ইহা গযব বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, আমরা ইসলামের নির্যাস বাহির করিয়াছি। এই কারণে আমি বলি যে, আসলে কয়েকটি জিনিসের সমষ্টির নাম ধর্ম। উহা পাঁচটি বস্তু। যথা (১) আকায়েদ (২) এবাদাত, (৩) মোয়ামালাত বা পারস্পরিক লেন-দেন, (৪) আদাবে মোয়াশারাত বা সামাজিকতার নিয়ম-কানুন এবং (৫) আখ্‌লাকে বাতেনী বা আধ্যাত্মিক চরিত্র। অর্থাৎ, অহংকার ও রিয়া না থাকা এবং নম্রতা, এখ্‌লাছ, অল্পেতুষ্টি, শোকর, ছবর ইত্যাদি থাকা। এই পাঁচটি বস্তুর নাম ধর্ম। বর্তমানে মুসমানদের মধ্যে সকলেই ইহাদের সবগুলি পালন করিতেছে না। কেহ কোনটি ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অন্য কেহ অন্যটি। কেহ আ'মল বাদ দিয়াছে, কায়কারবারের নীতি তরক করিয়াছে, আবার কেহ

ইসলামের সামাজিকতা বিসর্জন দিয়াছে। তাহারা নিজ সামাজিকতা ত্যাগ করিয়া বিজাতির সামাজিকতা অবলম্বন করিয়াছে। কেহ কেহ আধ্যাত্মিক চরিত্র ছাড়িয়া দিয়াছে ; বরং শেষোক্ত দুইটি বিষয়কে প্রায় সকলেই বাদ দিয়াছে।

এই বিবরণের পর আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীতে সংস্কার সাধনের মধ্যে দ্বীন অর্থাৎ, উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দখল রহিয়াছে এবং এই পাঁচটি বিষয়ের ত্রুটিই পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়াইবার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর সংস্কারে ইহাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কিরূপ দখল আছে—এখন চাক্ষুষভাবে তাহাই দেখিয়া লউন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির দখল একেবারে সুস্পষ্ট, যেমন চরিত্র। জননিরাপত্তার ব্যাপারে ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট। একটু লক্ষ্য করিলে জননিরাপত্তার ব্যাপারে কায়-কারবারের প্রভাবও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কেননা, কায়-কারবারের যে সব আহ্‌কাম রহিয়াছে, উহাদের মোটামুটির স্বরূপ হইল এই যে, কাহারও হক্ বিনষ্ট করিও না। সুতরাং ঐক্য সাধনে লেন-দেনের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে শর্ত এই যে, ইহা শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া চাই। কেননা, শরীয়ত যেসব মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে, আপনার নিজস্ব বিবেক উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিবে না। উদাহরণতঃ, আপনি সময় হওয়ার পূর্বেই গাছের ফল বিক্রয় করিলেন ; কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ বিক্রয় হারাম। কেননা, গাছে ফল আসার পূর্বেই তাহা বিক্রয় করিলে অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয় করা হইল। এরূপ বিক্রয়ে যে কোন এক পক্ষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী ফল বিক্রয় করিলে কাহারও ক্ষতি হয় না। কাহারও ক্ষতি না হইলেই জননিরাপত্তা কায়েম হইতে পারিবে। সুতরাং দুনিয়ার শৃঙ্খলা বিধানে উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের প্রভাব স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। অবশিষ্ট তিনটি বিষয়ের প্রভাব অবশ্য অস্পষ্ট। কাজেই জননিরাপত্তার ব্যাপারে উহাদের প্রভাব প্রমাণিত করা প্রয়োজন।

॥ আকায়েদ ও জননিরাপত্তা ॥

প্রথম অর্থাৎ আকায়েদের ব্যাপারটি এইভাবে বুঝুন যে, তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাত এই তিনটি হইল প্রধান আকায়েদ। জননিরাপত্তার ব্যাপারে ইহাদের প্রত্যেকটির যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। চরিত্র ও লেন-দেন যে জননিরাপত্তায় প্রভাবশীল তাহা আপনি পূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতেই আমার এই দাবী প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

নমুনা হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত আরয করিতেছি। মিথ্যা কথা না বলা, সত্য বলা, সহানুভূতি দেখানো, স্বার্থপরতায় লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি সমস্তই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। নাগরিক জীবনযাপনের কায়দা-কানুনসমূহের মধ্যে এগুলি প্রধান বিষয়। সমস্ত

পৃথিবীর শান্তি ইহাদের উপর নির্ভরশীল। ঘটনাবলী—পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত চরিত্রগুলি যদি এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—যাহাদের একজন তাওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাসী ও অপরজন বিশ্বাসী নহে, তবে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকিবে। অর্থাৎ, তাওহীদে অবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে এইসব চরিত্র সীমাবদ্ধ সময়ে প্রকাশ পাইবে। যতক্ষণ এইসব চরিত্র অবলম্বন করিলে তাহার দুনিয়ার স্বার্থ ব্যাহত না হয়, কিংবা ইহাদের বিপরীত চলিলে লোকসম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এইসব চরিত্র অবলম্বন করিবে। যদি কোথাও এমন হয় যে, এইসব চরিত্র অবলম্বন করিলে তাহার সাংসারিক ক্ষতি হয় এবং ইহাদের বিপরীত চলিলে অন্যেরা টেরও পাইবে না, ফলে দুর্নামের আশঙ্কা নাই, তবে এমন ক্ষেত্রে এই তাওহীদ ও রেসালতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি এইসব চরিত্র অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারিবে।

আমরা প্রায়ই দেখি—কাফের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তাহারা ততদিন উহা পালন করিয়া চলে, যতদিন স্বার্থ উদ্ধার হইতে থাকে কিংবা লঙ্ঘনে নিজের কোন ক্ষতি হয়। চুক্তি লঙ্ঘন করিলে যদি কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তবে তাহারা উহা লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে না।

কিংবা মনে করুন দুই ব্যক্তি একত্রে সফর করিতেছে। এক জনের নিকট এক লক্ষ টাকা আছে এবং অন্য জন উপবাসে দিনাতিপাত করে। ঘটনাক্রমে লক্ষপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন সঙ্গী ব্যক্তির সম্মুখে এক লক্ষ টাকা হস্তগত করার সুযোগ উপস্থিত। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলিতে একমাত্র নাবালেগ ছেলে আছে। মৃত ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ টাকা আছে বলিয়া অন্য কেহ ঘুণাক্ষরেও জানে না। এমতাবস্থায় নফ্‌স ও চরিত্রের মধ্যে দারুন সংঘর্ষ হইবে। চরিত্র বলিবে, এই টাকা নাবালেগ ওয়ারিসের নিকট পৌঁছানো উচিত। পক্ষান্তরে নফ্‌স প্ররোচিত করিবে যে, যখন এই টাকা আত্মসাৎ করায় কোন প্রকার দুর্নামের ভয় নাই এবং কোনরূপ বিপদেরও আশঙ্কা নাই, তখন উহা হস্তগত করা হইবে না কেন? এই দ্বিমুখী সংঘর্ষের মধ্যে আমার মনে হয় না যে, শুধু চরিত্রবল মানুষকে এহেন বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারিবে।

অতএব, যে-ব্যক্তি শুধু চরিত্র-জ্ঞানের অধিকারী এবং খোদা ও আখেরাতে বিশ্বাসী নহে, সে কিছুতেই এই খিয়ানত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। হাঁ, চরিত্র-জ্ঞানের সাথে সাথে খোদা ও কিয়ামতে বিশ্বাস থাকিলে সে অনায়াসে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কেননা, সে জানে, আমি এখানে যদিও বাঁচিয়া যাই এবং কোনরূপ শাস্তি ভোগ না করি, তথাপি কিয়ামতের দিবস অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। আমার হাতে প্রায়ই এমন ডাকটিকেট আসে—যাহাতে পোষ্টঅফিসের সীল-মোহরের কোন চিহ্ন থাকে না। আমি সেগুলি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলেও কাহারও কিছু বলিবার নাই। কেননা, ডাকঘরের কর্মচারীও তাহা জানিবে না এবং অন্য কেহও দেখিবে না। কিন্তু একমাত্র খোদার ভয়ে প্রায়ই আমি প্রথমেই এই ধরণের টিকেটগুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া দেই, এরপর পত্র পাঠ করি। এমনিভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অন্তরে খোদার ভয় বিদ্যমান থাকিলেই অন্যের অধিকার সম্বন্ধে পুরাপুরি সচেতন হওয়া যায়।

নমুনা হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিলাম। নতুবা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে 'মাআলুত্তাহ্‌যীব' পুস্তিকাটি দেখা দরকার। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবাবিষ্কৃত সভ্যতার কুফল দুনিয়াতেই প্রকাশ পাইবে। লেখক ইহার প্রত্যেকটি অনিষ্ট উল্লেখ করিয়া উপসংহারে : فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ লিখিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন নূতন সভ্যতার ধ্বজাধারীদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' মোটকথা, চরিত্র ঠিক হইলেই শান্তি ও সভ্যতা কায়েম থাকিতে পারে এবং আকায়েদ দুরুস্ত না হওয়া পর্যন্ত চরিত্র ঠিক হইতে পারে না।

॥ শরীয়তের আ'মল ও জননিরাপত্তা ॥

এখন আ'মলের প্রভাব লক্ষ্য করুন। খোদা চাহে তো ইহাও চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার ফলে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। সকলেই জানেন, নম্রতা চরিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহার অভাবে সারা বিশ্বে অনর্থের সৃষ্টি হয়। কারণ, অনর্থের উৎস হইল অনৈক্য, আর অহঙ্কার হইতে অনৈক্যের সৃষ্টি। কেননা, আপনি যদি অহঙ্কার না করেন এবং আমাকে বড় মনে করেন, আর আমিও যদি আপনাকে বড় মনে করি, তবে অনৈক্য সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐক্য লাভ করিতে হইলে নম্রতা সৃষ্টি করিতে ও অহঙ্কার মিটাইতে হইবে। নামায দ্বারা চমৎকাররূপে এই নম্রতার অভ্যাস হয়। নফ্‌সের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাকে হেয়তা শিক্ষা না দিলে ইহাতে ফেরাউনী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। নামাযের শুরুতেই আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান্)-এর শিক্ষা নিহিত আছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার মনে মুখে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করিবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা রুকূ-সেজ্‌দা করিবে এবং মাটিতে মস্তক রাখিবে, নিজকে কিরূপে বড় মনে করিতে পারে?

বলিতে পারেন যে, এইভাবে নামাযী ব্যক্তি অবশ্য নিজেকে খোদা হইতে বড় মনে করিবে না ; কিন্তু অপরাপর লোক হইতেও বড় মনে না করার তো কোন কারণ নাই। উত্তরে বলিব যে, অনভিজ্ঞতার কারণেই এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। মনে করুন, তহ্‌শীলদার ব্যক্তি নিজ ক্ষমতার জোশে তহ্‌শীলদারী করিতেছে ; কিন্তু হঠাৎ লেফ্‌টেনান্ট কিংবা গভর্ণর আগমন করিলে সে নিজেও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভাবিতে থাকে যে, তাহার সমস্ত ক্ষমতা যেন রহিত হইয়া গিয়াছে। তখন কেহ তাহাকে হুযুর বলিলেও তাহা বন্দুকের গুলীর ন্যায় অনুভূত হয়।

সেমতে যাহার অন্তরে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব আসন গাড়িয়া বসে, সে নিজেকে পিপড়ার চেয়েও বেশী অসহায় ও অক্ষম মনে করে। কেননা, উপরওয়ালার উপস্থিতিতে অধীনস্থদের উপরও কোন ক্ষমতা থাকে না। অতএব, আল্লাহু আকবারের শিক্ষায় অহঙ্কারের মুল উৎপাটিত হইয়া যায়। ফলে অনৈক্যের অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

তেমনি পাশবিক শক্তির কারণে দুনিয়াতে অহরহ যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। রোযার কারণে পাশবিক শক্তি দমিত হইয়া যায়।

যাকাতের কার্যকারিতাও তদ্রূপ। ইহাতে যে শুধু যাকাত দাতার প্রতি যাকাত গ্রহিতার অন্তরে ভালবাসা জন্মে, তাহাই নহে ; বরং অপরাপর লোকগণও যাকাত দাতাকে ভালবাসিতে বাধ্য হয়। দানশীলতার কারণেই হাতেমতায়ীকে সকলেই ভালবাসে। এই ভালবাসা হইতেই ঐক্য জন্মলাভ করে। অতএব, বুঝা গেল যে, ঐক্য স্থাপনে যাকাতের প্রভাব অনেক।

হজ্জ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে, ইহাতে সারা বিশ্বের লোক এক কাজে এক সময়ে এবং এক স্থানে একত্রিত হয়। তাহারা সকল প্রকার অহঙ্কারের বস্তু হইতে খালি হইয়া মহান দরবারে হাযির হয়। ঐক্য স্থাপনে ইহার প্রভাব অত্যধিক। যেমন পুর্বেও উল্লেখিত হইয়াছে। মনোভাবের এই ঐক্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই হজ্জের অগণিত লোকের সমাবেশে দুর্ঘটনা খুবই বিরল। অথচ হজ্জের জনসমাবেশের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের অন্যান্য সমাবেশে প্রচুর পরিমাণে দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

তবে কেহ কেহ হয়ত বদ্দুদের খুন খারাবীর কথা উঠাইবেন। আসলে তাহাদের উদ্দেশ্য লুটতরাজ ও খুন খারাবী নহে ; বরং তাহারা এক পর্যায়ে হাজীদের বেপরওয়া মনোভাবের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের দেশের গাড়ী চালকদের ন্যায়। ঘাস-পানি বেশী পরিমাণে দিলে তাহারা সন্তুষ্ট। নতুবা দেখিবেন কেমন পা ছড়াইয়া বসে—গাড়ী চালাইতেই চায় না। তেমনি বদ্দুদের মনখুশী করিলে এবং একটু বেশী পুরস্কার দিলে তাহারা হাজীদের জন্য যথেষ্ট আরামের

ব্যবস্থা করে। আপনি হয়ত শুনিয়া থাকিবেন যে, বদ্দুরা পাথর মারিয়া মারিয়া টাকা ছিনাইয়া লইয়া যায়। প্রথমতঃ এরূপ ঘটনা খুবই কম ঘটে। ঘটিলেও তাহা তথাকার বদ্দুদের দ্বারা নয় ; বরং গ্রাম্য এলাকার যেসব বুদ্দু তথায় ছড়াইয়া থাকে, তাহারাই এইসব কুকাণ্ড করে। তাহারা সব সময় এরূপ করিতে পারে না ; বরং হাজিগণ যখন নিজকে হেফাযতে রাখে না এবং কাফেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখনই এইসব দুর্ঘটনার সুযোগ হয়। মোটকথা, ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে হজ্জের প্রভাব খুব বেশী। ইহার বড় কারণ এই যে, হজ্জের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম আপাদমস্তক নম্রতায় পরিপূর্ণ।

॥ শরীয়তের সামাজিকতা ও জননিরাপত্তা ॥

বাকী রহিল সামাজিকতার কথা। চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, সামাজিকতার যে-সমস্ত রীতিনীতি হইতে অহঙ্কার ফুটিয়া উঠে, শরীয়তে একমাত্র সেগুলিই না-জায়েয। উদাহরণতঃ, নাজায়েয চালচলন শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা, যাবতীয় নাজায়েয চালচলন হইতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যাহারা শরীয়ত-বিরোধী চালচলনে অভ্যস্ত, তাহারা এখন আপন মনের অবস্থা নোট করুন। এরপর এক সপ্তাহকাল শরীয়তসম্মত চালচলন অবলম্বন করিয়া তখনকার মনের অবস্থার সহিত পুর্বের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। আমার এই বক্তব্যটি মোটেই দুর্বোধ্য নহে ; বরং সকলেই অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারেন।

এ সম্পর্কে আরও একটি বক্তব্য আছে। তাহা উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। তাহা এই যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেমতে আ'মল, আকায়েদ ও সামাজিকতারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা এই যে, এগুলির ফলে অন্তরে এক প্রকার নূর পয়দা হয়। এই নূরের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান হইয়া যায়। সে কাহাকেও কোন রকম কষ্ট দেয় না। হাদীসে বলা হইয়াছে : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ 'যাহার মুখ ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে—অর্থাৎ, সে তাহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়, সে-ই সত্যিকার মুসলমান।'

পরিশেষে আমি আরও একটি বিষয় বর্ণনা করিতেছি। ইহা ধর্মের সবগুলি অঙ্গেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। তাহা এই যে, সাংসারিক উপকার ধর্মের উদ্দেশ্যই নহে; বরং ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল খোদার সন্তুষ্টি বিধান। খোদা তা'আলা রাযী হইলে তিনি নিজেই সাংসারিক মঙ্গলসমূহেরপথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝

“যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য (সাংসারিক বিপদাপদ হইতে) মুক্তির পথ খুলিয়া দেন এবং এমন স্থান হইতে রুজী পৌঁছাইয়া দেন যাহা তাহার কল্পনায়ও থাকে না।”

এইভাবে ধর্মের সংশোধনের ফলে দুনিয়ার সংশোধন হয়। তবে ধর্মের কাজ এই নিয়তে করিবেন না যে, খোদা রাযী হইলে দুনিয়ার উদ্দেশ্য সফল হইবে ; বরং কবির ভাষায় একমাত্র এই নিয়তে করা ঃ

دلارامے کہ داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

(দিলারামে কেহ্ দারী দিল দরো বন্দ + দিগর চশ্‌ম আয হামা আলম ফেরুবন্দ)

অর্থাৎ, ‘তোমার যে প্রেমাস্পদ রহিয়াছে—উহাতেই অন্তরকে আবদ্ধ রাখ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখ।’

সাংসারিক মঙ্গলের কথা নিয়তের সম্মুখে উপস্থিত হইলে এই কবিতা পড়িয়া দিন :

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار + بگزارند وخم طرۂ یارے گیرند

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار + کار ملک ست آنکه تدبیر و تحمل بایدش

(মাছলেহাত দীদেমান আঁনাস্ত কেহ্ ইয়ারাঁনে হামাকার
বগুযারান্দ ও খুম তুর্‌রায়ে ইয়ারে গীরান্দ
রেন্দে আলম সূয রা বামাছলেহাত বীনী চেহ্‌কার
কারে মুল্‌ক আস্ত আঁকেহ্ তাদবীর ও তাহাম্মুল বায়াদশ)

‘ইহাই মঙ্গল যে, প্রেমিকগণ সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া প্রেমাস্পদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া রাখিবে। সংসার প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির জন্য মঙ্গলের প্রতি লক্ষ করার কি দরকার ? কলাকৌশল অবলম্বন ও সহনশীলতা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপার বৈ নহে।’

মঙ্গল লাভ আমাদের লক্ষ্য না হইলেও তাহা অবশ্যই হাছিল হইবে। অনুগত চাকর তাহাকেই বলা হয়, যে প্রভুর সন্তুষ্টিকে আপন মঙ্গলের উপর অগ্রাধিকার দেয় এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না। পক্ষান্তরে এরূপ না করিলে সেই চাকরকে স্বার্থপর বলা হইবে। প্রভুর সন্তুষ্টি বিধান করিলে প্রভু নিজ গুণে চাকরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। বলিতে কি, কাহারও নির্দেশের অনুগত থাকার মধ্যেই শান্তি নিহিত রহিয়াছে। নির্দেশের মঙ্গলামঙ্গল বোধগম্য হউক বা না হউক। প্রত্যেক কাজেই মঙ্গল চিন্তা করিলে কোন কাজ করিতে পারিবে না। অফিসের কর্মচারী অফিসের কাজের সময়ও যদি হিসাব করিতে থাকে যে, বেতনের টাকা কোথায় কোথায় কত ব্যয় করা হইবে, তবে তাহার অফিসের কাজ নষ্ট না হইয়া পারে না।

জনৈক কেরানীর একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা সে স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিতেছিল। ঘটনাক্রমে এক পাখী তথায় পায়খানা করিয়া দেয়। সে রাগ

হইয়া পাখীটিকে খুব নোংরা একটি গালি ঝাড়িয়া দিল। গালির দিকে বেশী মনোনিবেশ হওয়ার কারণে গালিটি অলক্ষেই চিঠিতে লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। পত্র পাইয়া স্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হঠাৎ বিনামেঘে এই বজ্রপাতের কারণ জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিলে কেরানী সাহেব আদ্যোপান্ত ঘটনা জানাইয়া দিল। সবকিছুতেই মঙ্গলামঙ্গলের পিছনে পড়িলেও এইরূপ অবস্থা হইতে বাধ্য। অর্থাৎ, আসল কাজই পণ্ড হইয়া যাইবে।

মোটকথা, কাজের সময় ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া স্বয়ং কাজের জন্য বাধাস্বরূপ। বন্ধুগণ, যেসব মজুর সড়ক পিটায়, তাহারা যদি পিটাইবার সময় পয়সার কথা চিন্তা করে, তবে সে অবশ্যই নিজ শরীরে আঘাত পাইবে। আঘাত হইতে বাঁচিতে হইলে তখন মজুরীর কথা চিন্তা করা যাইবে না; বরং কাজের প্রতিই ধ্যান রাখিতে হইবে। দুনিয়ার কাজ-কর্মে মানুষ এইসব রীতিনীতিকে জরূরী মনে করে। অথচ ধর্মের কাজেও ইহা জরূরী হওয়া সত্ত্বেও এগুলি পালন করে না।

আমি এ সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য পেশ করিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জননিরাপত্তার ব্যাপারে ধর্মানুগত্যের প্রভাব অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রকার রুচির কারণেই আমি তিন প্রকার বক্তব্য উপস্থিত করিলাম। ধর্মীয় আইন-কানুনের ইহাই সৌন্দর্য যে, ইহাদের দ্বারা প্রত্যেক রুচি অনুযায়ীই ধর্মের সৌন্দর্য প্রমাণিত হইয়া যায়। কাজেই ধর্ম যেন নিম্নোক্ত কবিতারই হুবহু প্রতীক :

بہار عالم حسنش دل وجاں تازہ میدارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

(বাহারে আলমে হুস্‌নাশ দিল ও জাঁ তাযা মীদারাদ
বরঙ্গ আছহাবে ছূরত রা ববূ আরবাবে মা'না রা)

কোরআনের বিশ্ব-সৌন্দর্য যাহার মন-প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। বাহ্যদর্শী অর্থাৎ, যাহারা শুধু পাঠ করিতে জানে, তাহাদিগকে রং দ্বারা এবং ভাবান্বেষী অর্থাৎ, যাহারা অর্থও বুঝে, তাহাদিগকে সুগন্ধি দ্বারা সঞ্জীবিত করে।

মোটের উপর যে দিক দিয়াই চান, যাচাই করুন এবং করান, আলহামদুলিল্লাহ্ একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, একমাত্র খোদার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমেই শান্তি স্থাপন সম্ভবপর। প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মুসলমান নহে এমনও অনেক জাতি রহিয়াছে। তাহারা শরীয়তের আহ্‌কামেরও পাবন্দী করে না। তাহাদের মধ্যে কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে? আমি পূর্বেই ইহার মোটামুটি উত্তর দিয়াছি। এখন উহার বিস্তারিত বিবরণ "মা'আলুত্তাহ্‌যীব" পুস্তিকায় দেখিয়া লইতে বলিতেছি। পুস্তিকাটি নেযামী ছাপাখানা, কানপুর—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। উহাতে নয়টি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তিকাটি মুসলমান ছেলেদিগকে পড়াইবার যোগ্য।

মোটকথা, একমাত্র ধর্মের উপরই যে, সাধারণ শান্তি নির্ভরশীল, তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল।

॥ বিদ্রোহের পরিণাম ॥

হাদীসে বলা হইয়াছে : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ "যত দিন পৃথিবীতে কোন 'আল্লাহ্' নাম উচ্চারণকারী বিদ্যমান থাকে তত দিন কিয়ামত আসিবে না।" উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসের মতলবও খুব সম্ভব বোধগম্য হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহার কারণ এই যে, ইসলাম আনুগত্যের ধর্ম আর কুফর পরিষ্কার বিদ্রোহ। পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের রীতি এই যে, কোন শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেশী হইলে সেখানে তো কামান দাগিয়া দেওয়া হয়। যদি খোদা তা'আলাও এরূপ করিতেন, তবে প্রায় সময়ই তোপ কামান গর্জিতে থাকিত। কিন্তু খোদা তা'আলা আপন রহমতে এই আইন করিয়া দিয়াছেন যে, একজন বাদে সকলেই বিদ্রোহী হইয়া গেলেও একজনের বদৌলতে সকলেই নিরাপদ থাকিবে। হাঁ, বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িলে তাহা দমন করার জন্য ধ্বংস কার্যও ব্যাপক হইবে।

ইহাতে আরও একটি বিষয় বোধগম্য হইয়া গেল। তাহা এই যে, অনেক আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী অসহায় ব্যক্তিদিগকে আপনি ঘৃণার চোখে দেখেন বটে, কিন্তু তাহারাই আপনার স্থায়িত্বের কারণ। একজনের কারণে সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা—আল্লাহ্ তা'আলার এই যে নিয়ম, আমাদেরও উচিত ইহার অনুসরণ করা। শায়খ বলেন : مراعات صد کن برائے یکے একজনের কারণে সকলের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখ। আরও বলেন : خورند از برائے گلے خارها 'একটি ফুলের জন্য দশ জায়গায় কাঁটার খোঁচা খায়।' এহেন খোদার নাম উচ্চারণকারী অসহায় লোকদের খাতিরে আমাদেরও কষ্ট সহ্য করা উচিত। মোটকথা, এরূপ লোক একজনও অবশিষ্ট না থাকিলে তখন কামান দাগিয়া দেওয়া হইবে এবং সবকিছু ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। অতএব, আনুগত্য দ্বারাই তামাদ্দুন ও শান্তির স্থায়িত্ব।

এখন বুঝা দরকার যে, আনুগত্য একটি আ'মল এবং এল্‌ম ব্যতীত আ'মল না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই জননিরাপত্তার জন্য এল্‌মে-দ্বীনের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। আলেমগণ হইলেন এল্‌মে-দ্বীনের ধারক। এখন বলুন, এই দলটি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী দরকারী হইল, না সবচেয়ে বেশী বেকার ?

আমার বক্তব্যের কোন অংশে কাহারও সন্দেহ থাকিলে বিসমিল্লাহ্ আমি সর্বদাই তাহা নিরসণের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি কোনরূপ ভাবালুতার আশ্রয় লই নাই এবং কাহারও পক্ষপাতিত্ব করি নাই : আমি পরিষ্কার বলিতেছি যে, আলেমদের দুর্নাম রটনাকারীদের মধ্যে কেহ কেহ নেক মনোভাব সম্পন্নও আছেন। তাঁহারা আমার

আলোচনা হইতে স্বতন্ত্র। তবে তাঁহারাও নিজেদের সংশোধন করার পর আলেমদের দলে ভিড়িতে চাহিলে তাঁহাদিগকে স্বাগতম জানানো হইবে। কবির ভাষায় :

هرکه خواهد گو بیاو هرکه خواهد گو برو

داروگیر و حاجب ودربان دریں درگاه نیست

(হরকেহ খাহাদ গো বেয়াও হরকেহ খাহাদ গো বেরু
দারুগীর ও হাজেব ও দরবাঁ দরইঁ দরগাহ নীস্ত)

অর্থাৎ, 'যে আসিতে চায়, তাহাকে আসিত বল এবং যে বাহির হইতে চায়, তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বল। এই দরবারে বাধাদানকারী দারোয়ান ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নাই।' লক্ষ বছরের এবাদতকারী যদি গোঁ ধরে, তবে তাহাকে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দাও এবং লক্ষ বছরের কাফের আসিতে চাহিলে বিসমিল্লাহ্ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ কর।

॥ তালেবে এল্‌ম ও জনগণ ॥

বন্ধুগণ! আশা করি উপরোক্ত বর্ণনায় মুসলমানদের সম্মুখে প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন আমি নেহায়েত আদবের সহিত তালেবে এল্‌মদিগকেও সামান্য কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু এল্‌ম ও আমলের কারণেই আপনাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা আপনারা কিছুই নহেন। আরও স্মরণ রাখুন—খাদ্য যতই নরম ও সুস্বাদু হয়, তাহা ততই বেশী ও তাড়াতাড়ি দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। অতএব, সঠিক পথে থাকিলে আপনাদের সত্তা যত বেশী উপকারী, সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাদের সত্তা তত বেশী ক্ষতিকর ও ফাসাদের কারণ। এই জন্য নিজেকে সংশোধন করাও আপনাদের পক্ষে নেহায়েত জরুরী। আপনাদের সংশোধন দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথমতঃ, ছাত্রাবস্থায় দ্বীনদার উস্তাদ নির্বাচন করুন। ধর্মভ্রষ্ট উস্তাদের নিকট কখনও শিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। ছাত্রাবস্থা বীজ বপণের সময়। দ্বিতীয়তঃ, কিছু দিন লেখাপড়া করার পর কোন খোদা পরস্ত বুযুর্গের সংসর্গ অবলম্বন করুন। এগুলি করিলেই আপনারা দ্বীনের খাদেম হইতে পারিবেন। জনগণ তখন আপনাদের পদযুগল ধৌত করার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

॥ গায়ের আলেমের প্রতি সম্বোধন ॥

এখন আলেম নহে—এরূপ ব্যক্তিদিগকেও আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আপনারা যদি কোন আলেমকে উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন না দেখেন, তবে তাহার কথা বাদ দিন, তাহার অনুসরণ করিবেন না। সে কোন সরকারী লোক নহে যে, উপেক্ষা করিলে ক্ষতি হইবে। তবে স্মরণ রাখিবেন, প্রকৃত গুণসম্পন্ন আলেমও এইসব

নিষ্কর্মাদের মধ্যেই মিশিয়া থাকেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য ইহাদের খেদমত করুন। তবেই তাহাকে পাইবেন। مراعات صدکن برائے یکے 'একজনের জন্য একশত জনের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' ইহার অর্থও তাহাই।

শায়খ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি মেহ্‌মান ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। এক দিন ঘটনাক্রমে জনৈক অগ্নি পূজারী মেহ্‌মান হইল। সে খানা আরম্ভ করিতে যাইয়া বিসমিল্লাহ্ বলিল না। ইহাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) রুষ্ট হইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ এই মর্মে ওহী নাযিল হইল :

گر آدمی برد پیش آتش سجود + تو واپس چرا میکشی دست جود

خورش ده بکنجشک وکبک وحمام + که شاید همائے در افتاد بدام

(গর আদমী বুরাদ পেশে আতশ সুজুদ + তূ ওয়াপেস চেরা মীকাশি দস্তে জুদ খুরাশ দেহ্ বকন্‌জশক ও কবক ও হামাম + কেহ্ শায়াদ হুমায়ে দর উফতাদ বদাম)

"কোন ব্যক্তি যদি অগ্নির সম্মুখে সেজ্‌দা করে, তবে তুমি আপন দানের হস্ত টানিয়া লইতেছ কেন ? চড়ূই, কবুতর ও কাককে খোরাক দাও। এইভাবে হুমা পক্ষীও জালে পড়িয়া যাইতে পারে।" আরও বলেন :

چو هر گوشه تیر نیاز افگنی + بناگاه بینی که صیدے کنی

(চূ-হর গুশা তীর নেয়ায আফগানী + বনাগাহ্ বিনী কেহ্ ছায়দে কুনী)

অর্থাৎ, "চতুর্দিকে আকাঙ্ক্ষার তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, তুমি একটি না একটি শিকার ধরিয়া ফেলিয়াছ।"

কোন শিকারী হুমা পক্ষী শিকার করিতে চাহিলে সে চিল কাককে উড়াইয়া দেয় না। ইহাদের সঙ্গেই হুমা পক্ষীও জালে আবদ্ধ হইয়া যায়।

তদ্রূপ আমরা যদি বাছাই করিয়া ছেলেদিগকে শিক্ষা দেই এবং তাহাদের দোষ খুঁজিয়া বাহির করি, যেমন আজকাল করা হয়, তবে খোদার কসম, অনেক মেধাবী ছেলেও এল্‌মের দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। কেননা, এমন অনেক ছেলে দেখা যায়, যাহাদের যোগ্যতা প্রথম -প্রথম ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাদের জ্ঞান-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। সুতরাং সকলেরই খেদমত করা উচিত। তাহাদের মধ্য হইতেই মনিমুক্তা বাহির হইয়া আসিবে।

জনৈক বাদশাহযাদার মণি রাত্রিবেলায় জঙ্গলে পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে বাদশাহযাদা নির্দেশ দেন—জঙ্গলের সমস্ত কঙ্কর একত্রিত কর, আলোতে দেখিয়া লইব। অবশেষে উহাদেরই মধ্য হইতে মণি বাহির হইয়া আসিল।

কাজেই আপনি বাছাই * করা হইতে বিরত থাকুন এবং তাহাদের কোন কাজেই প্রতিবাদ করিবেন না। হাঁ, আপনি যদি তালেবে এল্‌মদের সহিত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আপন সন্তান মনে করেন, তবে আদর ও হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহাদের দোষ-ত্রুটিতে শাসন করুন। ইহাতে তাহারা বুঝিবে যে, "শাসন তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো।"

آں را کہ بجائے تست ہر دم کرمے + عذرش بنہ ار کند بعمرے ستمے

(আঁরা কেহ্ বজায়ে তুস্ত হরদম করমে + ওযরাশ বেনেহ্ আর কুনাদ বওম্‌রে সেতামে)

অর্থাৎ, 'যে-ব্যক্তি তোমার প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহ করে, সে কোন সময় কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ।'

মোটকথা, সন্তানের যতদুর শাসন করা যায়, ততদুর শাসন করার অনুমতি আছে। এর বেশী নহে।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে আলেম ও ধর্মের প্রয়োজন খুব বেশী। তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখুন। কিন্তু সম্পর্ক রাখার অর্থ এই নয় যে, চাঁদার টাকা দিয়াই নিশ্চিত হইয়া যাইবেন। টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌ই দিবে ; বরং তাহাদের সহিত খোলা মনে মিলিত হউন, তাহাদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করুন। এইভাবে আপনাদের মনে ধর্ম ও ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে। হাদীসের এই সত্য ওয়াদাও আপনাদের বেলায় পূর্ণ হইয়া যাইবে : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (কিয়ামতের দিন) "মানুষ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে উত্থিত হইবে, দুনিয়াতে যাহাকে সে ভালবাসিত।" তাহাদের প্রতি যদি আপনাদের ভালবাসা জন্মে, তবে খোদা চাহে তো খোদার প্রতিও সত্যিকারের ভালবাসা জন্মিবে। কেহ কেহ আলেমদের প্রতি মনোযোগ দেয় না ; কিন্তু এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, আলেমগণ আমাদের কোন খবর লয় না। ভাইগণ, রোগী নিজেই চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসক স্বেচ্ছায় রোগীর নিকট যায় না। এমতাবস্থায় চিকিৎসক সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় না কেন ? সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা নাজায়েয এবং আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা জায়েয—আপনাদের ধারণা তাই নহে কি ?

---

* এই বাছাই না করার উক্তিটি ঐ তালেবে এল্‌মের বেলায় প্রযোজ্য, যাহার শুধু উপকারী না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য যে তালেবে এল্‌ম ধর্মের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া জানা যায়, তাহাকে অনুসৃত হওয়ার সীমা পর্যন্ত কখনও পড়াইবেন না। তবে আমলের উপযুক্ত শিক্ষা তাহাকেও দেওয়া ফরয।

বন্ধুগণ, আপনারা আলেমদিগকে স্বীয় অবস্থা কবে জানাইলেন? আপনারা যদি দুইবার তাহাদের নিকট যাইয়া নিজ রোগের অবস্থা জানান, তবে তাঁহারা এতই মেহেরবান যে, নিজে চারিবার আসিয়া খবর লইবেন। আজকাল মৌলবীগণ এই কারণেও দূরে সরিয়া থাকেন যে, স্বেচ্ছায় আপনাদের নিকট গেলে উহাকে স্বার্থপরতা মনে করা হয়। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদোক্তি আছে:

نِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ وَ بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ

যে ধনী ব্যক্তি গরীবের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, সে খুবই ভাল এবং যে গরীব ব্যক্তি ধনীর দুয়ারে হাযির হয়, সে খুবই মন্দ।

সম্পর্ক রাখার ইহাই হইল অর্থ। আপনি তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিলে, তাঁহারাও আপনার প্রতি বেশী মনোনিবেশ করিবেন। ইহাতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি হইবে। তবে দুনিয়াদারদের তরফ হইতেই ইহার সূচনা হওয়া দরকার। এইরূপ সম্পর্কের মাধ্যমেই আপন সন্তানদিগকে এলমে-দ্বীন শিক্ষা দিন।

মোটকথা, এগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহা হাছিল করার জন্য সচেষ্ট হউন। এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। দোআ করুন, খোদা যেন আমাদিগকে এল্‌ম ও আমলের তৌফীক দেন।

গাফলতের কারণ

আওলাদের ও মালের মহব্বত সম্পর্কে এই ওয়াজ মুরাদাবাদস্থ মসজিদ পীর গায়েবে ২৫শে ছফর ১৩৩১ হিঃ বাদ আছর অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এক ঘণ্টা পনর মিনিট পর্যন্ত চলে। মাওলানা ছায়ীদ আহমদ সাহেব থানবী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

◉

মানুষ মনে করে যাহাকিছু তাহার নিকট আছে সবই আমাদের মাল; সুতরাং যথা ইচ্ছা তাহা ব্যয় করিব। কিন্তু ইহা মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের নিকট যাহা আছে সবকিছুই হক তা'আলার। সে শুধু আমানতদার। খোদা যেখানে অনুমতি দেন শুধু সেখানেই তাহা ব্যয় করিবার অধিকার আছে। খোদা যেক্ষেত্রে ব্যয় করিতে নিষেধ করেন, সেখানে ব্যয় করার অধিকার তাহার মোটেই নাই।

◉

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ০

আয়াতের অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে তোমাদের মাল আওলাদ যেন খোদার স্মরণ হইতে গাফেল না করিয়া দেয়। যাহারা এরূপ করিবে, তাহারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বক্তব্য নির্ধারণ ॥

উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে ইহা শুনিয়া লওয়া জরূরী যে, মহিলাদিগকে উপকার পৌঁছানই অদ্যকার বর্ণনার প্রধান লক্ষ্য। মহিলাগণ পাঠ্যপুস্তক স্বল্পই পাঠ করে কিংবা মোটেই করে না। তাছাড়া তাহারা আলেমদের সংসর্গ খুবই কম লাভ করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি খুবই সাদাসিধা। তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে বিষয়বস্তু সাদাসিধা বর্ণনা করা হইবে। সেমতে এই বর্ণনা শুনিয়া হয়তো শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে আনন্দ দান আমার উদ্দেশ্যও নহে। জিজ্ঞাসা করি, ঔষধ পান করিয়া কে আনন্দ লাভ করিতে চায়? ঔষধ পান করার আসল উদ্দেশ্য হইল রোগমুক্তি। সেজন্য ঔষধ যতই তিক্ত ও বিস্বাদ হউক না কেন, উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক ও উপকারী হওয়ার দরুন তাহা সহ্য করিয়া লওয়া হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য ওয়াযও ঔষধের ন্যায় সেমতে আনন্দ উপভোগ ইহার লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। ওয়াযের মধ্যে আনন্দরস সঞ্চার করার প্রতি মনোযোগী হওয়াও ওয়ায বর্ণনাকারীর পক্ষে সমীচীন নহে। তবে আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত না হইলে এমন জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু বর্ণনা করায় দোষ নাই—যাহাতে শিক্ষিত লোকগণ আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। উদাহরণতঃ চিকিৎসকগণও ঔষধের সহিত চিনি মিছরী অথবা শরবত মিলাইয়া দেন—যাহাতে মানুষের রুচি সহজে তাহা কবুল করিতে পারে। এক্ষণে যেহেতু মহিলারাই সম্বোধিত এবং তাহাদের উপকার পৌঁছানোই প্রধান লক্ষ্য, তাহারা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আকৃষ্ট নহে এবং উহাতে আনন্দও পায় না, এই কারণে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা এড়াইয়া যাইব। তবে ইহাতে অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রসঙ্গক্রমে কোন বিষয় আসিয়া পড়া অসম্ভব নহে।

অদ্য যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করি না কেন, তাহা এমন হইবে না যে, পুরুষগণ তাহা দ্বারা উপকৃত হইবে না। তাহারাও নিঃসন্দেহে উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিবে। অন্ততঃ পক্ষে এই উপকারটি তো অবশ্যই হইবে যে, তাহারাও মাঝে মাঝে আপন আপন মহিলাদিগকে তাহা শুনাইতে পারিবে। তবে যেহেতু প্রধানতঃ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়াই কথা বলা হইবে, এই কারণে আমি প্রথমেই পুরুষদিগকে সতর্ক করিয়া দিলাম যে, এখনকার বর্ণনায় তাহাদের রুচির প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না; বরং মহিলাদের রুচি ও বিবেক-বুদ্ধির প্রতিই বেশীর ভাগ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনা করা হইবে। কারণ, কেহ হয়তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু শ্রবণের অপেক্ষায় থাকিবে। সুতরাং তাহার উচিত, এই অপেক্ষায় না থাকিয়া শুধু উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

এই ভূমিকার পর এখন আসল বক্তব্য পেশ করিতেছি। অবশ্য সময়াভাবে এখন বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নাই। আছরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত বর্ণনা

করারই ইচ্ছা। এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশী বিস্তারিত বর্ণনা হইতে পারে না। তাই আমরা বেশীর ভাগ যেসব বিষয়ের সম্মুখীন, সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে শুধু সেগুলিই বর্ণিত হইবে। সমুদয় খুঁটিনাটি বর্ণনা করা একেতো এমনিতেই অসম্ভব, তাছাড়া এখন সময়ও সঙ্কীর্ণ।

॥ গোনাহ্‌র কারণসমূহ ॥

মোটকথা, এক্ষণে একটি বিশেষ নিন্দনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্যাপকভাবে সমস্ত লোক এবং বিশেষ করিয়া মহিলাগণ এই অবস্থার সহিত জড়িত হইয়া থাকে। এই বিশেষ অবস্থাটি এবং ব্যাপকভাবে সকলেই ইহাতে লিপ্ত কি না, আয়াতের তরজমার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। উল্লেখিত আয়াতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কারণে গাফেল হইয়া যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হক তা'আলা আরও সতর্ক করিয়াছেন যে, যাহারা এই সমস্তের কারণে গাফেল হইয়া যাইবে, তাহারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। এক্ষণে স্বীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির সম্পর্কই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোনাহের কারণ হইয়া থাকে। হক তা'আলা ইহাতেই বাধাদান করিয়া বলেন যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির সহিত তোমাদের এমন সম্পর্ক না থাকা উচিত—যাহাতে তোমরা খোদার যিক্‌র হইতে গাফেল হইয়া পড়।

আয়াতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বলিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্‌র যিকরের উদ্দেশ্যেই এবাদতের সৃষ্টি। এই কারণে 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র' বলিয়া এবাদত বুঝানো হয়। (তবে একটি বলিয়া অপরটি বুঝাইবার গূঢ় রহস্য এই যে, গাফেল হওয়া খোদার অবাধ্যতার কারণ। আয়াতে لَا تُلْهِكُمْ বলিয়া ইহা বুঝানো হইয়াছে এবং গাফেল হওয়ার কারণ হইল দুনিয়ার সহিত অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন। أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে। মাল ও আওলাদের অর্থ হইল এতদুভয়ের সমষ্টি অর্থাৎ দুনিয়া। যেহেতু এই দুইটি দুনিয়ার বৃহৎ অঙ্গ—এই কারণে বিশেষভাবে এই দুইটিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবাদতের পরিবর্তে 'যিক্‌রুল্লাহ্' বলিয়া এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, গাফলতের বিপরীত জিনিসটি অর্থাৎ যিকর হইল এবাদতের কারণ এবং যিক্‌রের কারণ হইল খোদার সহিত অন্তরের সম্পর্ক। اللّٰه শব্দের দিকে ذِكْر শব্দের اضافت বা সম্বন্ধ দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে।) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই এবাদত হইতে গাফেল হওয়ার কারণ হইয়া থাকে। এবাদত হইতে গাফেল হওয়াই গোনাহ্। এতএব, প্রমাণিত হইল যে, মাল ও আওলাদের সম্পর্কই বেশীর ভাগ গোনাহের কারণ। তাই হক তা'আলা ইহাদের কারণে গাফেল হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, হক তাআলা হাকীম

(নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞানী)। হাকীম ব্যক্তির কোন কথা অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত হয় না। অতএব, দুনিয়ার অন্যান্য সব জিনিস বাদ দিয়া শুধু ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এবাদত হইতে গাফলত অর্থাৎ গোনাহ্ করার পিছনে এই দুইটি বস্তুর বেশী প্রভাব রহিয়াছে।

তাছাড়া, মানুষ যে গোনাহে বেশী লিপ্ত হয় এবং যাহা বেশীর ভাগ ঘটিয়া থাকে খোদা ও রাসূলের কালামে স্পষ্টভাবে সেই গোনাহ্ সম্বন্ধেই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করা হয়; ইহাই রীতি। পক্ষান্তরে যেই গোনাহে বেশী লিপ্ত হয় না এবং যাহা বেশী সংঘটিত হয় না। উহা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয় না। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নিষেধ করার প্রয়োজনই হয় না।

উদাহরণতঃ, শরীয়তে শরাব পান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে; কিন্তু প্রস্রাব পান করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয় নাই। কেননা, মানুষ শরাব পানে অধিক পরিমাণে লিপ্ত ছিল: কিন্তু প্রস্রাব পানে কেহই লিপ্ত ছিল না। এই কারণে প্রথমোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং শেষোক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব, কোন বিষয়কে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করিলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষ উহাতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত রহিয়াছে।

সুতরাং মাল ও আওলাদের কারণে গাফেল হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে হক তা'আলার তরফ হইতে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি বিষয় বেশীর ভাগই গোনাহের কারণ হইয়া থাকে। স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, মাল ও আওলাদের কারণে কি পরিমাণ গোনাহ্ হইয়া থাকে।

॥ মাল ও আওলাদের স্তর ॥

উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, মালের ব্যাপারে আ'মল করার দুইটি স্তর রহিয়াছে। (১) মাল উপার্জন করার স্তর ও (২) উহা সংরক্ষণ করার স্তর। তদ্রূপ আওলাদের ব্যাপারেও দুইটি স্তর আছে। (১) আওলাদ লাভ করা ও (২) তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর একটি তৃতীয় স্তরও রহিয়াছে। তবে ইহা মাল ও আওলাদ উভয়টির মধ্যে পৃথক পৃথক বিষয়। প্রথমোক্ত দুইটি স্তরের ন্যায় উভয়ের জন্য এক সমান নহে। মালের ব্যাপারে তৃতীয় স্তর হইল উহা ব্যয় করা এবং আওলাদের ব্যাপারে তৃতীয় স্তর হইল তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা। মোটকথা, মালের ব্যাপারে আ'মল করার তিনটি স্তর এবং আওলাদের ব্যাপারে আ'মল করার তিনটি স্তর রহিয়াছে। মালের ব্যাপারে তিনটি আমল হইল :—

(১) মাল উপার্জন করা, (২) মাল সংরক্ষণ করা, (৩) মাল ব্যয় করা আওলাদের ব্যাপারে আমলের তিনটি স্তর হইল ঃ

(১) আওলাদ লাভ করা, (২) আওলাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, (৩) অতঃপর তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা।

মোট ছয়টি স্তর হইল। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি আ'মলের স্তর। এখন এই ছয়টি স্তরের সংক্ষেপে নিজ নিজ অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আমরা এগুলিতে কি পরিমাণ গোনাহ্ করিতেছি। উদাহরণতঃ, মালের তিনটি স্তরের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, ইহা আমাদিগকে কেমন নাচ নাচাইতেছে। মালের প্রথম স্তর হইল উহা উপার্জন করা। ইহাতে আমাদের অসাবধানতার অন্ত নাই। কেহ যদি একবার নিয়ত করিয়া ফেলে যে, এই পরিমাণ মাল হাতে আসা চাই, তখন সে হালাল ও হারামের পার্থক্য করিতে পারে না। যেভাবেই পারে, মাল উপার্জন করে। ইহাতে মোটেই সাবধানতা অবলম্বন করে না।

আমি নিজের অবস্থা বলিতেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদিয়া (উপঢৌকন) লওয়ার ব্যাপারে আমি কতিপয় শর্ত ও নিয়ম নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন, প্রথম সাক্ষাতেই কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করি না। এসবের পরেও আরও একটি নিয়ম রাখিয়াছি এই যে, কাহারও নিকট হইতে তাহার এক দিনের উপার্জন হইতে বেশী গ্রহণ করি না। উদাহরণতঃ কাহারও মাসিক আমদানী ৩০'০০ টাকা হইলে তাহার নিকট হইতে একবারে এক টাকার বেশী লই না। একবার হাদিয়া দিলে দ্বিতীয় বারের মধ্যে এক মাসের ব্যবধান হওয়া শর্ত করিয়া দিয়াছি— যাহাতে কেহ একমাসের মধ্যেই এক দিনের আমদানী হইতে বেশী না দিতে পারে। এসব সত্ত্বেও কোন দরকারউপস্থিত হইলে এবং তজ্জন্য বিশেষ পরিমাণ টাকার প্রয়োজন অনুভূত হইলে চক্ষু বন্ধ করিয়া টাকা গ্রহণ করা হয়। তখন ঐ সব নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। দুঃখের বিষয়, মাঝে মাঝে এইভাবে গৃহিত টাকা দ্বারা নিজের কোন উপকার হয় না ঃ বরং অন্যের নিয়তেই কিছু টাকা যোগাড় করার লক্ষ্য থাকে। ইহাতেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না।

॥ মাল উপার্জনে অসাবধানতা ॥

উদাহরণতঃ, কোন নেক কাজের জন্য যদি মনে মনে স্থির করা হয় যে, উহার জন্য এই পরিমাণ টাকা যোগাড় করিতে হইবে, তখন হালাল ও হারামের মোটেই পরওয়া করা হয় না। সর্বনাশের কথা এই যে, যাহারা নিজস্ব প্রয়োজনে টাকা উপার্জন করার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে, নেক কাজের জন্য টাকা লওয়ার বেলায় তাহারাও সাবধানতা অবম্বলন করে না। বর্তমানের বালকান যুদ্ধের

জন্য চাঁদা সংগ্রহের হিড়িক পড়িয়াছে। ইহাতে আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, যেসব সতর্ক লোক নর্তকী ও বেশ্যাদের নিকট হইতে কখনও টাকা লইত না, তাহারা বিনাদ্বিধায় ইহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইয়াছে।

তদ্রূপ মাদ্রাসা, সমিতি ইত্যাদির চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে, এরূপ খোদার বান্দা খুবই কম। এই ব্যাপারে সাবধান ব্যক্তিরাও এইরূপ মনে করে যে, নিজের বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর। কেননা, সাবধানতা অবলম্বন করার ফলে আমদানী কম হইলে নিজে কিছুটা কষ্ট সহ্য করিয়া লইলেই চলিবে, দুই বেলার পরিবর্তে এক বেলা খাইবে কিংবা উত্তম পোশাকের পরিবর্তে সামান্য নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিবে ; কিন্তু মাদ্রাসা, সমিতি অথবা তুরস্কবাসীদের জন্য চাঁদা উঠাইবার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করা কিরূপে সম্ভবপর ? এখানে তো দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতেই হইবে। ইহার কম হইলে চলিবে না। অতএব, যেখানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিলেই এই বিরাট অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর। তাছাড়া নফ্‌স আরও বুঝায় যে, ইহা তো খোদার কাজ—তোমার নিজস্ব কাজ নহে। ইহাতে সামান্য চক্ষু বন্ধ করিয়া কাজ করিলে ক্ষতি কি ?

বলিতে কি, মৌলবীদের নফ্‌সও মৌলবী হয় এবং দরবেশদের নফ্‌সও দরবেশ হইয়া থাকে। তাহাদের নফ্‌স উপরোক্তরূপ হিলা-বাহানা বলিয়া দেয়। অথচ ইহা বিরাট ভ্রান্তি বৈ কিছু নহে। কেননা, নিজের ব্যবহারের জন্য গোনাহ্ করিলে কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। কমপক্ষে নিজের পকেটে টাকা আসে, কিন্তু ধর্মের কাজে গোনাহ্ করিলে কোন উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। কেননা, ধর্মের কাজের উদ্দেশ্য হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা। গোনাহ্ দ্বারা তাহা কিরূপে হাছিল হইতে পারে ? তাছাড়া নিজের গাটে টাকা না আসা জানা কথা। কেননা, উহা তো অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে। অতএব, আপনি মধ্যস্থলে খালি হাতেই রহিয়া গেলেন এবং গোনাহে লিপ্ত হইলেন। কাজেই বুঝা গেল যে, এই ধরণের কাজে আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

এখন আমি বলি, যখন খোদার কাজে অর্থ সংগ্রহে আমাদের পার্থিব কিছু লাভ হয় না, তা সত্ত্বেও উহাতে আমরা এত উদার হইয়া পড়ি এবং বহু অসাবধান হইয়া পড়ি, তবে যে যে ক্ষেত্রে নিজের জন্য মাল উপার্জন করা লক্ষ্য থাকে, সে ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অসাবধানতা হইবে ? কেননা, তখন মাল উপার্জনে নিজের উপকারও নিহিত আছে। এমতাবস্থায় নিজ স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে হালাল হারামের মোটেই পরওয়া হইবে না। বিশেষ করিয়া যখন শুধু প্রয়োজন মিটান উদ্দেশ্য না থাকে ; বরং কিছু মাল সঞ্চয় করাও লক্ষ্য থাকে, তখন অসাবধানতার দ্বার খুব বেশী প্রশস্ত হইবে। হাঁ, কোন ব্যক্তি যদি মাল সঞ্চয় করার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তবে সে

সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারে। দ্বীনদার লোকের মধ্যে খোদার ফজলে এমন অনেক আছেন যাঁহারা মাল সঞ্চয় করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু দুনিয়াদারদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাহাদের সদাসর্বদার জল্পনাই ইহা যে, এই পরিমাণ টাকা-পয়সা সঞ্চিত হওয়া চাই এবং এই পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করা দরকার।

এরপর তাহারা উহা উপার্জন করিতে সুদ, ঘুষ ইত্যাদির মোটেই পরওয়া করে না (ঋণ করার পর তাহা হযম করিয়া ফেলা কিংবা অস্বীকার করা, ভগিনীদের প্রাপ্য অংশ আত্মসাৎ করা, কাহারও সম্পত্তি জবরদখল করিয়া লওয়া ইত্যাদি সবকিছুই তাহারা মাল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। তাহারা হালাল ও হারামের মোটেই পার্থক্য করে না।

॥ মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে বাহানা ॥

এতক্ষণ মাল উপার্জন করার অবস্থা বর্ণিত হইল। এখন উহা সংরক্ষণের অবস্থা শুনুন। সাধারণতঃ, মনে করা হয় যে, যাকাত, ছদকা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাহাকেও কিছু না দিলেই মালের পুরাপুরি হেফাযত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপও হয় যে, কোন ভিক্ষুক সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, সে বাস্তবিকই কাঙ্গাল, তবে বহু ক্ষেত্রে শুধু মাল কমিয়া যাওয়ার ভয়ে তাহাকে কিছুই দেওয়া হয় না। অনেকে অলঙ্কারের যাকাত দেয় না। অথচ আমাদের ইমাম আযম ছাহেবের মতে অলঙ্কারেরও যাকাত ওয়াজেব। এব্যাপারে তাহারা অন্যান্য ইমামদের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তাঁহাদের মতে অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজেব নহে। জানা দরকার যে, শুধু নফ্‌সের সন্তুষ্টির জন্য অন্য ইমামের মযহাব গ্রহণ করা ধর্ম হইতে পারে না ; বরং ইহা নফসের অনুসরণ এবং ধর্মের সহিত ঠাট্টা অর্থাৎ ধর্মকে খেলা মনে করা মাত্র।

আল্লামা শামী (রঃ) জনৈক বুযুর্গের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বুযুর্গের নিকট কেহ জনৈক হানাফী আলেমের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আলেম ব্যক্তি এক জন মুহাদ্দিসের নিকট তাঁহার মেয়ের বিবাহের পয়গাম দেন। মুহাদ্দিস বলিলেন, আপনি হানাফী মযহাবের লোক এবং আমি মুহাদ্দিসদের নীতি অনুসরণ করি। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে মিল হইবে না। আপনি যদি ইমাম আবু হানীফার অনুসরণ ত্যাগ করিয়া মুহাদ্দিসদের মযহাব অবলম্বন করেন, তবে আমি বিনা ওযরে এই পয়গাম মঞ্জুর করিতে পারি। আলেম ছাহেব এই শর্ত পালন করিতে সম্মত হইলেন এবং বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর ঘটনা বর্ণনাকারী ব্যক্তি বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই অবস্থায় মযহাব ত্যাগ করা জায়েয হইল কি না। বুযুর্গ বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ঈমান হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে।

কারণ, সে এতদিন যে মযহাবকে সত্য মনে করিত এবং সত্য মনে করিয়াই উহার অনুসরণ করিত, উহাকে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় ত্যাগ করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার ঈমান রক্ষা পাওয়া মুশকিল বটে:

اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ (اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنَ

الْعَمٰى بَعْدَ الْبَصَرِ وَمِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدٰى اٰمِيْنَ -)

"আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। (হে আল্লাহ্! আমরা প্রাচুর্যের পরে অনটন হইতে, দৃষ্টিশক্তির পরে অন্ধত্ব হইতে এবং হেদায়তের পরে গোমরাহী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।)"

তদ্রূপ কেহ কেহ শুধু মাল বাঁচাইবার জন্য অলঙ্কারের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব পালন করিয়া শাফেয়ী হইয়া গিয়াছে। এরপর অন্য কোন ব্যাপারে অসুবিধায় পতিত হইলে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অভিমত গ্রহণ করিয়া ফেলে। তখন তাহারা হানাফী হইয়া যায়। তাহাদের নফস হুবহু উট পাখীর ন্যায়। উটপাখী আকৃতির দিক দিয়া উটের সহিতও সামঞ্জস্য রাখে আবার পাখাবিশিষ্ট হওয়ার কারণে পাখীর সহিতও তাহার মিল আছে। এখন কেহ উহাকে উট মনে করিয়া পিঠে বোঝা চাপাইতে চাহিলে সে নিজেকে পাখী বলিয়া উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে কেহ তাহাকে পাখী মনে করিয়া শূন্যে উড়িতে বলিলে সে জোর গলায় বলে, আমি উট। উট কি আকাশে উড়িতে পারে? হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) ইহাকেই বলেন:

چوں شتر مرغے شناس ایں نفس را + نے کشد بار و نہ پرد بر ھوا

گر بپر گویش گوید اشترم + ور نہی بارش بگوید طائرم

(চুঁ শুত্‌র মুরগে শেনাস ই নফ্‌স রা + নায় কাশাদ বার ও নায় পরাদ বর হাওয়া
গর বপর গুয়ীয়াশ গুয়াদ ওশ্‌তরাম + ওর নেহী বারাশ বগুয়াদ তায়েরাম)

"অর্থাৎ, নফ্‌সকে উটপাখীর ন্যায় মনে কর। সে বোঝাও বহন করিতে পারে না এবং শূন্যেও উড়িতে পারে না। যদি তাহাকে উড়িতে বল, তবে সে বলে, আমি উট এবং যদি তাহার পিঠে বোঝা রাখিতে চাও, তবে সে বলে, আমি তো পাখী।"

বাস্তবিকই নফ্‌সের অবস্থা হুবহু তাহাই। সে নিজের গায়ে মাছি বসিতে দেয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশ ধরে। অনেকের নফ্‌স দুনিয়ার পর্দায় এই ধরণের ধূর্তামী করে আবার কিছু সংখ্যক লোকের নফ্‌স ধর্মের আড়ালে এই সব কুকাণ্ড করে। কোথায় কাহারও নিকট হয়তো শুনিয়াছে—ইমাম শাফেয়ী ছাহেবের মযহাবে অলঙ্কারে যাকাত নাই। ব্যস অমনি যাকাত হইতে গা বাঁচাইবার জন্য

শাফেয়ী হইয়া গেল। যে সব দ্বীনদার ব্যক্তি নিজেদের ধারণামতে শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাহাদের এই অবস্থা। পক্ষান্তরে যাহারা শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, তাহারা কোন কিছুরই পরওয়া করে না। কোন মযহাবে জায়েয হউক বা নাজায়েয হউক, সবই তাহাদের নিকট সমান। তাহাদের উদ্দেশ্য হাছিল হইলেই হইল। মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে এই হইল আমাদের অবস্থা।

॥ মাল ব্যয় করার ব্যাপারে অসাবধানতা ॥

তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মাল ব্যয় করার কথা বাকী রহিল। এ ব্যাপারে মানুষের ধারণা এই যে, মাল আমাদের; সুতরাং আমরা যথা ইচ্ছা, তাহা ব্যয় করিব। ইহা মানুষের একটি ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের সবকিছুই হক তা'আলার। সে শুধু আমানতদার। খোদা যেখানে অনুমতি দেন, সে শুধু সেখানেই তাহা ব্যয় করিতে পারে। খোদা যে ক্ষেত্রে ব্যয় করিতে নিষেধ করেন, সেখানে ব্যয় করার মানুষের মোটেই অধিকার নাই।

এখন জানা দরকার যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাল খরচ করা গোনাহ্। যেমন, নাচ-গান ও গর্বজনক আচার অনুষ্ঠানে ব্যয় করা। অনেকের ধারণা এই যে, উপার্জনের বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কিন্তু খরচের বেলায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ ধারণার কারণ হইল এই যে, ব্যয় করার ব্যাপারে তাহারা নিজদিগকে একক ক্ষমতাবান মনে করে। ইহা যে একেবারেই ভ্রান্ত তাহা এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ খরচের ব্যাপারে এত উদার যে, নাচ-গান ও তামাশায় ব্যয় করিতে মোটেই দ্বিধা করে না। কিছু সংখ্যক লোক এত উদার তো নহে। তাহারা নাচ-গানে টাকা খরচ করা অন্যায় মনে করে; কিন্তু বিভিন্ন গর্বজনক আচার অনুষ্ঠানে টাকা খরচ করিতে তাহারাও পিছনে থাকে না। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধু নাম যশ অর্জন করা। পরিতাপের বিষয় কতিপয় দ্বীনদার ও অনুসৃত ব্যক্তিও এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানে টাকা ব্যয় করাকে অন্যায় মনে করে না। তাহারা বলে, ইহাতে দোষের কি আছে? পানাহার করণ এবং নিজ সমাজের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা ও সমবেত করা নাজায়েয হইবে কেন?

ইহার উত্তরে আমি বলি যে, জনাব, এইরূপ নিমন্ত্রণ ও ধুমধামের মধ্যে মানুষের উদ্দেশ্য কি, তাহা দেখা দরকার। ইহাতে তাহাদের নিয়ত জাঁকজমক ও রিয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাহাদের নামযশ ছড়াইবে, সকলে বলিবে, দেখ কেমন বুকের পাটা! শুধু এই নিয়তেই তাহারা এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানের

আয়োজন করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় ইহা কিরূপে জায়েয হইতে পারে ? কারণ, যেসব বিষয় জায়েয, উহাদের বেলায় নিয়ম এই যে, মন্দ নিয়তে করিলে তাহা না-জায়েয হইয়া যায়। পরিতাপের বিষয়, নাম-যশের নিয়তে কোনকিছু করা যে মন্দ, আজকালকার মানুষ তাহাই বুঝে না। এ ব্যাপারেও তাহারা তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ধর্মীয় এল্‌ম সম্বন্ধে মানুষ একেবারে অজ্ঞ। তাহারা হাদীস কোরআন মোটেই পড়ে না। যাহারা পড়ে, তাহাদের অধিকাংশই উহা বুঝে না। রাসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ الذُّلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি ও নাম-যশের নিমিত্ত পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাইবেন।' পোশাকে বেশী খরচও হয় না, কিন্তু নাম-যশের নিমিত্ত হইলে এই অল্প খরচও নাজায়েয হইয়া যায়। অতএব, যে ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের জন্য হাজার টাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা কিরূপে জায়েয হইতে পারে ?

॥ পাপ কাজে সহায়ক বিষয় ॥

যাহারা নাম-যশের নিয়ত করে, হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত শাস্তিবাণী তাহাদের জন্য নির্ধারিত। ইহাতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, এইসব আচার-অনুষ্ঠানে টাকা-পয়সা নষ্ট করা জায়েয নহে। ইহাতে আরও জানা যায় যে, এইসব অনুষ্ঠানে অন্যদের যোগদান করাও না-জায়েয। কেননা, এইভাবে পাপ কাজে সহায়তা করা হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান না করিলে ইহাতে টাকা-পয়সা বরবাদ করার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। অপর একটি হাদীসে যোগদানকারীদিগকেও স্পষ্ট নিষেধ করা হইয়াছে ঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ اَنْ يُؤْكَلَ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ مَرْفُوْعًا وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ وَالصَّحِيْحُ مُرْسَلٌ وَالْمُتَبَارِيَانِ الْمُتَفَاخِرَانِ بِالطَّعَامِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَاِنَّمَا كَرِهَ ذٰلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ وَلِاَنَّهُ دَاخِلٌ فِيْ جُمْلَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ اَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ الخ (كذا فى عون المعبود صفحه ٣٠٢ ج ٣ -)

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এমন দুই ব্যক্তির খাদ্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা পরস্পরকে গর্বের উদ্দেশ্যে খাওয়ায়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ গর্ব ও রিয়া ছাড়া কিছুই নহে। অতএব, এই ধরণের অনুষ্ঠানে যোগদান করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।'

قال الامام الشعرانى فى العهود المحمدية اخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نتخلف عن الاجابة الى الولائم الا بعذر شرعى الى ان قال ومن عذرنا فى الاكل وجود شبهة فى الطعام اوعدم صلاح النية فى عمله ثم ذكر الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين ان يؤكل الخ (صفحه ٣١٩)

নাম-যশ ও রিয়া যে মন্দ তাহা কে না জানে? এইসব অনুষ্ঠানে অন্য কোন দোষের বিষয় না থাকিলেও নিয়ত দুরুস্ত না থাকাও কম দোষের বিষয় কি? আর যদি কেহ নাম-যশ ও রিয়া যে মন্দ তাহাই না জানে, তবে সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব শুধু তাহাকে এই হাদীসটি শুনাইয়া দেওয়া যে, নাম-যশ ও রিয়ার নিয়তে কোনকিছু করিতে রাসূলে খোদা (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত নিয়তের অনিষ্টকারিতা বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত এইসব আচার অনুষ্ঠানের জন্য সুদে কর্জ লইয়াও ব্যয় করা হয়। এই সবের গোনাহ্ পৃথক হইবে। এ পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বিষয়বস্তু ছিল।

এখন আমি বিশেষভাবে মহিলাদিগকে সম্বোধন করিতেছি। ইহাতে তাহারাও বুঝিতে পারিবে যে, মাল উপার্জন করিতে যাইয়া তাহারা কি কি গোনাহ্ করে। মহিলারা স্বয়ং উপার্জন করিতে পারে না। তবে যাহারা উপার্জন করে, তাহাদিগকে অধিকাংশ গোনাহে ইহারাই লিপ্ত করিয়া থাকে। উহাদের মুখে যে জিহ্বাটি রহিয়াছে, উহা পুরুষদের দ্বারা সবকিছু করাইয়া লয়। ইহারা আগেই নিয়ত করিয়া ফেলে যে, খুব মুল্যবান পোশাক কিনিতে হইবে। এরপর মজুর অর্থাৎ স্বামী ঘরে আসিতেই তাহারা অর্ডার বুক করিয়া দেয়। কথা বলার এমন মোহিনী ভঙ্গী তাহাদের আয়ত্বাধীন যাহাতে কথাগুলি অনবরতই পুরুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। এরপর সে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করার জন্য ঘুষ যুলুম ইত্যাদি সবকিছুই করে। কেননা, হালাল আমদানী এত বেশী থাকে না যে, উহা দ্বারা মহিলাদের দাবী পুরণ হইতে পারে। অতএব, বাহ্যতঃ মহিলাগণ এইরূপ বলিতে পারে যে, আমরা তো উপার্জনের যোগ্যই নহি। পুরুষরাই উপার্জন করে। উহাতে কোন গোনাহ্ হইলে তাহা তাহাদেরই যিম্মায় বর্তাইবে। আসলে কিন্তু তাহারাই পুরুষদিগকে হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। সত্য বলিতে কি, মহিলাদের ফরমায়েশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদিগকে ঘুষখোরী ও হারাম আমদানীতে বাধ্য

করে। অতএব, পুরুষদের গোনাহ্‌র কারণ হইল ইহারাই, কাজেই ইহারাও এইসব পাপের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না।

আমি পুরুষদিগকে সতর্ক করিতেছি যে, মহিলাদের ফরমায়েশের প্রধান কারণ হইল তাহাদের পারস্পরিক মেলামেশা। তাহারা কোন মহ্‌ফিলে একত্রিত হইলে একজন অপরজনকে দেখিয়া মনে মনে বাসনা করে যে, হায়! আমার কাছেও যদি এমন সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার থাকিত।

আমি নিজে দেখিয়াছি—জনৈক কোর্ট ইনস্পেক্টরের বেতন চার পাঁচ শত টাকা ছিল। প্রথম প্রথম তিনি বেতনের অধিকাংশ টাকা আত্মীয় স্বজনদের পিছনে ব্যয় করিতেন। তিনি অনেক দরিদ্র ব্যক্তির মাসিক বেতনও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। নিজের জন্য খুবই কম টাকা ব্যয় করিতেন। এমনকি, তাঁহার ঘরে রান্নাবান্নার জন্য কোন পাচিকাও ছিল না। বেগম সাহেবাই নিজ হস্তে যাবতীয় কাজ-কাম করিয়া লইতেন। বেগম সাহেবার অলঙ্কার বা মূল্যবান পোশাক বলিতে কিছুই ছিল না। তিনি স্বহস্তে আটাও পিষিতেন। অবশেষে তিনি বদলী হইয়া সাহারানপুরে আসেন এবং জনৈক সেরেস্তাদারের নিকটে বাড়ী ভাড়া করেন। কিছু দিন পর্যন্ত তিনি পূর্বাবস্থায়ই অবস্থান করিতে থাকেন। এক দিন সেরেস্তাদার সাহেবের পরিবার পরিজন বাসনা প্রকাশ করিল যে, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের বেগম সাহেবা অনেক দিন যাবৎ আমাদের পার্শ্বে বাস করিতেছেন, আমাদের ইচ্ছা তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি। প্রথমত ইনস্পেক্টর সাহেব আপন স্ত্রীকে তথায় পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু পীড়াপীড়ির পর সম্মত না হইয়া পারিলেন না।

॥ মেলামেশার প্রতিক্রিয়া ॥

ইনস্পেক্টরের স্ত্রী সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেরেস্তাদারের স্ত্রী ও কন্যারা আপাদমস্তক স্বর্ণের অলঙ্কারে সজ্জিতা। ঘরের মধ্যেও বিছানা-পত্র ও অন্যান্য আসবাব-পত্র প্রচুর পরিমাণে মৌজুদ রহিয়াছে। রান্নাবান্নার জন্য একজন নয়, দুই তিন জন করিয়া চাকর রহিয়াছে। বিবি সাহেবা নিজ হস্তে কোন কাজ করেন না। বসিয়া বসিয়া কেবল সকলের উপর শাসন চালান।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাহারও চক্ষু খুলিল। ভাবিতে লাগিল, সেরেস্তাদার সাহেবের বেতন আমার সাহেবের বেতন হইতে কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এত জাঁক-জমকের সহিত জীবনযাপন করেন। পক্ষান্তরে আমার সাহেব এত মোটা অঙ্কের বেতন পায়; তাসত্ত্বেও আমার ঝামেলার অন্ত নাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে কোর্ট ইনস্পেক্টর সাহেবের উপর ভীষণরূপে ক্ষেপিয়া গেল। তুমি আমাকে সর্বদাই কষ্টের মধ্যে রাখ। যাহারা তোমার চেয়ে কম বেতন পায়, তাহাদের

বিবিরা আমার চেয়ে অনেক সুখে বসবাস করে। আমার উপর এত বিপদ! আমি রান্নাবান্না করিতে পারিব না, আর কোন দিন আটাও পিষিব না। পাচিকা রাখিয়া লও। শুধু তাহাই নহে—সেরেস্তাদারের বিবির ন্যায় আমাকেও উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার দিতে হইবে। অবশেষে স্বামী বেচারাকে বাধ্য হইয়া স্ত্রীর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করিতে হইল।

কামেল শায়খের সংসর্গের গুণ এই যে, এক মিনিটের মধ্যেই উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতএব, মহিলাদিগকে এ ব্যাপারে শায়খে কামেল বলিতে হইবে। তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যদিগকে নিজেদের ন্যায় বানাইয়া ফেলিতে পারে।

এর কিছু দিন পর এলাহাবাদে ইনস্পেক্টর সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, জনাব, "শায়খে কামেলের" সংসর্গের এত গভীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল যে, আমার বহু দিনকার সংসর্গের প্রভাব মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন আগের দান-খয়রাত কিছুই চলে না। সম্পূর্ণ বেতন খরচ হওয়ার পরও সংসারের প্রয়োজন পুরাপুরি মিটে না। দিবারাত্র কেবল অলঙ্কারের ফরমায়েশ এবং কাপড়চোপড় ও বাসনপত্রের বায়না। বর্তমানে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করার ফরমায়েশ পূর্ণ করিতেছি। এই সব কারণেই আমার মতে মহিলাদিগকে পরস্পরে মেলামেশা করিতে দেওয়া উচিত নহে। খরবুযার সংসর্গে অন্য খরবুযার রং পরিবর্তিত হয়।

نخست موعظت پیر صحبت این سخن است + که از مصاحب نا جنس احتراز کنید

(নুখুস্ত মাওয়েযাতে পীরে ছোহ্বত ই সুখুন আস্ত
কেহ্ আয মুছাহিবে নাজিন্‌স এহ্‌তেরায কুনেদ)

অর্থাৎ, 'শায়খের প্রথম নছীহত এই যে, অসমপর্যায়ের লোকদের সঙ্গ হইতে বিরত থাক।'

মহিলাদের দোষ-ত্রুটি

বরং নিকটে থাকারও প্রয়োজন নাই। খরবুযাকে দেখিয়াই অন্য খরবুযা রং ধরিতে পারে। মহিলাদের দৃষ্টি এত প্রখর যে, দোহাই খোদার। কোন মহফিলে যাওয়া মাত্রই সকলের অলঙ্কার ও পোশাকের উপর নযর বুলাইয়া লয়। দশ বিশ জন পুরুষ এক স্থানে বসিয়া উঠিয়া গেলে একে অপরের পোশাক বলিতে পারে না; কিন্তু পাঁচ শতজন মহিলা একত্রিত হইলেও একজন অন্যজনের পূর্ণ অবস্থা, গলা ও কানের অলঙ্কার ইত্যাদি সবকিছুই জানিয়া ফেলে। ইহার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেখে, তাহার দৃষ্টিও প্রখর, দ্বিতীয়তঃ, অপর পক্ষও দেখাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। হাত ও পায়ের অলঙ্কার এমনিতেই প্রত্যেকে দেখিতে পারে। ইহার জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন হয় না। তবে গলা ও কানের অলঙ্কার ওড়নার কারণে ঢাকা

থাকে। এজন্য কখনও কান চুলকাইবার বাহানায় ওড়না হটাইয়া দেওয়া হয়, কখনও গরমের অজুহাতে গলা খোলা রাখা হয়—যাহাতে সকলেই গলা ও কানের অলঙ্কারগুলি দেখিতে পায়।

মহিলারা মহ্‌ফিলে সকলের অলঙ্কার ও পোশাক দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াই স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে যে, আমাকেও এমন অলঙ্কার বানাইয়া দাও। আরও সর্বনাশের কথা এই যে, অপরের কাছে যে অলঙ্কারটি দেখিয়াছে, তাহা যদি পূর্ব হইতেই তাহার কাছে থাকে কিন্তু অন্য ডিজাইনের থাকে, তবুও অতিষ্ঠ করিতে শুরু করে যে, আমার অলঙ্কারটির ডিজাইন খুবই বিশ্রী। অমুকের ডিজানটি খুবই সুন্দর আমাকে ঐ রকম বানাইয়া দাও। এরপর স্বামী যদি হাজার বারও বুঝায় যে, শুধু মাত্র একটি ডিজাইন পরিবর্তন করানোর জন্য ইহাতে ভাঙ্গা গড়ার দুইটি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তবুও তাহারা কিছুতেই তাহা শুনিবে না।

অথচ টাকা-পয়সার হেফাযতের কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা অলঙ্কার তৈরীর রীতি প্রচলন করিয়াছেন। উদাহরণতঃ, আমাদের কখনও চারি আনার প্রয়োজন দেখা দিলে তজ্জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া ফেলি, কিন্তু পাঁচ শত টাকার চুড়ি বিক্রয় করিতে পারি না। কাজেই বুঝা গেল যে, টাকা হাতে থাকে না; কিন্তু অলঙ্কার বানাইয়া রাখিলে টাকা সংরক্ষিত হইয়া যায়। অলঙ্কারের ইহাই হইল আসল উদ্দেশ্য। এই কারণেই গ্রামাঞ্চলে অলঙ্কারের প্রচলন বেশী। কারণ, গ্রামবাসীরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে জানে না। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে অলঙ্কারের সুশ্রী ও বিশ্রী হওয়ায় কিছু আসে যায় না; বরং বিশ্রী অলঙ্কার পরিধান করাই উত্তম—যাহাতে কাহারও দৃষ্টিতে ভাল না লাগে এবং কেহ উহার পিছনে না লাগে, তবে প্রথমবার বিশ্রীর পরিবর্তে সুশ্রীই বানাও। এরপর যেমনই হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। অলঙ্কার বার বার ভাঙ্গিলে গড়ার ক্ষতি ছাড়া স্বর্ণেরও অপচয় হয়। কেননা, স্বর্ণকার প্রত্যেক বার উহাতে কিছু না কিছু খাদ অবশ্যই মিশ্রিত করে। এই ভাবে দুই তিন বারে অলঙ্কারের মূল্য অর্ধেক কমিয়া যায়। কিন্তু মহিলাগণ এইসব কথা বুঝিবে কেন? তাহারা মনে করে, মজুর তো আছেই, আনিয়া তো দিবেই। যাহা ইচ্ছা ফরমায়েশ দেওয়া যাইবে।

ইহার পরিণতি হিসাবে স্বামীকে বাধ্য হইয়া ঘুষ গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই মহিলাগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ লওয়ার কারণ। তাহাদের এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, পুরুষরাই উপার্জন সংক্রান্ত যাবতীয় গোনাহ্‌ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মহিলারাও পুরুষদের সহিত আযাব ভোগ করিবে।

মহিলাগণ আরও একটি নিয়ম করিয়া লইয়াছে। তাহা এই যে, পুরুষগণ যখনই বিদেশ হইতে আসিবে, তখনই তাহাদের জন্য কিছু উপহার আনিতে হইবে

এবং পরিবারের খরচ চালাইবার জন্য যে টাকা দিয়া গিয়াছিল, উহার কোন হিসাব চাহিতে পারিবে না। কোন পুরুষ এত টাকা কোথায় খরচ হইল—ইহার হিসাব লইলে তৎক্ষণাৎ ফৎওয়া জারী হইয়া যায় যে, সে অত্যন্ত মন্দ পুরুষ—সামান্য সামান্য বিষয়েও হিসাব লয়। মহিলাদের মতে ঐ পুরুষই সর্বাধিক গুণসম্পন্ন, যে সম্পূর্ণ স্ত্রীভক্ত হয়। স্ত্রী কোন আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহা পালন করে, স্ত্রীকে টাকা দিলে উহার হিসাব না চায়। মালের মহব্বতের কারণেই এইসব অনিষ্টের সৃষ্টি। মহিলাদের শিরা-উপশিরা মালের মহব্বতে পূর্ণ। উপার্জনক্ষেত্রে মহিলাদের এই সব গোনাহ্ বর্ণিত হইল।

মালের হেফাযতের ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ অধিকাংশ মহিলা মালের যাকাত দেয় না। কারণ ইহাতে টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে। কোন কোন সময় অলঙ্কারের যাকাত পুরুষ এবং স্ত্রী কেহই দেয় না। পুরুষ বলে, অলঙ্কার স্ত্রীর এবং স্ত্রী বলে অলঙ্কার পুরুষের। আমি কেন যাকাত দিব? যাহার মাল, সে-ই যাকাত দিবে। এই সব বাহানা করিয়া খোদার শাস্তি হইতে কেহই রেহাই পাইবে না। দুইজনের মধ্যে একজন অবশ্যই অলঙ্কারের মালিক। কাজেই যে মালিক, তাহার যিম্মায় যাকাত ওয়াজেব। উভয়েই মালিক হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের যাকাত দিবে। (বাস্তবক্ষেত্রে কেহই অলঙ্কারের মালিক না হইলে তাহা খোদার মাল। উহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ন্যায় কোনও মসজিদ কিংবা মাদ্রাসায় ব্যয় করা উচিত। অথবা শরীকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া কর্তব্য।)

কোন কোন মহিলা পুরুষের অজ্ঞাতে টাকা পুঁজি করে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের ধারণা থাকে এই যে, স্বামী আগে মরিয়া গেলে এই টাকা তাহাদের উপকারে আসিবে। তাই সাংসারিক খরচ বহনের জন্য তাহাদিগকে মাসে ৪০.০০ টাকা দিলে উহা হইতে ২০.০০ টাকা খচর করে এবং ২০'০০ টাকা জমা রাখে। (এরপর ঘটনাচক্রে স্বামী আগে মারা গেলে এই সঞ্চিত পুঁজি তাহাদের অধিকারেই থাকিয়া যায়। কেহ ইহার কথা জানিতেও পারে না। খবরদার, ইহা না-জায়েয। টাকা-পয়সা পুঁজি করিতে হইলে স্বামীকে জানাইয়া করা উচিত। স্বামীর মরণ শয্যায় পতিত হওয়ার পুর্বেই ঐ টাকা নিজের নামে দান করাইয়া লও। এইভাবে ইহা তোমাদের মালিকানায় চলিয়া আসিবে। নতুবা উহা সকল ওয়ারিশদের হক। স্ত্রীর একা উহার মালিক হওয়া হারাম।)

কোন কোন মহিলা টাকা পুঁজি করিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে তাহা বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। কোন বাহানায় পিতাকে দিয়া দেয় কিংবা মা-বোনকে দিয়া দেয়, ইহাও কঠোর পাপ। স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের শরীয়ত মতে কোন হক নাই। তাহাদিগকে দিতে হইলে স্বামীর মত লইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের

মত লইতে চাহিলে তাহারা সাধারণতঃ এতই উদারপ্রাণ যে, প্রয়োজন মাফিক দিতে প্রায়ই তাহারা অসম্মতি প্রকাশ করিবে না। স্বামী স্ত্রীকে কোন মালের মালিক বানাইয়া দিলে তাহা অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন দান না করিয়া সংসারের খরচের জন্য দিলে কিংবা জমা রাখিতে দিলে, তাহা বিনানুমতিতে ব্যয় করা কিছুতেই জায়েয নহে—এমন কি, ভিক্ষুককে দেওয়াও না-জায়েয। তবে স্বামী যদি অনুমতি দিয়া থাকে যে, কিছু কিছু ভিক্ষুককে দান করিও, তবে সাধারণতঃ ফকীরকে যে পরিমাণ দেওয়া হয়, ঐ পরিমাণ দেওয়া জায়েয।

॥ মহিলা ও চাঁদা ॥

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, মহিলাগণ চাঁদার ব্যাপারে যারপরনাই মুক্তহস্ত। কোন ওয়াযে দান-খয়রাতের ফযীলত শুনা মাত্রই তাহারা গায়ের অলঙ্কার খুলিতে শুরু করে। স্মরণ রাখ, যেসব অলঙ্কার একমাত্র তোমাদেরই মালিকানাধীন, তাহা দান করায় অন্যায় নাই; কিন্তু স্বামী যে সব অলঙ্কার শুধু পরিবার জন্য দিয়াছে, তাহা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান করা জায়েয নহে। মহিলাগণ এ ব্যাপারে খুবই মুক্তহস্ত। যাহারা চাঁদা গ্রহণ করে, তাহারাও ব্যাপারটি তলাইয়া দেখে না। অধিকন্তু তাহারা অলঙ্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদের মহ্‌ফিলে ওয়ায করে।

একবার বলকান যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করার উদ্দেশ্যে আমি মহিলাদের মধ্যে ওয়ায করিয়াছিলাম। আমি ওয়াযে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, মহিলাদের নিকট হইতে অলঙ্কার গ্রহণ করিব না। কোন পুরুষ অলঙ্কার লইয়া হাজির হইলে তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, এই অলঙ্কারটির মালিক তুমি নিজে, না তোমার স্ত্রী? স্ত্রী মালিক হইলে সে খুশী মনে দিয়াছে, না তোমার কথায়? সে খুশী মনে দিয়া থাকিলে এ সম্পর্কে তোমারও সম্মতি আছে কি না? জিজ্ঞাসাবাদের পর যদি জানা যাইত যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুশী মনে দিতেছে, তবে তাহা গ্রহণ করা হইত।

মহিলাগণ প্রায়ই স্বামীর মাল ব্যয় করিতে যাইয়া মনে করে যে, স্বামী অনুমতি দিয়া দিবে। এইরূপ ঘটনার পর স্বামী মাঝে মাঝে চুপও থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে খুব রাগান্বিতও হয়। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হইয়া যায়। একবার কানপুরে জনৈক মহিলা অনুমতি ছাড়াই স্বামীর মুরাদাবাদী হুক্কা একটি মাদ্রাসার সভায় ধার দিয়াছিল। এজন্য স্বামী স্ত্রীর সহিত খুব কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল। মোটকথা, স্বামীর পরিষ্কার অনুমতি না লওয়া কিংবা অনুমতি দিবে বলিয়া প্রবল বিশ্বাস না থাকা পর্যন্ত চাঁদা হিসাবে মহিলাদের কোনকিছু দেওয়া উচিত নহে। স্বামীর মাল দান করার বেলায় এই মাসআলাটি প্রযোজ্য।

॥ স্বামীর সহিত পরামর্শ করার আবশ্যকতা ॥

আর যদি স্ত্রীর নিজস্ব মাল হয়, তবে উহা দান করিতে স্বামীর অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া লওয়া অবশ্যই উচিত। নাসায়ী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا -

'অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বিবাহের পর স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর পক্ষে তাহার নিজস্ব মাল দান করা জায়েয নহে'। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হাদীসে ব্যবহৃত مالها (স্ত্রীর মাল) শব্দের মধ্যে যে, اضافت (সম্বন্ধ) রহিয়াছে, তাহা সত্যিকারের اضافت নহে। তাহাদের মতে ইহা দ্বারা স্বামীর মালই বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু মহিলাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্পূর্ণ। তাহাদের মালের ব্যাপারে তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাহারা উহা যত্রতত্র ব্যয় করিয়া বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে। হুযূরের এই এরশাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, এই কথার পরি-প্রেক্ষিতে হুযুর (দঃ) তাহাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা নিজস্ব মালও নিজেদের খেয়ালখুশীমত ব্যয় করিও না। এ ব্যাপারে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া লও। হাদীসের এই ব্যাখ্যা যুক্তির দিক দিয়া যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে একটি মঙ্গলও নিহিত আছে। তাহা এই যে, এইভাবে পরামর্শ করিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে। স্বামী এই ভাবিয়া স্ত্রীকে আরও বেশী ভালবাসিবে যে, আমার সহিত তাহার সম্পর্ক কত গভীর ! নিজস্ব মালও আমার পরামর্শ ছাড়া ব্যয় করে না। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী নিজ পুঁজি পৃথক রাখে এবং নিজ খেয়াল খুশীমত তাহা কাজে লাগায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার পরপর ভাব অনুভূত হয়। এই কারণে আমার মতে, হাদীসের মর্ম প্রকাশ্য অর্থেই বুঝিতে হইবে এবং مالها শব্দ দ্বারা "স্বামীর মাল" বুঝানোর কোন প্রয়োজন নাই।

قلت قال السندى فى تعليقه على النسائى وهو عند اكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج واخذ مالك بظاهره فى ما زاد على الثلث -

উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী যখন স্ত্রীকে নিজস্ব মালের ব্যাপারেও স্বামীর পরামর্শ লইতে হইবে, তখন স্বামীর মালের ব্যাপারে পরামর্শ লওয়ার প্রয়োজন হইবে না কেন ? হাঁ, যদি এমন কোন ক্ষুদ্র জিনিস হয় যে উহাতে স্বামী অনুমতি দিবে বলিয়া দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা দান করায় অসুবিধা নাই। ইহাও শুধু ভিক্ষুকদিগকে দেওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র জিনিষ দেওয়ার বেলায়ও যখন এতটুকু

সাবধানতা অবলম্বন করা অর্থাৎ অনুমতি দিবে বলিয়া বিশ্বাস থাকার শর্ত রহিয়াছে, তখন বাপ, মা ও বোন ভাইয়ের বাড়ীতে জিনিসপত্র দেওয়ার অনুমতি কিরূপে হইবে ? কারণ, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস দেওয়া হয় না। কোন মহিলা বাপ-মাকে একটি রুটি কিংবা রুটির টুকুরা দেয় না। তাহাগিকে নগদ টাকা কিংবা বস্ত্রজোড়া দেওয়া হয়—যাহা স্বামী জানিতে পারিলে হয়তো সহজেই মানিয়া লইবে না। এই কারণেই মহিলাগণ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে গোপনে গোপনে জিনিসপত্র পাচার করে, স্বামীকে ঘৃণাক্ষরেও জানিতে দেয় না। ফলে বেচারী স্বামী যাহাকিছু উপার্জন করে, সমস্তই অন্যের হাতে চলিয়া যায়।

॥ বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী ॥

পুর্বে বিচক্ষণ লোকদের অভিমত এইরূপ ছিল যে, গরীবের মেয়ে বিবাহ করা উচিত; কিন্তু এইসব ঘটনা দেখিয়া আজকাল অনেকেই বলে যে, গরীবের মেয়ে কিছুতেই ঘরে আনিতে নাই। কেননা, তাহারা পিতামাতাকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া স্বামীর সমস্ত মাল পাচার করিয়া দেয়। আমি অবশ্য এইরূপ পরামর্শ দেই না। তবে আমি বলিতে চাই যে, মহিলাদের অসাবধানতার কারণেই আজ জ্ঞানী ব্যক্তিরা গরীবের মেয়ে গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করে। আমার অভিমত এই যে, সম অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির মেয়ে বিবাহ করা উচিত। নিজের চেয়ে বেশী ধনী ব্যক্তির মেয়ে বিবাহ করিলে সে লোভী হইবে না এবং স্বামীর মাল পাচার করিবে না সত্য; কিন্তু অহঙ্কারের কারণে তাহার দৃষ্টিতে স্বামীর কোন মান থাকিবে না। পক্ষান্তরে গরীবের মেয়ে বিবাহ করিলে সে লোভী হইবে—স্বামীর জিনিস-পত্র দেখিয়া তাহার মুখে লালা আসিবে এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও জিনিসপত্র পাচার করিবে।

যাক, এই বিষয়টি অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্ক রাখে। আমার উদ্দেশ্য এই যে, মাল খরচ করার ব্যাপারে মহিলাগণ খুবই অসাবধান। যদ্দরুন আজ জ্ঞানিগণ চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, গরীব, ধনী ও সম অবস্থা সম্পন্ন—ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকের মেয়ে বিবাহ করা উচিত।

মহিলাদিগকে অপব্যয় হইতে বিরত রাখার একটি বড় উপায় এই যে, মাল ও অলঙ্কার পত্র তাহাদের হাতে রাখিতে নাই। প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প সংখ্যক টাকা তাহাদের হাতে দিয়া অবশিষ্ট টাকা স্বামীর হাতেই রাখা উচিত। তদ্রূপ শুধু নাকে কানে লাগাইবার উপযুক্ত অলঙ্কার তাহাদের হাতে দেওয়া উচিত। অবশিষ্ট অলঙ্কার স্বামী নিজের কাছে রাখিবে। কোন সময় পরিধান করার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন দিবে এবং প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আবার ফেরত লইয়া রাখিয়া দিবে। এইভাবে তাহারা অপব্যয় করিতে এবং গোপনে কাহাকেও দিতে পারিবে না। এই পন্থা

অবলম্বন করিলে গরীবের কিংবা ধনীর মেয়ে বিবাহ করায় কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।

॥ বিবাহ-শাদীর খরচ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যুক্ত উদ্যোগে যে একটি অনর্থক খরচ করা হয়, তাহা হইল বিবাহ-শাদীর খরচ। ইহা যদিও যুক্ত উদ্যোগে সম্পন্ন হয়, তথাপি মহিলাগণই ইহাতে নেতৃত্ব দান করিয়া থাকে। বিবাহে কি কি খরচ হয়, পুরুষগণ তাহা জানে না। সব কিছু মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াই সম্পন্ন করা হয়। এ ব্যাপারে তাহারাই পরিচালিকা। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনকিছু করার সাধ্য কাহার ?

আমি কানপুরে দেখিয়াছি জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে বিবাহের বরযাত্রী আগমন করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ীর কর্তা কিছুতেই বরযাত্রীদিগকে আসন দিতে পারিল না। ফলে পুরুষ মহলে অবশ্য কর্তা সাহেবের অপমানের সীমা ছিল না ; কিন্তু গৃহকর্ত্রী এই ভাবিয়া গর্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল যে, দেখ, আমার ক্ষমতা কতদুর ! আমার অনুমতি ছাড়া বরযাত্রীরা আসনও পাইল না। এরপরও বিবাহে মহিলারা এমন নিরর্থক খরচের কোটা বাহির করে—যাহাতে স্বামী বেচারী তক্তা হইয়া যায়। স্বামী যদি কোন সময় বলে, একটু সাবধানে ও বুঝিয়া শুনিয়া ব্যয় কর, তবে বিবি নাক সিট্‌কাইয়া বলে, ভাল কথা, আমার কি ? আমি অল্প খরচেই কাজ চালাইয়া যাইব, কিন্তু সমাজে তোমার নাক কাটা না গেলেই চলে। নাক কাটার ভয়ে তখন পুরুষও আর কোন দ্বিরুক্তি করে না এবং মহিলাগণ স্বচ্ছন্দে টাকা বিনষ্ট করিতে থাকে। অথচ সাদাসিধাভাবে বিবাহ করিলে নাক কাটা যায়, ইহা শুধু তাহাদের ধারণাই ধারণা। সাদাসিধা বিবাহ কার্যে নাক কাটা যাইতে আমি কোথাও দেখি নাই ; বরং বেশী ধুমধামের সহিত বিবাহ করিলেই সর্বদা নাক কাটা যায়।

হযরত মাওলানা মামলুক আলী ছাহেব (রঃ) তাঁহার বিধবা কন্যাকে অবিবাহিতা মেয়ের অনুরূপ ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিধবা বিবাহকে সমাজে নাক কাটা অর্থাৎ চরম অপমানকর বিষয় মনে করা হইত। বিবাহের পর মাওলানা নাপিতকে আদেশ দিলেন যে, সমাজের লোকদিগকে আয়না দেখাইয়া আস। তাহারা দেখুক যে, তাহাদের নাক কাটা যায় নাই তো ?

এই কুসংস্কারের বিরোধিতা করায় মাওলানা সাহেবের ইজ্জত বিন্দু মাত্রও লাঘব হয় নাই। এক ব্যক্তি ধুমধামের সহিত বিবাহ করিলে তাহা দেখিয়া অন্যান্য মালদারের মনে হিংসার উদ্রেক হয়। তাহারা ভাবে যে, সে তো আমাদিগকেও পিছনে ফেলিয়া দিল। তখন তাহারা ব্যবস্থাপনায় ছিদ্র খুঁজিতে আরম্ভ করে। ঘটনাক্রমে কোথাও

সামান্য ত্রুটি থাকিয়া গেলে চতুর্দিকে ইহার সমালোচনা হইতে থাকে। কেহ বলে মিয়া, কি বলিব ? আমার ভাগ্যে তো হুক্কাও জুটিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, আমাকে তো কেহ একটি পানপাতা দিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, রাত্রি দুইটার পর কপালে খানা জুটিল। ক্ষুধায় মরার দশা আর কি! যখন ব্যবস্থাই করিতে পারিল না, তখন এত লোক দাওয়াত করার কি প্রয়োজন ছিল ? মোটকথা, নিমন্ত্রণকারী হতভাগার অজস্র টাকা বরবাদ হয়, কিন্তু সমাজীদের নাক সিটকানোই যায় না। মাঝে মাঝে হিংসায় কেহ রন্ধনের ডেগে এমন জিনিস ফেলিয়া দেয় যাহাতে খাদ্য নষ্ট হইয়া যায়। এরপর তাহা লইয়া যত্রতত্র আলোচনা করা হয়। এই ভাবে দাওয়াতকারী ব্যক্তির চূড়ান্ত বেইজ্জতি হয়। যদি সমস্ত ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলারূপে সমাধা হইয়া যায়, তবে কেহ মন্দ না বলিলেও প্রশংসাও কেহ করে না।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রাহ্ঃ) জনৈক মহাজনের গল্প বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে মেয়ের বিবাহে খুব ধুমধাম করিয়াছিল। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করিয়াছিল। বরযাত্রী বিদায় হওয়ার সময় হইলে সে প্রত্যেককে এক একটি আশ্‌রফী দিল। তাহার ধারণা ছিল যে, আজ বরযাত্রীরা কেবল তাহারই প্রশংসা গাহিতে গাহিতে যাইবে। সে মতে নিজ প্রশংসা শুনিবার উদ্দেশ্যে সে বরযাত্রীদের গমন পথে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তা দিয়া বরযাত্রীদের গাড়ী যাইতে লাগিল। এক দুই করিয়া তিনটি গাড়ীই চলিয়া গেল; কিন্তু কাহারও মুখে কিছু শুনা গেল না। কেহই মহাজনের প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। এইভাবে আরও অনেক-গুলি গাড়ী নীরবে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। মহাজনের খুব রাগ হইল— এরা কেমন নেমকহারাম লোক! (বরং আশরফীকে হারাম বলা উচিত।) আমি তাহাদের জন্য এত এত টাকা ব্যয় করিলাম, আর এরা কি না আমার প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না!

অবশেষে সে ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরার ইচ্ছা করিতেছিল—এমন সময় সর্বশেষ গাড়ীটি হইতে এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনা গেল। সে অপর একজনের সহিত বলিতে ছিল, আরে ভাই, লালাজী (মহাজন) তো খুব সাহস ও উদারতার পরিচয় দিলেন! প্রত্যেককেই একটি করিয়া আশ্‌রফী দিল! এই কথা শুনিয়া মহাজনের প্রাণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল—যাক, পরিশ্রমের কিছুটা প্রতিদান পাওয়া গেল। কিন্তু অপর ব্যক্তি বলিল হুঁ, তুই যে কি বলিস। বেটা কন্‌যুস কিই আর বাহাদুরী দেখাইয়াছে? তাহার ঘরে তো সিন্দুক ভরা আশরফী আছে। প্রত্যেককে দুইটি করিয়া দিলেই তাহার কি অভাব হইত? বেটা তো মাত্র একটি করিয়াই আশ্‌রাফী বণ্টন করিল। এই উত্তর শুনিয়া মহাজন বিষণ্নমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বন্ধুগণ, যতই খরচ করুন না কেন—প্রথমতঃ হিংসায় মানুষ উল্টা দুর্ণাম রটাইবার চেষ্টা করে। ইহা না হইলে কমপক্ষে উপরোক্ত লালাজীর ন্যায় অবস্থার সম্মুখীন তো হইতেই হয়। অর্থাৎ আশরফী বণ্টন করিয়াও কনজুস উপাধি লইয়া ঘরে ফিরিতে হয়। আর যদি ইহাও না হয়, তবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় মানুষ এই কথা না বলিয়া ছাড়ে না যে, মিয়া, সে আর কি করিয়াছে? টাকা-পয়সা থাকিলে মানুষ কতকিছুই তো করে। তাই আমি বলি যে, যখন এতকিছু করিয়াও কিছু লাভ হয় না, তখন এগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কবি বর্ণিত নিম্নোক্ত অবস্থা অবলম্বন করাই উত্তম :

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا + كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

'অর্থাৎ, আমি 'লাত' ও 'ওয্‌যা, (দেবতাদের) সকলকেই ত্যাগ করিয়াছি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই এইরূপ করিয়া থাকে।'

॥ মাল ব্যয়ের ব্যাপারে অনিষ্টকারিতা ॥

মহিলাদের একটি রোগ এই যে, তাহারা বিবাহ-শাদীর খরচ পুরুষদিগকে বলিয়া দেয়। এরপর পুরুষরা যখন জিজ্ঞাসা করে যে, এত অধিক ব্যয় করার সামর্থ্য কোথায়? তখন তাহারা বলে, টাকা ধার করিয়া লও। বিবাহের জন্য যে টাকা ধার করা হয়, তাহা অপরিশোধিত থাকে না। কোন না কোন উপায়ে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ হইয়া যায়। খোদা জানে, তাহারা ইহা কোথা হইতে জানিল যে, শাদী ও গৃহনির্মাণের ধার পরিশোধ হইয়া যায়—যদিও তাহা সুদের ধার হয় এবং অনাবশ্যক কাজে ব্যয় করা হয়। বন্ধুগণ, এই জাতীয় ধারের কারণে ভূ-সম্পত্তি পর্যন্ত নীলাম হইতে আমি দেখিয়াছি। এই অবস্থা দেখিয়া এখন সকলেই ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের চক্ষু এখনও পুরাপুরি খোলে নাই। এখনও অনেক কু-প্রথা প্রচলিত আছে। আজকাল শিরক্ বেদআতের কু-প্রথা হ্রাস পাইলেও পারস্পরিক গর্ব প্রকাশের কু-প্রথাগুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেমতে অলঙ্কার ও পোশাক পরিচ্ছেদে আজকাল পূর্বাপেক্ষা বেশী ব্যয় করা হয়। পূর্বে 'মশরু' (সিল্ক ও সূতার তৈরী এক প্রকার কাপড়)কেই উত্তম কাপড় মনে করা হইত; কিন্তু আজকাল রেশমী, 'কিংখাব' (মুল্যবান কাপড় বিশেষ,) যরী, তসর, সার্জ ইত্যাদি কত প্রকার উত্তম কাপড় আবিষ্কৃত হইয়াছে! বাসনপত্র, বিছানা, গালিচা ইত্যাদির ব্যাপারেও নানা প্রকার লৌকিকতা বিকাশ লাভ করিয়াছে। পূর্বে এই সকল উত্তম সাজ-সরঞ্জাম কেবল দুই-এক ব্যক্তির নিকট থাকিত। বিবাহ-শাদীতে সকলেই তাহাদের নিকট হইতে চাহিয়া কার্যোদ্ধার করিত।

আমাদের এলাকায় জনৈক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিকট একটি মুরাদাবাদী হুক্কা ও একটি বড় ফরশ ছিল। অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এগুলি ছিল না। বিবাহ শাদীর সময় ঐ হুক্কা ও ফরশ সবখানেই চাহিয়া চাহিয়া নেওয়া হইত। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক দীন ও হীন ব্যক্তির ঘরে এইসব জিনিষ মৌজুদ রহিয়াছে। কাজেই এইসব লৌকিকতার মধ্যে আজকাল খুব বেশী টাকা-পয়সা নষ্ট হইতেছে। যদিও আজকাল অনেক আলেমই এইসব কু-প্রথা মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকে বুঝিয়াও নিয়াছে কিন্তু এখনও অনেক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক বাকী রহিয়া গিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি আমার লিখিত 'এছলাহুর রুসূম' (কু-প্রথার সংস্কার) পুস্তকখানিকে অদ্ভুত কাজে ব্যবহার করিয়াছে। উহা পাঠ করিয়া সে বলিত যে, আমরা অনেকগুলি প্রথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খোদা এই পুস্তকের লেখকের মঙ্গল করুন, তিনি পুস্তকে সবগুলিই সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন আমরা এই পুস্তকটি দেখিয়া সবগুলি প্রথাই পালন করিয়া থাকি। অথচ এই পুস্তকে প্রত্যেকটি প্রথারই খণ্ডন করিয়া উহার অপকারিতা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এই সাহেব উহাকে এমন অদ্ভুত কাজে ব্যবহার করিলেন।

ইহার উদাহরণ এইরূপ—যেমন কেহ কোরআন শরীফ হইতে কাফেরদের উক্তি-গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লয়। যথা, اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিন জনের তৃতীয়জন।' اَلْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র' عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ 'উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র।' اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا 'খোদা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন' مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ 'খোদা মানবের উপর কোনকিছু নাযিল করেন নাই।' سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ 'খোদার ন্যায় আমিও অতি সত্বর কিতাব নাযিল করিব।' ইত্যাদি। এইসব উক্তির খণ্ডনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বর্জন করে। এরপর সে বলিতে থাকে যে, কোরআন পাঠ করায় আমার খুব উপকার হইয়াছে। পূর্বে কাফেরদের উক্তি জানা ছিল না। এখন সবই জানিয়া ফেলিয়াছি। কোরআন পাঠ করিয়া যাবতীয় কুফরী ওযীফা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। এখন বলুন, এই ব্যক্তির নিবুদ্ধিতায় কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে কি? এছ্‌লাহুর-রুসূম কিতাব হইতেও পূর্বোক্ত ব্যক্তি এই ধরণের উপকার লাভ করিয়াছে।

তাই আমি বলি যে, এখনও কু-প্রথার পুরাপুরি সংস্কার করা হয় নাই; বরং এমন এমন উদ্ভট বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ণনা ছিল যাহা মাল ব্যয়ের ব্যাপারে হইয়া থাকে। মোটকথা, মালের তিনটি স্তরে পুরুষ ও মহিলা উভয়

শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা যেসমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, আমি সংক্ষেপে উহা ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

॥ নেক বিবির পরিচয় ॥

পরিশেষে আরও বলিতেছি যে, মহিলারা সাহসিকতার পরিচয় দিলে অতি সত্বর এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইতে পারে। দূর না হইলেও হ্রাস অবশ্যই পাইবে। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকতর ক্ষেত্রে মহিলাদের কারণেই পুরুষরা মাল সংক্রান্ত গোনাহে লিপ্ত হয়। যদি তাহারা সাহস করিয়া অলঙ্কার ও পোশাকের ফরমায়েশ কম করিয়া দেয় এবং পুরুষদিগকে বলিয়া দেয় যে, আমাদের কারণে হারাম উপার্জনে হাত দিও না, তবে অনেকটা সংশোধন হইতে পারে।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)-এর কন্যার বিবাহ হইলে তাঁহার স্বামী মওলবী ইব্‌রাহীম সাহেব তখন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন না। বেতনও বেশী ছিল না। ফলে অতিরিক্ত আমদানীর ব্যাপারে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন না। হযরত মাওলানা (রঃ)-এর ছাহেবযাদীপ্রথম দিনই স্বামীকে পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, যতক্ষণ অতিরিক্ত আমদানী (ঘুষ) হইতে তুমি তওবা না করিবে, ততক্ষণ তোমার বাড়ীতে আমি খাদ্য গ্রহণ করিব না। মোটকথা, খোদার এই দাসী স্বামীর বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই তওবা করাইলেন এবং অঙ্গীকার করাইলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কখনও ঘুষ গ্রহণ করিবেন না।

এই ছাহেবযাদী সম্বন্ধে হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই মেয়েটি খুব দরবেশ প্রকৃতির হইবে। সিপাহী বিদ্রোহের যমানায় হযরত হাজী ছাহেব একবার গাঙ্গুহ্‌ তশ্‌রীফ আনিয়াছিলেন। মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না। হাজী ছাহেব মাওলানার বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন এবং ছাহেবযাদী ছাহেবাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দেন। তিনি উহা লইয়া হাজী ছাহেবের পায়ের উপর রাখিয়া দিলেন। হযরত উহা আবার দিলেন। তিনিও আবার তাহাই করিলেন। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটার পর তিনি তাহা লইলেন। ইহাতে হযরত হাজী ছাহেব বলিলেন যে, মেয়েটি অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির হইবে।

বাস্তবেও তিনি দরবেশ প্রকৃতির ছিলেন। ইহার একটি প্রমাণ তো এই যে, তিনি প্রথম দিনেই স্বামীকে ঘুষ হইতে তওবা করাইয়াছেন। অথচ তখন টাকা-পয়সার প্রতি মহিলাদের বেশী লোভ থাকে। বিশেষতঃ যে মহিলাকে পিতা-মাতার নিকট হইতে ধনীদের ন্যায় অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি তাঁহার মনে এতটুকুও লোভ হইল না এবং দ্বীনের ভাবই প্রবল রহিল।

কান্ধলায় জনৈকা মহিলা ছিলেন। তাহার স্বামী ছিলেন তহ্‌শীলদার। মদ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনাও তাহার যিম্মায় ছিল। এই বিবি ছাহেবা স্বামীর উপার্জন কোন দিন স্পর্শও করেন নাই বা উহা দ্বারা অলঙ্কারপত্রও তৈরী করান নাই। শুধু ইহাই নহে; বরং যত দিন স্বামীর সহিত চাকুরীস্থলে বাস করিতেন, তত দিন খাদ্য দ্রব্য লবণ ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বাপের বাড়ী হইতে আনাইয়া লইতেন। এরপর তাহার ভদ্রতাও লক্ষ্য করুন, স্বামীর মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি স্বামীকে ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দিতেন না।

আমাদের এলাকায় কান্ধলা শহরের জনৈকা মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নিকট কিছু সম্পত্তি বন্ধক ছিল। তিনি উহার আমদানী নিজ সংসারে ব্যয় করিতেন কিন্তু তাঁহার বিবি বন্ধক সম্পত্তির আমদানী হইতে একটি কণাও কোন দিন আহার করেন নাই। আমি ঠিকই বলি যে, কোন কোন মহিলা পুরুষদের চেয়েও বেশী মজবুত হইয়া থাকে। কোন কোন মহিলা বলে যে, আমরা অপারগ। স্বামী যাহা আনে বাধ্য হইয়া তাহাই আহার করিতে হয়। আমার মতে ইহা তাহাদের দুর্বল বাহানা বৈ কিছুই নহে। তাহারা অলঙ্কার ও পোশাকের ফরমায়েশ বন্ধ করিয়া দিলে অনেক পুরুষ আপনাআপনিই ঘুষ হইতে তওবা করিবে। এরপরও কেহ ঘুষ গ্রহণ করিলে মহিলাগণ সাহস করিয়া বলিয়া দিক্ যে, আমাদের কাছে শুধু হালাল অর্থ আনিতে হইবে, ঘুষের অর্থ আনিতে পারিবে না। নতুবা আখেরাতে আমি তজ্জন্য তোমার আঁচল ধরিয়া রাখিব। এইরূপ বলার পর দেখিতে পাইবেন, কত সত্বর তাহাদের সংশোধন হইয়া যায়।

আমার পরিবারের বড়দের মুখে শুনিয়াছি যে, আম্মাজান (মরহুমা) গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া আব্বাজানের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, হয় ইহাদের যাকাত দাও, নতুবা ইহা নিজের কাছে রাখ—আমি এগুলি পরিধান করিব না। অবশেষে আব্বাজান বাধ্য হইয়া সমস্ত অলঙ্কারের যাকাত দিলেন। এরপর আম্মাজানও অলঙ্কার পরিধান করিলেন।

মহিলাগণ এইরূপ করিলে আপানাআপনিই পুরুষদের সংশোধন হইয়া যাইবে। কেননা, মাঝে মাঝে যেমন পুরুষ দ্বারা মহিলার সংশোধন হয়, তদ্রূপ মহিলা দ্বারাও পুরুষের সংশোধন হইতে পারে। নেক বিবি তাহাকেই বলা হয়—যে পুরুষকে ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে সাবধান বানাইয়া দেয়। স্বামীকে অসাবধান বানাইয়া দেওয়া নেক বিবির পরিচয় নহে।

॥ আওলাদের পাপ বোঝা ॥

উপরোক্ত আলোচনা মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল। এখন অপর আলোচনা সাপেক্ষ অংশটি বাকী রহিল। অর্থাৎ, আওলাদ সংক্রান্ত আলোচনা। আওলাদের

বেলায়ও তিনটি স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তরেই আমাদের দ্বারা বিভিন্ন গোনাহ্ হইয়া থাকে। সংক্ষেপে তাহাও শুনিয়া লউন।

সর্বপ্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক বিশেষ মহিলাগণ বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোথায়ও তাবিয-কবযের সাহায্য লওয়া হয়। এগুলি শরীয়ত সম্মত কি না এদিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। কোন কোন মহিলা এ ব্যাপারে আরও বেশী দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। তাহাদিগকে কেহ যদি বলে যে, অমুকের সন্তান মারিয়া ফেলিলে তোমার গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তবে তাহারা ইহা করিতেও দ্বিধা করে না। মাঝে মাঝে কাহারও সন্তানের উপর (হোলী, দীপালী ইত্যাদি উৎসবের সময়) যাদু করাইয়া দেয় কিংবা নিজেই করায়। কোন কোন মূর্খ মহিলা শীতলার পূজা করে। সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কোন সময় চৌরাস্তার মধ্যে কিছু রাখিয়া দেয়। এমন মায়ের গর্ভে মাঝে মাঝে এমন পিশাচ ছেলে জন্মগ্রহণ করে যে, বয়স্ক হওয়ার পর তাহার অত্যাচারে মা-বাপ অতিষ্ঠ হইয়া যায়। তখন যে ছেলের আশায় হাজার হাজার গোনাহ্ করিয়াছিল, তাহাকেই অসংখ্যবার বদ-দোআ দিতে থাকে।

মান্নতের সন্তানকে খুব বেশী আদর করাও তাহার খারাপ হওয়ার একটি বড় কারণ। শৈশবেই তাহার চরিত্র খারাপ করিয়া দেওয়া হয়। সে কাহাকেও গালি দিলে কিংবা কাহাকেও মারপিট করিলে কেহ তাহাকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বলে না। বলা দূরের কথা, কোন কোন মহিলা মনে মনে কামনা করে যে, তাহাদের ছেলে গালি দেওয়ার উপযুক্ত হউক।

জনৈকা মহিলা মান্নত করিয়াছিল, যদি আমার ছেলে হয় এবং সে মার-গালি খাইয়া বাড়ীতে আসে, তবে আমি পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন বন্টন করিব। এইসব মহিলা সন্তানকে গালি দিতে কি ছাই বিরত রাখিবে? এমন ছেলে বড় হইয়া স্বয়ং মাতাকেই গালির মাধ্যমে স্মরণ করে। কোন কোন ছেলে এমন জল্লাদ প্রকৃতির হয় যে, বিবির কারণে মাকে লাঠি দ্বারা জর্জরিত করিতে দ্বিধা করে না। তখন মার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মাটিতে মিশিয়া যায়। মোটকথা, সন্তানের জন্মের ব্যাপারে এইসব গোনাহ্ করা হয়।

এখন সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরবর্তী অবস্থা শুনুন। জন্মলাভের পর সন্তানের অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই থাকে। আজ কানে বেদনা, নাকে কষ্ট, কাল কাশি, জ্বর ইত্যাদি। এই জাতীয় রোগে সকলেই ভোগে, কিন্তু ইহাতে ছোট শিশুদের খুব বেশী যত্ন নেয়া হয়। তাহাদের জন্য আমলকারী ব্যক্তি ডাকা হয়। সামান্য কারণেই তন্ত্রমন্ত্র ও টোট্‌কা চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া হয়। কেহ এইসব না করিলেও সন্তান প্রসবের পর নামায না পড়ার গোনাহে প্রায় সকল মহিলাই লিপ্ত হইয়া পড়ে। কেহ

নামায পড়িতে বলিলে তাহারা উত্তরে বলে যে, ছোট ছেলেপিলে লইয়া নামায পড়া কিরূপে সম্ভবপর? সর্বদাই কাপড় নাপাক থাকে। কোন সময় পায়খানা করিয়া দেয় এবং কোন সময় প্রস্রাব করিয়া দেয়। কাপড় বদলাইয়া লইলেও নামায পড়ার অসুবিধা দূর হয় না। কারণ, শিশু কোল হইতে নামিতেই চায় না। নামাযের জন্য তাহাকে সরাইয়া রাখিলে কান্নাকাটি ও চীৎকার জুড়িয়া দেয়। তাহারা আরও বলে, মৌলবীদের তো ছেলেপিলে হয় না, তাহারা এই বিপদের কথা কি জানে? তাহারা তো কেবল নামাযের জন্য তাকিদ করিতেই জানে।

আমি বলি, মৌলবীদের ছেলেপিলে হয় না ঠিক, কিন্তু তাহাদের বিবিদেরও কি ছেলেপিলে হয় না। যাইয়া দেখ, তাহারা কেমন নিয়মানুবর্তিতার সহিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে। আল্লাহ্‌র কোন কোন বাঁদী নামাযের পর তেলাওয়াতে কোরআন, মোনাজাতে মকবুল, এমনি কি, এশ্‌রাকের নামায পর্যন্ত রীতিমত পড়িয়া থাকে। তাহাদের কি সন্তান নাই? কেবল তোমাদের সন্তানই এমন আলালের ঘরের দুলাল যে, তাহাদিগকে লইয়া নামায পড়া যায় না।

আমি আরও বলি যে, যখন তোমাদের শিশু কান্নাকাটি করে এবং কোল হইতে কিছুতেই নামিতে চায় না, তখন স্বয়ং তোমাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে কি করিবে? তখন কি ছেলেকে পালঙ্কের উপর কান্নারত অবস্থায় রাখিয়া পেশাব-পায়খানা করিতে যাইবে না? নিশ্চয়ই যাইবে এবং সকলেই যায়। সেখানে মাঝে মাঝে অনেক দেরীও হইয়া যায়। ছেলের কান্নাকাটির প্রতি তখন ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। এখন জিজ্ঞাসা করি, পেশাব-পায়খানার জন্য তোমরা যতটুকু কর, নামাযের জন্য ততটুকুও করিতে পার না কি? আফ্‌সোস, তোমরা শুধু অনর্থক ওযর পেশ করিয়া থাক।

আমার তৃতীয় কথা এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ করার সঙ্কল্প করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে অবশ্যই সাহায্য করেন। যে সব মহিলা উপরোক্তরূপ বাহানা করে, তাহারা নামায আরম্ভ করিয়া দেখুন—খোদা চাহে তো তাহা খুব সহজ হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, আজকাল মহিলারা নামায পড়ার সঙ্কল্পই করে না। কাজেই না করার জন্য শত বাহানা উপস্থিত হয়। নতুবা সঙ্কল্প এমন জিনিস যে, যে ব্যক্তি বৃষ্টি কিংবা শীতাধিক্যের কারণে বিছানা হইতে উঠিয়া পানি পান করিতে পারে না, তাহার নিকট যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নির্দেশ পৌঁছে যে, অমুক স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে সে দুই মাইলও পায়ে হাঁটিয়া তথায় পৌঁছিতে পারে। তখন তাহাকে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে যে, তাহার মধ্যে এই শক্তি কোথা হইতে আসিল? আমার মতে, ইহা সঙ্কল্পেরই শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতেই সাহায্য করার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

॥ কাযার কাফ্ফারা ॥

বন্ধুগণ, মহিলারা নামায পড়ার সঙ্কল্পই করে না, নতুবা উহা কঠিন কাজ নহে। আমি একটি তদবীর বলিয়া দিতেছি। ইহা পালন করিলে সত্বরই নামাযের পাবন্দী হাছিল হইবে। তদবীরটি এই যে, এক ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়া গেলেই এক ওয়াক্ত উপবাস কর। এরপর কখনও নামায কাযা হইবে না। কেহ বলিতে পারে যে, উপবাস দ্বারা নামাযের পাবন্দী হইবে, কিন্তু উপবাসের পাবন্দী কিরূপে হইবে? ইহারও তদবীর বলিয়া দেওয়া উচিত। কেননা, উপবাস নামায অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। কে ইহা করিতে পারিবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, উপবাসে কোনকিছু করিতেই হয় না; বরং কয়েকটি কাজ হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে হয়। কোন কাজ না করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কাজ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কাজ না করা মুশকিল হইবে কেন?

কেহ এই তদবীরটি পালন করিতে না পারিলে সে নিজের উপর কিছু আর্থিক জরিমানা নির্দিষ্ট করিয়া লউক। যেমন এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া গেলে এত পয়সা খয়রাত করিব। অথবা নামায নির্দিষ্ট করিয়া লউক। উদাহরণতঃ এক নামায কাযা হইয়া গেলে তজ্জন্য জরিমানাস্বরূপ দশ রাকআত নামায পড়িবে। এইরূপ করিতে থাকিলে কিছু দিনের মধ্যেই নফস ঠিক হইয়া যাইবে। (ইনশাআল্লাহ্) আমল করিয়া দেখুন।

॥ ভবিষ্যতের ভ্রান্ত-চিন্তা ॥

তৃতীয় ভুলটি হইল আওলাদের ভবিষ্যৎ-চিন্তা। ইহাতে মানুষ অনেক ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখিয়া দেয় এবং মেয়েদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেয়। নিঃসন্দেহে ইহা কঠিন পাপ কাজ। তদুপরি মজার ব্যাপার এই যে, ঐ সম্পত্তি সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম উপায়ে অর্জন করা হয়। ইহা আরও একটি পৃথক পাপ। এরপর জীবদ্দশাতেই আওলাদের নামে দাখিলা ইত্যাদি করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলাফল তাহারা দুনিয়াতেই এইভাবে দেখে যে, সম্পত্তির মালিক হইয়া কোন সময় আওলাদ মাতাপিতাকে একটি দানা পর্যন্ত খাইতে দেয় না। মৃত্যুর পর পিতামাতার নামে সওয়াব পৌঁছানো দূরের কথা, কেহ ভুলেও তাহাদের নাম লয় না। তবে দুই চারি দিন সমাজের লোকদিগকে দেখাইবার জন্য যৎসামান্য ব্যয় করা হয়। রিয়ার নিয়তে করার দরুন ইহাতে পিতামাতার কোন উপকার হয় না। নিজের উপর হইতে অপবাদ ও তিরস্কার দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য থাকে।

এই অমনোযোগিতার পর তাহার পিতাকে ভুলিয়া পিতার সঞ্চিত সম্পত্তি স্বীয় আরামের জন্য ব্যয় করে না। ইহা করিলেও পিতামাতার উদ্দেশ্য কিছুটা

হাছিল হইত। ইহার পরিবর্তে পিতামাতার টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি বেশ্যা, গায়িকা ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রাণ খুলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। পিতামাতা বিপদাপদ সহ্য করিয়া, পেট কাটিয়া, ঈমান হারাইয়া এবং মাথার উপর পাপের বোঝা লইয়া সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিল; কিন্তু সাহেবযাদা উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল না; বরং সমস্তই নিকৃষ্ট কাজে উড়াইয়া দিল। (কেন এরূপ হইবে না? مال حرام بود بجائے حرام رفت—হারাম মাল ছিল, হারাম স্থানেই পৌঁছিয়াছে।)

এই কারণেই জনৈক বুযুর্গ এরশাদ করেন, আওলাদের জন্য কোনকিছু সঞ্চিত করিও না। কারণ, আওলাদ হয় খোদার দোস্ত ও অনুগত হইবে, না হয় শত্রু ও অবাধ্য হইবে। দোস্ত ও অনুগত হইলে খোদা আপন দোস্তদিগকে নষ্ট করেন না। তাহাদের জন্য তোমার ভাবনা করার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহারা খোদার শত্রু ও অবাধ্য হয়, তবে খোদার অবাধ্যতায় তাহাদের সাহায্য করা সমীচীন নহে।

বাস্তবিকই উক্তিটি চমৎকার বটে। কিন্তু আমি সকলকেই এরূপ হইয়া যাইতে বলি না। ইহা উপরোক্ত বুযুর্গের বিশেষ অবস্থা ছিল। ঐ অবস্থাতেই তিনি সকলকে ইহার তা'লীম দিয়াছেন। হাদীস শরীফে মাল সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ দান করিয়া বলা হইয়াছে যে, আপন সন্তানদিগকে নিঃস্ব ছাড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা মালদার রাখিয়া যাওয়া উত্তম। অতএব, আওলাদের জন্য কিছু সঞ্চিত মাল রাখিয়া দুনিয়া ত্যাগ করা মন্দ নহে। তবে অন্যের গলা কাটিয়া তাহাদের জামা সেলাই করা উচিত নহে। অর্থাৎ ঘুষ, সুদ এবং গরীবের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করা সমীচীন নহে। কেহ এই সকল অন্যায় কর্ম না করিলেও অপর একটি অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। তাহা এই যে, মেয়েদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখিয়া দেয়।

এইগুলিই হইতেছে আমাদের মাল ও আওলাদ সংক্রান্ত গোনাহ্। আমি সংক্ষেপে এইগুলিই বর্ণনা করিয়াছি। ইহাতে আপনি অবগত হইয়া থাকিবেন যে, মাল ও আওলাদই অধিকাংশ গোনাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে হক তা'আলা আয়াতে এরশাদ করেন: হে মুসলমানগণ? এই মাল ও আওলাদ যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র অর্থাৎ আনুগত্য হইতে গাফেল করতঃ গোনাহে লিপ্ত না করিয়া দেয়। যাহারা ইহাদের কারণে গোনাহে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ ক্ষতিগ্রস্ত লোকগণ ॥

আয়াতে কি চমৎকার শব্দ এরশাদ করা হইয়াছে: فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

'অর্থাৎ, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এরূপ ব্যক্তি লাভের বস্তুতে ক্ষতি অর্জন করিবে। এই ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাল ও আওলাদ স্বয়ং

ক্ষতিকর বস্তু নহে ; বরং গোনাহের কারণ হইয়া না দাঁড়াইলে প্রকৃতপক্ষে এগুলি লাভদায়ক বস্তু। কারণ, যে কোন লোকসানকেই خسران বা ক্ষতি বলা হয় না ; বরং মুনাফা তথা লাভের বস্তুতে লোকসান হওয়াকেই خسران বলা হয়। মোটকথা, এইসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত এবং লোকসানদায়ক কাজে লিপ্ত।

স্থানকাল উল্লেখ না করিয়া আয়াতে শুধু ক্ষতির কথা উল্লেখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, শুধু আখেরাতেই নহে ; বরং দুনিয়াতেও তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, যাহারা মাল ও আওলাদকে অত্যধিক ভালবাসে, ঐ ভালবাসাই তাহাদের প্রাণের শান্তির জন্য কাল হইয়া দাঁড়ায় এবং এই মাল ও আওলাদই তাহাদিগকে গোনাহে লিপ্ত করে। মালের মহব্বত যে প্রাণের শান্তির জন্য কালস্বরূপ, তাহা কাহারও অজানা নহে। কিরূপে টাকা-পয়সা বাড়ানো যায়, দিবারাত্র কেবল এই চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খাইতে থাকে। আজ এত এত টাকা আছে, আগামীকাল এত টাকা হওয়া দরকার। এরপর নিজের জানকে বিপদে ফেলিয়া টাকা সঞ্চয় করা হয়। এরপর ঠিক স্থানে আছে কি না, রাত্রিকালে তাহা বারবার দেখা হয়। চোরের ভয়ে রাত্রির পর রাত্রি চক্ষু হইতে নিদ্রা উধাও হইয়া যায়। আওলাদ যে প্রাণের শান্তির পক্ষে বোঝা স্বরূপ তাহা বুঝিবার জন্য একটি গল্প বলিতেছি। আমি দেশের শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তির কন্যার অবস্থা জানি। তিনি আপন সন্তানদিগকে যারপর নাই ভালবাসিতেন। এমন কি, রাত্রিবেলায় তিনি সকলকে লইয়া একসঙ্গে শয়ন করিতেন। কোন সন্তান দূরে থাকিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সন্তানদের সংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল এবং এক পালঙ্কে স্থান সংকুলান হইল না, তখন তিনি পালঙ্কে শয়ন করার অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। সকলকে লইয়া মাটিতেই বিছানা পাতিয়া নিদ্রা যাইতেন। ইহাতেও মনে শান্তি আসিত না। ফলে কাহারও উপর হাত এবং কাহারও উপর পা রাখিয়া দিতেন। রাত্রে বারবার জাগ্রত হইয়া সন্তানদের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইতেন।

এরূপ মহব্বত আযাব নয় তো কি? এরপর যদি ভাগ্যে ঈমানও না জুটে, তবে উভয় জাহানেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই কারণে হক তা'আলা বলেন :

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○

'তাহাদের (মুনাফিকদের) মাল ও আওলাদ যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু চান যে, এইসব জিনিস দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেও শাস্তির মধ্যে পতিত রাখেন এবং কুফর অবস্থায়ই তাহাদের প্রাণ-বায়ু নির্গত হইয়া যায়।'

কেননা, তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতে এতদুভয়ে কোথাও শান্তি পায় নাই। আর ঈমানদার হইলে কেবল দুনিয়াতেই হয়ত অশান্তি হইতে পারে। তাহাদের আখেরাত খোদা চাহে তো শান্তি ও সুখময় হইবে। মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, সময়ে মাল ও আওলাদ গোনাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতি সীমিত হউক কিংবা অসীম। পক্ষান্তরে যাহারা মাল ও আওলাদকে সীমিত পর্যায়ে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ তা'আলার হককে প্রাধান্য দেয়—উহা নষ্ট করে না, তাহারা সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করে। এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। দোআ করুন, খোদা তা'আলা আমাদিগকে যেন তাঁহার স্মরণ হইতে গাফেল না করেন এবং মাল ও আওলাদকে আমাদের জন্য ফেৎনার কারণ না বানাইয়া দেন। আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

আশার উৎস

দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন ও আখেরাতের প্রস্তুতির প্রতি উৎসাহদান সম্পর্কে এই ওয়ায ১লা জমাদাস সানী রবিবার ১৩৩৫ হিজরীতে ৫০০ শ্রোতার সম্মুখে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা যাফর আহমদ ছাহেব ওছমানী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

•

নেক আমলসমূহকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা মারাত্মক ভুল। প্রত্যেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ। আপন আমলকে এই হিসাবে খুবই হেয় মনে কর যে, ইহা তুমি করিয়াছ। কিন্তু হক তা'আলা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন এই হিসাবে উহাকে খুব গুরুত্ব দাও।

•

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

আয়াতের অর্থঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা (মাত্র) স্থায়ী নেক আমলসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম।

॥ দুনিয়া তলব (অন্বেষণ) করা ॥

এই বিষয়বস্তুটি অবশ্য অনেকবার শুনা হইয়াছে। যাহারা এই আয়াতের বাহ্যিক আলোচ্য বিষয় পূর্বেও শুনিয়াছে তাহারা হয়তো বুঝিয়া লইয়াছে এবং মনে মনে বলিতেছে যে, ইহা তো সংসার-লিপ্ততা হইতে বিরত রাখার পুরাতন আলোচ্য বিষয়। সম্ভবতঃ এই কারণে বিষয়টির গুরুত্বও তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কেননা, আজকাল—পূর্বে শুনা হয় নাই এমন নূতন বিষয়বস্তুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু আমার মতে পুরাতন হওয়া কোন জিনিসের গুরুত্বহীনতার কারণ হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি ইসলাম ধর্মকে পেশ করিতেছি। ইহাও বহু পুরাতন এবং তের শত বৎসর হইতেও বেশী আগেকার। পুরাতন হইলেই যদি কোন বস্তু গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে তবে নাউযুবিল্লাহ্ ইসলামকেও গুরুত্বহীন বলিতে হইবে। কোন সত্যিকার মুসলমান ব্যক্তি এরূপ বলিতে উদ্যত হইবে বলিয়া আমি কল্পনাও করিতে পারি না। হাঁ, যদি কোন নামেমাত্র মুসলমান ইহা বলিতে প্রস্তুত হয়, তবে আমি তাহাকে বলিব যে, এসব অপকৌশলে কেন মাতিয়াছ ? পরিষ্কার বলিয়া দাও না যে, আমরা খোদা তা'আলাকেই ত্যাগ করিতেছি। কারণ তিনি এত বেশী পুরাতন যে, اَلْاَوَّلُ الَّذِىْ لَيْسَ قَبْلَهٗ شَىْءٌ 'তিনিই সর্বপ্রাচীন যে, তাঁহার পূর্বে কিছুই নাই।' অবশ্য এখন কর্ণকুহরে আওয়ায পৌঁছিতেছে না ; কিন্তু সকলেরই অন্তরে অন্তরে এই কথা আনাগোনা করিতেছে যে, আমরা ইসলাম এবং খোদা তা'আলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। সুতরাং খোদা তা'আলাকে যখন ত্যাগ করা যায় না, তখন তাঁহার কালামকে কিরূপে ত্যাগ করা যাইবে ?

এই কারণে আমি প্রথমে নূতন আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসল উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করার ন্যায় কোনরূপ বিভ্রান্তির আশ্রয় লইতে চাই না ; বরং সরাসরি পুরাতন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই স্পষ্ট ভাষায় আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে, একেবারে মূল্যহীন এবং বাজে। সূর্যের সম্মুখে যেমন তারকারাজি আলোকহীন এবং গভর্ণরের সম্মুখে যেমন কনেষ্টবল মর্যাদাহীন, আখেরাতের সম্মুখে দুনিয়াও তদ্রূপ। খোদার কসম, আখেরাতের সহিত দুনিয়া উল্লেখিত হয়—দুনিয়ার পক্ষে গৌরবই যথেষ্ট ঃ

فی الجمله نسبتے بتو کافی بود مراد + بلبل همیں که قافیۂ گل شود بس ست

(ফিল্ জুমলা নিস্‌বতে বতু কাফী বুয়াদ মুরাদ
বুলবুল হামী কেহ্ কাফিয়ায়ে গুল শাওয়াদ বসাস্ত)

'অর্থাৎ, তোমার সহিত কোন না কোন দিক দিয়া সম্পর্ক থাকাই যথেষ্ট। বুলবুলের জন্য গুল (ফুল) শব্দের পরিমাপে হওয়াই যথেষ্ট।'

কনেষ্টবলের পক্ষে এতটুকু গুরুত্বই যথেষ্ট যে, সরকারী কর্মচারীদের তালিকায় গভর্ণরের সহিত তাহার নাম উল্লেখিত হয়। ছুনিয়াদারগণ কি কামনা করে যে, আমরা ধর্মের নাম উচ্চারণই না করি এবং দিবারাত্র কেবল ছুনিয়ার কথাই আলোচনা করি? আমাদের কাছে এরূপ আশা করা বৃথা। তবে তাহাদের মন রক্ষার্থে মাঝে মাঝে ছুনিয়ার কথাও উল্লেখ করি। তাহাও ছুনিয়ার সকল কথা নহে; বরং ছুনিয়ার প্রশংসনীয় কথা উল্লেখ করি। ইহা আখেরাতের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। নিন্দনীয় ছুনিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসার্থে হউক বা নিন্দা প্রকাশার্থে হউক কোন প্রকারেই উল্লেখযোগ্য নহে। বলাবাহুল্য, মানুষকে খোদা তা'আলা হইতে দূরে সরাইয়া রাখার কারণে ইহা নিন্দনীয় বটে কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিন্দা প্রকাশার্থেও ইহা উল্লেখযোগ্য নহে।

এই কারণেই হযরত রাবেয়া বছরীয়া রাযিআল্লাহু আন্‌হা একদা কতিপয় সংসার-বিরাগী ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে ছুনিয়ার নিন্দা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: قوموا عنى فانكم تحبون الدنيا

'তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। কারণ তোমরা ছুনিয়াকে ভালবাস।' অথচ তাঁহারা ছুনিয়ার নিন্দা করিতেছিলেন। তবে প্রয়োজন ব্যতিরেকেই এরূপ করিতেছিলেন। আজকালকার মুসলমানগণ ছুনিয়ার সহিত এত অধিক সম্পর্ক রাখে যে, খোদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহারা ছুনিয়ার সহিত তাহাই করে। অর্থাৎ, খোদাতা'আলাকে এইভাবে তলব করা উচিত:

اے برادر بے نہایت در گہیست + ہرچہ بروئے می رسی بروئے مایست

(আয় বেরাদর বেনেহায়েত দরগাহীস্ত + হরচেহ্ বরওয়ে মী রসী বরওয়ে মইস্ত)

অর্থাৎ, 'হে ভাই! খোদার দরগার কোন সীমা নাই। তুমি যেখানেই পৌঁছ, সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিও না।

কিন্তু আজকাল ছুনিয়া তলব করার বেলায় হুবহু এইরূপ করা হইতেছে যে, ইহাকে কোন সীমায় সীমিত করা হয় না: لا ينتهى ارب الا الى ارب

'এক কাজ শেষ করিয়াই অন্য কাজে লাগিয়া যায়।' এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিলে ছুই হাজারের চিন্তা করিতে থাকে! কাহারও হাতে এক লক্ষ টাকা থাকিলে সে ছুই লক্ষের আশা পোষণ করিতেছে। মৃত ছুনিয়াকে তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে:

بحریست بحر عشق ہیچش کنارہ نیست + آن جا جز اینکہ جان بسپارند چارہ نیست

(বহ্‌রীস্ত বহ্‌রে এশক্ হিচাশ কিনারা নীস্ত
আঁজা জুয ই কেহ্ জাঁ বস্পুারান্দ চারা নীস্ত)

অর্থাৎ, 'এশ্‌কের দরিয়ার কোন কুল-কিনারা নাই। এখানে প্রাণ সপিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।'

আজকাল এই লইয়া গর্ব করা হয় যে, আমি তো একেবারে দুনিয়ার সহিত মিশিয়া গিয়াছি। টাকা-পয়সা রোজগার করা ছাড়া আমার অন্য কোন কাজ নাই। একজন বলে, আমি এত টাকা লাভ করিয়াছি। অপর জন বলে, আমার নিকট এত টাকা সঞ্চিত আছে। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, আমি এত এত দোকানের মালিক এবং প্রত্যেক দোকান হইতে এত টাকা করিয়া আমদানী হয়। গর্বের সহিত এইসব কথা আলোচনা করা হয়।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেনঃ দুনিয়াদারদের এইরূপ গর্ব করা দুই মেথরের পারস্পরিক গর্বের ন্যায়। এক মেথর বলে, আমি এতগুলি ময়লার ঝুড়ি উপার্জন করিয়াছি। ইহার উত্তরে অপর মেথর বলে, আমি তোর চেয়ে বেশী ঝুড়ি কামাই করিয়াছি। নিন্দনীয় দুনিয়া ইহাকেই বলে। ইহা মানুষকে খোদা তা'আলা হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। প্রশংসনীয় দুনিয়া উপার্জন করিতে কেহই নিষেধ করে না।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সকলের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন। ইহা শুধু আমাদের মতেই নহে—আমরা তাঁহার দাসানুদাস। কাজেই তাঁহাকে সবচাইতে বুদ্ধিমান, সবচাইতে উত্তম, সবচাইতে কামেল ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত মানিয়াই থাকি। কিন্তু তিনি এই পর্যায়ের জ্ঞানী ছিলেন যে, কাফেরেরাও তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা আমাদের চেয়েও বেশী হুযুর (দঃ)কে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের বিশ্বাস হইল এই যে, খোদাতা'আলার সাহায্যের বদৌলতেই হুযুর (দঃ) সকল উদ্দেশ্যে সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু কাফেরেরা ইসলামী আলোকরশ্মির দৈনন্দিন প্রসার লক্ষ্য করিয়া উহাকে হুযুর (দঃ)-এর জ্ঞান বুদ্ধিরই প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করে। তাহারা বলাবলি করেঃ মুসলমানদের পয়গাম্বর এতই দূরদর্শী--জ্ঞানী ছিলেন যে, তাঁহার উদ্ভাবিত কর্ম-পদ্ধতির ফলেই ইসলাম সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। অতএব, যে বিষয়টিকে আমরা পয়গাম্বরের ক্ষমতা-বহির্ভূত ও খোদায়ী সাহায্যের ফল মনে করি, তাহারা উহাকে হুযুর (দঃ)-এর বিবেক বুদ্ধিরই ফল মনে করে। কাজেই কাফেরেরা যেন আমাদের চেয়েও বেশী হুযুর (দঃ)কে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে। এই সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেনঃ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ 'হালাল উপার্জন করা অন্যতম ফরয।' অর্থাৎ, যাহা না হইলে চলে না, এই পরিমাণ দুনিয়ার উপার্জনকে হুযুর (দঃ) ফরয বলিতেছেন। আপনারা দুনিয়া উপার্জনকে শুধু যৌক্তিক দিক দিয়া

ওয়াজেব বলেন আর হুযুর (দঃ) ইহাকে শরীয়তের একটি ফরয বলিতেছেন। ইহা তরক করিলে আখেরাতে আযাব ভোগ করিতে হইবে। মোটকথা, প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া উপার্জন নিষিদ্ধ নহে। তবে দুনিয়াকে মহব্বত করা এবং অন্তরে উহাকে গুরুত্ব দেওয়া—যদিও তাহা নিন্দার ভঙ্গীতে হয়—অবশ্যই নিষিদ্ধ।

॥ সম্মান তলব করা ॥

এই কারণেই হযরত রাবেয়া বছরীয়া বলিয়াছিলেন : قُومُوا عَنِّي فَإِنَّكُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا 'তোমরা আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও। কেননা, তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস।' ইহাতে দরবেশগণ আরয করিলেন, হযরত! আমরা দুনিয়ার নিন্দা করিতেছি। ইহাতে দুনিয়াকে ভালবাসা হইল কিরূপে? হযরত রাবেয়া উত্তরে বলিলেন : مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ 'যে ব্যক্তি যে কোন জিনিসকে ভালবাসে, বারবার উহারই উল্লেখ করে।' তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কিছু গুরুত্ব আছে বলিয়াই তোমরা উহার নিন্দা করিতে বসিয়াছ। নিয়ম হইল, অন্তরে যে জিনিসের সামান্যও গুরুত্ব নাই, সেই সম্বন্ধে নিন্দাসূচক আলোচনাও করা হয় না।

সেমতে আমরা গল্পগুজবের মজলিসে বসিয়া পদাধিকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করি; কিন্তু চামার কুমারের নিন্দা কখনও করি না। কেননা, আমাদের দৃষ্টিতে চর্মকারের কোন গুরুত্ব নাই; কিন্তু পদাধিকারী ব্যক্তিদের গুরুত্ব আছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ছাত্রসুলভ প্রশ্ন হইতে পারে। কোন ছাত্রের মস্তিষ্কে হয়তো প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, হুযুর (দঃ)ও দুনিয়ার নিন্দা করিয়াছেন। তবে কি "নাউযু-বিল্লাহ্" তাঁহার দৃষ্টিতেও দুনিয়ার গুরুত্ব ছিল?

ইহার উত্তর এই যে, হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার গুরুত্ব মোটেই ছিল না। তবে দুনিয়ার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয় ও উহাকে গুরুত্ব দান করে—এমন কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই ছিল। এই কারণে দুনিয়ার নিন্দা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। উম্মতের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক কেহই না থাকিলে হুযুর (দঃ) কস্মিনকালেও দুনিয়ার নিন্দা করিতেন না। তিনি কোন দিন পেশাব-পায়খানার নিন্দা করেন নাই। কেননা, সকলেই ইহাকে ঘৃণা করিত। হুযুর (দঃ) মদের নিন্দা করিয়াছেন। কেননা সকলেই ইহাকে ঘৃণা করিত না; বরং কিছু সংখ্যক লোক ইহার জন্যও পাগলপারা ছিল। হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টিতে মদ যদিও পেশাব-পায়খানার সমতুল্য ছিল; কিন্তু উম্মতের কিছু সংখ্যক লোকের আগ্রহের কারণে উহার নিন্দা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, তিনি প্রয়োজন বশতঃই দুনিয়ার নিন্দা করিয়াছেন। হযরত রাবেয়ার দরবারে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের পক্ষে নিন্দা করার কোনরূপ প্রয়োজন

ছিল না। কেননা, সেখানে কেহই ছুনিয়াদার ছিল না—সকলেই ছিলেন ছুনিয়া ত্যাগী দরবেশ। তবে দরবেশগণ আপন বাহাছুরী যাহির করার নিমিত্ত মাঝে মাঝে ধনীদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ও তাহাদের উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার কথা আলোচনা করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে গর্ব করা। অতএব. এই ধরণের আলোচনায় বাহ্যতঃ যদিও ছুনিয়ার নিন্দা করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলোচনাকারী ছুনিয়া তলব করে। কেননা, সে সম্মান তলব করে। আর ইহাও ছুনিয়া তলব করার পর্যায়ভুক্ত। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি এই নিন্দা শুনিয়াও বুঝিয়া ফেলে যে, তাহার অন্তরে ছুনিয়ার গুরুত্ব লুক্কায়িত আছে ঃ

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش + من اندازِ قدت را می شناسم

(বহর রঙ্গে কেহ খাহী জামা মীপূশ + মান আন্দাযে কদাতরা মী শেনাসাম)

অর্থাৎ, 'যে কোনরূপেই জামা পরিধান কর না কেন, আমি তোমার দেহভঙ্গি ভালরূপেই চিনি।

॥ আউযুবিল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া ॥

মোটকথা, তিন কারণে ছুনিয়ার নিন্দা করা হয়। (১) প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে, কিংবা (২) নিন্দনীয় উদ্দেশ্যে অথবা (৩) অনর্থক নিন্দা করা। প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে নিন্দা করিলে তাহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নবী ও কামেল ব্যক্তিদের উক্তিসমূহে ছুনিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। নিন্দনীয় উদ্দেশ্যে নিন্দা করার উদাহরণ যথা, নিজ বাহাছুরী যাহির করার উদ্দেশ্যে নিন্দা করা। ইহা প্রকৃতপক্ষে নিন্দা নহে; বরং ছুনিয়া তলব করারই নামান্তর মাত্র। অনর্থক নিন্দা করিলে তাহাতে যদিও ছুনিয়া তলব করা বুঝায় না, তবে ইহা ছুনিয়ার প্রতি মহব্বতের লক্ষণ বটে। কেননা ঃ

گر ایں مدعی دوست بشناختے + بہ پیکار دشمن نہ پرداختے

(গর ইঁ মুদ্দয়ী দোস্ত বশেনাখ্‌তে + ব পায়কারে ছুশ্‌মন না পরদাখ্‌তে)

অর্থাৎ, 'এই বন্ধুত্বের দাবীদার ব্যক্তি যদি বন্ধুকে সম্যক চিনিত, তবে ছুশ্‌মনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত না'

খোদার সহিত যাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে প্রেমাস্পদের যিক্‌রে মশ্‌গুল হইয়া যায়, সে অনর্থক শত্রুর আলোচনায় লিপ্ত হয় না। হযরত রাবেয়ার দরবারে উপস্থিত দরবেশগণ সম্ভবতঃ অনর্থক ছুনিয়ার নিন্দা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি তাঁহাদিগকে সর্তক করিয়া দেন। এই নীতি অনুযায়ী হযরত রাবেয়া কখনও শয়তানের প্রতিও লা'নৎ করেন নাই। তিনি বলিতেন, দোস্তের আলোচনা ত্যাগ করিয়া ছুশ্‌মনের আলোচনা করিব কেন? কিন্তু ইহার মতলব এই নয় যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম'ও পড়িতে নাই। কোন

বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না; বরং কক্ষের বাহিরেই অবস্থান করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কি কাজে মশ্‌গুল আছেন। ঘটনাক্রমে ঐ বুযুর্গ তখন কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তেলাওয়াতের পূর্বে أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ০ পাঠ করতঃ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে শয়তান! আমি তোকে ভয় করি বলিয়া তোর নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই। আমি জানি খোদার নির্দেশ ব্যতীত তুই আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবি না। তবে খোদার আদেশের কারণেই তোর নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ, খোদাতা'আলা বলেন:

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ❋

"যখন আপনি ক্বোরআন পাঠ করিতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যাহারা ঈমানদার এবং আপন প্রভুর উপর ভরসা করে, তাহাদের উপর শয়তানের ক্ষমতা চলে না। তাহার ক্ষমতা শুধু ঐ ব্যক্তিদের উপর চলে, যাহারা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করে।"

আয়াতে হক তা'আলা ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, ঈমানদার ভরসাকারী ব্যক্তিদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তা সত্ত্বেও ভরসাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত (দঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ক্বোরআন তেলাওয়াতের সময় اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করিয়া লউন। ইহাতে এইভাবে দাসত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে যে, হে খোদা! আমরা এতই অক্ষম যে, সামান্যতম জিনিস হইতেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া সাক্ষাৎপ্রার্থী বুযুর্গের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আল্লাহু আকবার! তাঁহার মর্তবা কত উচ্চে! অতএব, এই কাহিনীর প্রথম অংশ দ্বারা আউযুবিল্লাহ্ তরক করার সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারিত; কিন্তু ইহারই শেষাংশে এই সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হইয়াছে।

আমি বলি, এই বুযুর্গের এত উচ্চ মর্তবায় পৌঁছিয়া যাওয়া—যেখানে শয়তানের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না—ইহাও আউযুবিল্লাহ্ পাঠেরই প্রতিক্রিয়া ছিল। অর্থাৎ, তিনি পূর্ব হইতেই যে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, উহারই বরকতে হক তা'আলা তাঁহাকে এই বিপদ মুক্ত মর্তবা দান করিয়াছেন। তিনি আজীবন ইহা

পাঠ না করিলে কিছুতেই এই মর্তবা লাভ করিতে পারিতেন না। অতএব, এই কাহিনী দ্বারাও বুঝা গেল যে, আরও বেশী পরিমাণে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা উচিত।

উদাহরণতঃ, মূসা (আঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। একবার তিনি একটি পাথরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। পাথরটি তখন অঝোরে ক্রন্দন করিতেছিল। মূসা (আঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে পাথরটি বলিল, যে দিন হইতে কোরআন শরীফের وقودها الناس والحجارة "মানব ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হইবে।" আয়াত শুনিতে পাইয়াছি, সেই দিন হইতে ভয়ে আমার কলিজা শুকাইয়া যাইতেছে এবং আমি কিছুতেই কান্না রোধ করিতে পারিতেছি না। মূসা (আঃ) দোআ করিলেন, হে আল্লাহ্। এই পাথরটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিও না। তৎক্ষণাৎ ওহী নাযিল হইল, আপনার দোআ কবুল হইয়াছে। অতএব, পাথরটিকে সান্ত্বনা দিন। তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। মূসা (আঃ) পাথরটিকে এই সুসংবাদ শুনাইলে সে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং কান্না বন্ধ করিয়া দিল। মূসা (আঃ) আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ফিরার পথে পাথরটির নিকট পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে আবার ক্রন্দন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে, এবার কাঁদিতেছ কেন? উত্তর দিল, হে মূসা, ক্রন্দনের বদৌলতেই এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব, যাহার বরকতে আমি এই অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?

তেমনি কেহ হযরত জুনাইদ (রহঃ)-এর হাতে তস্‌বীহ্ দেখিয়া বলিল, হযরত, তস্‌বীহ্ জপ করিবার আপনার কি প্রয়োজন? আপনি তো কামেল এবং চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আপনার শিরা-উপশিরায় তস্‌বীহ্ আপনাআপনিই গুঞ্জরিত হয়। তিনি উত্তরে বলিলেন, তস্‌বীহ্‌র বদৌলতেই এই মহান মর্তবা লাভ হইয়াছে। অতএব, যে সঙ্গীর কারণে এই রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকে ছড়িয়া দিব কি? সোব্‌হানাল্লাহ্! কি চমৎকার জওয়াব দিয়াছেন! সুস্থ জ্ঞানী কামেলগণ তস্‌বীহ্‌র প্রকৃত স্বরূপ বুঝেন। তাঁহারা ইহা ত্যাগ করার মত ভুল করিবেন না—যদিও মারেফাতের নেশায় মাতাল ব্যক্তিরা বলেঃ আমাদের জন্য তস্‌বীহ্‌র কি প্রয়োজন?

যাক্, একটি প্রশ্নের জওয়াব হিসাবে আলোচনার মধ্যস্থলে একথা বর্ণিত হইল। এখন আমি আবার আসল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তাহা এই যে, বুযুর্গগণ অনর্থক কাজ হইতে খুব দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। এই কারণে হযরত রাবেয়া প্রয়োজন ব্যতিরেকে শয়তানকেও লা'নত করিতেন না। এমতাবস্থায় তিনি অনর্থক দুনিয়ার নিন্দাবাদ কিরূপে সহ্য করিতে পারিতেন?

॥ পুনরালোচনার আবশ্যকতা ॥

এই কারণে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমরা ধর্মের সহিত নিন্দনীয় দুনিয়ার আলোচনা করিতেও রাযী নহি। তবে মাঝে মাঝে প্রশংসনীয় দুনিয়ার আলোচনা করিয়া থাকি। দুনিয়ার পক্ষে এতটুকু গর্বই যথেষ্ট। দুনিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করার মোটেই যোগ্য নহে। কেননা, উহা একেবারেই মূল্যহীন এবং 'কিছুই না'! এই বিষয়বস্তুটিকে আশ্চর্যজনক মনে করিবেন না। শক্তিশালী বস্তুর সম্মুখে দুর্বল বস্তু মূল্যহীন হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্রূপ আখেরাতের সম্মুখে দুনিয়ার কোন মূল্য নাই। ফলে ইহা পৃথকভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়ার যোগ্যই নহে। এই বিষয় বস্তুটি অবশ্য পুরাতন; কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুরাতন হইলেই কোন বিষয়-বস্তু গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে না।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন নহে, তবে ইহা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? কেননা, ইহা বহুবার শুনা হইয়াছে। অতএব, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি উত্তরে বলিব যে, প্রত্যেক বিষয়ের পুনরালোচনাই অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন নহে। ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমি আহার করাকে পেশ করিয়া থাকি। ইহা প্রত্যহই বারংবার করা হয়। এমনকি, দিনে চারি বারও আহার করা হয়। সকাল বেলায় বন্ধুবান্ধব লইয়া চা পান করা হয়। হযরত মাওলানা দেওবন্দী (রহঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী ইহা পরহেযগারদের ভাঙ্গ (মাদক দ্রব্য বিশেষ) সকল বেলায়ই এই ভাঙ্গপর্ব সম্পন্ন করা হয়। ইহার সহিত বিস্কুট, ডিম ইত্যাদি খাদ্যজাতীয় বস্তুও থাকে। অতঃপর দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যা বেলায় আহার করা হয়। এরপর রাত্রে দুধ কিংবা চা পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। 'চা'-কে আমি খাদ্য হিসাবে গণনা করিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, চা না হইলে চা পায়ীদের অস্থিরতার অন্ত থাকে না। মনে হয় যেন খাদ্যই খায় নাই।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রহঃ)-এর বাড়ীতে একবার জনৈক বাঙ্গালী মেহ্মান হইয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব মেহ্মানকে খানা খাওয়াইবার জন্য বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া মেহ্মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি খানা খাইয়াছেন কি? মেহ্মান বলিল, না। মাওলানা ছাহেব বাড়ী পৌঁছিয়া তজ্জন্য রাগারাগি করিলে তাহারা বলিল, আমরা তো মেহ্মানকে খানা খাওয়াইয়াছি। ইহাতে মাওলানা ছাহেব খুবই বিস্মিত হইলেন। অতঃপর চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, বাঙ্গালীরা ভাতকে খানা বলে। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মেহ্মানকে রুটি দেওয়া হইয়াছিল—ভাত দেওয়া হয় নাই।

তদ্রূপ চা ব্যতীত যখন খানা খাইয়াও তৃপ্তি হয় না, তখন চা-কেই তাহাদের খানা বলিতে হইবে। এইভাবে দৈনিক চারিবার আহার করা হয়। মোটকথা,

আহারের প্রয়োজন সব সময়ই বারংবার হয় বলিয়া কেহ ইহাকে নিষ্প্রয়োজন আখ্যা দেয় না। তাছাড়া সব নব বিবাহিত ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন। তাহারা প্রত্যহই স্ত্রীর নিকট কেন শয়ন করে? তাহাদের প্রত্যহ নূতন বিবাহ করা উচিত। এক বিবির কাছে এক দিনের বেশী যাওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে বারংবার যাওয়া হইবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আসল অবস্থা এই যে, বিবির সহিত সাক্ষাতের পর তাহার নিকট হইতে উঠিতেই মন প্রস্তুত হয় না।

আল্লাহ—একটি সামান্য সৌন্দর্য বার বার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না—আর হক তা'আলার ব্যাপারে মন তৃপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার আহ্‌কাম একবার শুনার পরই তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে—ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। হয়তো বলিবেন যে, বিবির ব্যাপারে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু আহ্‌কাম শুনার ব্যাপারে বৃদ্ধি পাওয়ার কি আছে? আমি বলি, যাহাদের অন্তরে হক তা'আলার মহব্বত প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন—ইহাতে কি বৃদ্ধি পায়? হক তা'আলার সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই— ইহাই তো আসল অভিযোগ। যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহাদের অবস্থা নিম্নরূপ :

دیده از دیدنش نگشتے سیر + همچناں کز فرات مستقی

'পিপাসিত ব্যক্তি যেমন ফোরাতের পানি দেখিয়াই তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে (খোদাকে) দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না।' কবি আরও বলেন :

دلارام در بر دلارام جوئے + اب از تشنگی خشک و بر طرف جوئے
نه گویم که برآب قادر نیند + که بر ساحل نیل مستسقی انند

(দিলারাম দরবার দিলারাম জুয়ে + লব আয তেশ্‌নেগী খুশ্‌ক ও বরতরফ জুয়ে নাগুয়েম কেহ্ বর আব কাদের নিয়ান্দ + কেহ্ বর সাহেলে নীল মুস্‌তাস্কীয়ান্দ)

অর্থাৎ, 'প্রেমাস্পদ কোলে, অথচ প্রেমাস্পদকে খুঁজিতেছে। নহরের কিনারায় বসা সত্ত্বেও পিপাসায় ওষ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। আমি এই কথা বলি না যে, তাহারা পানি পাইতেছে না; বরং নীল নদের তীরে বসিয়াও তাহারা পিপাসিত।'

দুনিয়াতে সৌন্দর্যের বিকাশ কোন না কোন অবস্থা ও সীমায় পৌঁছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তাসত্ত্বেও ইহা হইতে তৃপ্তিলাভ হয় না। যেখানে সৌন্দর্যের বিকাশ সর্বদাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেখানে কি অবস্থা হইবে? হক তা'আলার সৌন্দর্যের বিকাশ এইরূপ :

نه گردد قطع هرگز جادۂ عشق از دویدنها
که می بالد بخود این راه چوں تاک از بریدنها

(নাগরদাদ ক্বাতা হরগীয জাদায়ে এশ্‌ক আয দবীদান্‌হা
কেহ্ মী বালাদ বখুদ ঈ রাহ্ চূঁ তাক্ আয্ বরীদান্‌হা)

'অর্থাৎ, এশকের রাস্তা দৌড়িয়া অতিক্রম করা যায় না। ইহা আপনাআপনি বাড়িয়া যায়, যেমন আঙ্গুরের বৃক্ষ কাটিলে বাড়িয়া যায়।' এবং তাঁহার সৌন্দর্যের শান এইরূপ :

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنہ مستسقی و دریا ہمچناں باقی

(না হুস্‌নশ্‌ গায়তে দারাদ না সা'দীরা সুখন পায়াঁ
বমীরাদ তিশ্‌না মুস্‌তাস্‌কী ও দরিয়া হমচুনাঁ বাকী)

অর্থাৎ, 'তাঁহার সৌন্দর্য অনন্ত। উহা বর্ণনা করার মত ভাষা সা'দীর নাই, পিপাসিত ব্যক্তি পিপাসার্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু দরিয়া তেমনই থাকিয়া যায়। এই কারণে জনৈক বুযুর্গ বলেন :

قلم بشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم درکش
حسن ایں قصۂ عشق است در دفتر نمی گنجد

(কলম বিশকান্ সিয়াহী রীয ও কাগজ সূয দমদরকাশ
হুস্‌নে ই কিছ্‌ছায়ে এশ্‌ক আস্ত দর দফতর নমী গুনজাদ)

অর্থাৎ, 'কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি বহাইয়া দাও, কাগজ পুড়িয়া ফেল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর। ইহা এশ্‌কের সৌন্দর্য। বিরাট পুস্তকেও ইহার বর্ণনা শেষ হইবে না।'

সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ বলেন, জান্নাতের মধ্যেও মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতি শেষ হইবে না। সেখানেও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকিবে। এমন কি, কোন কোন হালবিশিষ্ট সাধক বলেন : জান্নাতে এমন এক দল থাকিবে—তাহারা জান্নাতের বালাখানা ও হুরদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না। তাহারা সর্বদাই اَرِنِىْ اَرِنِىْ (আমাকে দেখা দাও আমাকে দেখা দাও) বলিতে থাকিবে। কেননা, সেখানে হক্ তা'আলার সৌন্দর্যের বিকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে থাকিবে। এই কারণে প্রত্যেকটি তজল্লীর পর অন্য তজল্লী দেখার আগ্রহ দেখা দিবে। ইহার আনন্দের সম্মুখে হুর ও বালাখানা একেবারেই মূল্যহীন মনে হইবে।

॥ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ॥

দুনিয়াতে আমি নিজেও এমন বুযুর্গ দেখিয়াছি—যিনি হুরের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। শুধু খোদা তা'আলারই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মজযুব (আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মহারা) ধরনের ব্যক্তিদের মুখ হইতেই এসব কথা জানা যায়। কামেল তত্ত্বজ্ঞানী বুযুর্গগণ এসব কথা প্রকাশ করেন না। এই কারণে আরেফ রূমী বলেন :

راز درون پرده ز رندان مست پرس ÷ کین حال نیست صوفیٔ عالی مقام را
(রায দরুনে পরদা যেরিন্দানে মস্ত পুর্‌স + কিঁ হাল নীস্ত সুফীয়ে আলী মকাম রা)

অর্থাৎ, 'গুপ্ত রহস্যে আত্মহারা দরবেশদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। উচ্চমর্তবাসম্পন্ন ছুফী ব্যক্তির অবস্থা এরূপ নহে যে, তাহাদের নিকট জানিতে পারিবে।'

ইহার কারণ এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছুফী নিজ হালের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ফলে সে খুবই সংযত থাকে এবং গোপন রহস্য প্রকাশ করে না। এই গোপন রহস্য প্রকাশ না করার কয়েক প্রকার কারণ থাকে। গোপন রহস্যের প্রতি গায়রতের (সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের) কারণে। তখন সে এইরূপ বলে:

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نه دهم
گوش را نیز حدیث تو شنیدن نه دهم

(গায়রত আয চশ্‌মে বুরম রুয়ে তু দীদান নাদেহাম
গুশ রা নীয হাদীসে তু শানীদান নাদেহাম)

অর্থাৎ, 'আমি নিজ চক্ষের সহিত গায়রত বা ঈর্ষা রাখি তাই আমি আমার চক্ষুকে তোমার চেহারা দেখিতে দিব না এবং কর্ণকেও তোমার কথা শুনিতে দিব না।'

কিংবা সম্বোধিত ব্যক্তির শত্রুতার কারণে। তখন এইরূপ বলে:

با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی + بگزار تا بمیرد در رنج خود پرستی
(বামুদ্দয়ী মুগুইয়াদ আস্‌রারে এশক ও মস্তী + বগুযার তা বমীরাদ দররঞ্জে খুদ পরস্তী)

অর্থাৎ, 'এশ্‌কের দাবীদারের নিকট এশ্‌ক ও মত্ততার রহস্য বলিতে নাই। তাহাকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও যাহাতে সে অহঙ্কারের জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে।

কিংবা সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্যাবলী বুঝার ক্ষমতা না থাকার কারণে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী বলেন:

نکتها چون تیغ فولاد است تیز + چون نداری تو سپر واپس گریز
(নুক্‌তাহা চুঁ তেগ ফওলাদ আস্ত তেজ + চুঁ নাদারী তু সুপার ওয়াপেস গুরীয)

অর্থাৎ, এশ্‌কের সূক্ষ্মতত্ত্ব তরবারির ন্যায় ধারাল। তোমার নিকট যখন ঢাল নাই, তখন তুমি ফিরিয়া যাও।' سپر (ঢাল) বলিয়া বিবেক বুঝানো হইয়াছে:

پیش این الماس بے سپر میا + کز بریدن تیغ را نه بود حیا

'এই হীরকের নিকট ঢাল ব্যতীত আসিও না। কেননা, তরবারি কাটিয়া ফেলিতে লজ্জা করিবে না।'

যাহারা বিনা দ্বিধায় প্রত্যেকের সম্মুখে গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া ফিরে, এস্থলে মাওলানা রুমী তাহাদের খুব নিন্দা করিয়াছেন। কারণ, তাহারা সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে কি না, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। মাওলানা বলেন:

ظالم آن قومی که چشما دوختند + از سخنها عالمی را سوختند

(যালেম আঁ কওমে কেহ্ চশমা দোখ্‌তান্দ + আয্ সুখন্‌হা আলমে রা সুখ্‌তান্দ)

অর্থাৎ, 'যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া কথার আগুনে দুনিয়াকে পুড়িয়া ফেলে, তাহারাই যালেম।'

মোটকথা, মাওলানা রূমী শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। বক্তা আত্মহারা (মগ্‌লুবুল হাল) না হইলে তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, প্রত্যেকের সম্মুখে গোপন রহস্য প্রকাশ করিও না। বক্তা আত্মহারা হইলে শ্রোতাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদের নিকট শুনিয়া সূক্ষ্ম রহস্যাবলী অন্যের আছে বর্ণনা করিও না এবং উহা বুঝিবারও চেষ্টা করিও না। এই কারণে আমাদের বুযুর্গগণ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রকাশ করেন না। কেহ কোন সময় প্রকাশ করিলেও সকলের সম্মুখে করেন না ; বরং বিশেষ মজলিসে দুই এক কথা বলিয়া দেন।

একবার আমি মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নির্জনে বিশেষ মজলিস লইয়া বসিয়াছিলেন। উহাতে প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেহ আসিলে ধমক খাইত। মুরীদদিগকে মাঝে মাঝে ধমক দেন—এমন বুযুর্গদেরও প্রয়োজন আছে। কেহ কেহ আবার সীমাতিরিক্ত কঠোরতা করেন। বাদশাহ্‌দের ন্যায় নিয়ম-কানুন ও শাস্তি নির্ধারিত করেন। ইহা ঠিক নহে—সুন্নতবিরোধী কাজ। আবার কেহ কেহ খুবই নম্রতা দেখান। কোন কিছুতেই মুরীদদিগকে সতর্ক করেন না। ইহাও শোভনীয় নহে। নম্রতা ও কঠোর উভয়টিরই প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে সমতা পয়দা হইবে।

জনৈক বুযুর্গের নিকট একটি সাপ মুরীদ হইয়াছিল। তিনি সাপকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিলেন যে, সে কাহাকেও দংশন করিতে পারিবে না। একেবারে নিরীহ দেখিয়া অন্যান্য জন্তুরা তাহাকে মারিতে ও বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পর সে বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হইল। বুযুর্গ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। সাপ বলিল, হুযুর আমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্তুরা এই সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই আমাকে বিরক্ত করিতে থাকে। বুযুর্গ বলিলেন, আমি তোমাকে শুধু দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম—ফণা তুলিতে নিষেধ করি নাই। এখন হইতে কোন জন্তু নিকটে আসিলেই ফণা তুলিয়া ফোঁস্‌ফোঁসাইয়া দাও। ইহাতে জন্তুরা পালাইয়া যাইবে। ঐদিনের পর হইতে বেচারী সাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তদ্রূপ বুযুর্গদেরও মাঝে মাঝে ফোঁস্‌ফোঁসানী দেওয়া উচিত।

মোটকথা, লোকজন বেশী না থাকায় হযরত মাওলানা এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা বলিলেন, যাহা সকলের সম্মুখে বলা যায় না। তন্মধ্যে তিনি এই

কথাটিও বলিলেন—আমরা যখন জান্নাতে যাইব, (জান্নাতে যাওয়া যেন নিশ্চিতই ছিল) এবং আমাদের নিকট হূর আসিবে, তখন বলিয়া দিব যে, বিবি ছাহেবা, যদি কোরআন তেলাওয়াৎ করিয়া শুনাইতে পার, তবে এখানে বস, নতুবা চলিয়া যাও।

মাওলানা ছাহেব দুনিয়ার অবস্থা অনুযায়ী এই কথা বলিয়াছেন। আমি ইহাকে হাল প্রবল হইয়া যাওয়ার প্রতিক্রিয়া মনে করি। আসলে জান্নাতে মারেফাত এত গভীর হইবে যে, হূরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও হক তা'আলার প্রতি মনোযোগে ত্রুটি হইবে না। উপরোক্ত কথা বলার সময় এই বিষয়টির প্রতি মাওলানা ছাহেবের লক্ষ্য ছিল না।

॥ জান্নাতীদের প্রকারভেদ ॥

জান্নাতে কামেল তত্ত্বজ্ঞানিগণ হূরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও হক তা'আলার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিবেন। আরেফ রূমী তাই বলেন :

حسن خویش از روئے خوباں اشکارا کردۂ + پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردۂ

(হুস্‌নে খেশ্‌ আয্‌রুয়ে খোবাঁ আশ্‌কারা করদায়ী
পস্ বচশ্‌মে আশেকাঁ খুদ্‌রা তামাশা করদায়ী)

অর্থাৎ, 'আপন সৌন্দর্য হূরদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব, আশেকদের দৃষ্টিতে নিজেকেই দৃশ্য বানাইয়াছেন।'

উদাহরণতঃ প্রেমাস্পদ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিল যে, অমুক সময় আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যাইবে এবং অমুক সময় আয়নার মাধ্যমে দেখিতে হইবে। হূরগণও তদ্রূপ কামেল তত্ত্বজ্ঞানীদের পক্ষে হক তা'আলার সৌন্দর্য দেখার জন্য আয়না স্বরূপ হইবে।

অতএব, জান্নাতে দুই প্রকার লোক থাকিবেন। (১) কামেল লোকগণ। তাঁহারা উভয় অবস্থাতে হক তা'আলার সৌন্দর্যই নিরীক্ষণ করিবেন। (২) কামেল নহেন—এমন ব্যক্তিগণ। তাঁহারা একমুখী হইয়া কেবল ارنی ارنی (দেখা দাও, দেখা দাও) বলিবেন। তাঁহাদের মনোযোগ অন্য কোন বস্তুর দিকে নিবদ্ধ হইবে না। কামেলদের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে "কামেল নহে" বলা হইয়াছে। নতুবা আমাদের দিকে লক্ষ্য করিলে তাঁহারা বহু অগ্রসর।

آسماں نسبت بعرش آمد فرود + لیک بس عالی ست پیش خاک تود

(আস্‌মাঁ নিস্‌বত বআর্‌শ আমদ ফরুদ + লেক বস্ আলীস্ত পেশ খাক তূদ)

অর্থাৎ, 'আরশের দিকে লক্ষ্য করিলে আকাশ খুবই নিম্নে ; কিন্তু যমীনের দিকে দেখিলে আকাশ অত্যন্ত উচ্চে।'

॥ হক তা'আলার সৌন্দর্য ॥

মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে তো খোদার এশ্‌কে মাতাল হইবেই, আমি দুনিয়াতেও এমন ব্যক্তি দেখিয়াছি—যিনি হক তা'আলার সৌন্দর্যে মাতাল হইয়া হুরদের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। আপনি হক তা'আলার সৌন্দর্যকে কি মনে করিয়াছেন? ইহা প্রদীপের আলোর ন্যায় নহে। অনেকেই ইহাকে এই রূপই মনে করে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। এইরূপ ধারণাকারীরা হক তা'আলার সৌন্দর্যের কদর করে নাই। দুনিয়াতে ঐ সৌন্দর্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম সম্ভবপর নহে।

তাই বুযুর্গগণ বলেন: مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَهُوَ هَالِكٌ وَاللّٰهُ اَجَلُّ مِنْ ذَالِكَ

অর্থাৎ, 'এক্ষণে অন্তরে যে সব নুর ও তাজাল্লী অনুভূত হয়, তাহা সমস্তই ধ্বংসশীল। হক তা'আলা এসব হইতে বহু উচ্চে।'

যাহারা অন্তরের নুর কিংবা যিক্‌রের নুরকে হক তা'আলার নুর মনে করে, উপরোক্ত বর্ণনায় তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল। অনেকেই এই ভ্রান্তিতে পতিত আছে। জনৈক সালেক (খোদার পথের পথিক) রূহের তাজাল্লী অর্থাৎ, রূহে বিকশিত জ্যোতিকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত হক তা'আলার নূর মনে করিতে থাকেন। পরে তিনি আসল ব্যাপার অবগত হইয়া তওবা করেন। মোটকথা, দুনিয়াতে হক তা'আলার সৌন্দর্যের স্বরূপ ও অবস্থা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে। আসল স্বরূপ আখেরাতেও জানা যাইবে না। তবে সেখানে সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ বিকাশ ঘটিবে। তাই সাদী বলেন:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم + وز هر چه گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم

دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر + ما همچناں در اول وصف تو مانده ایم

(আয় বরতর আয খিয়াল ও কিয়াস ও গুমান ও ওয়াহাম
ওয হরচে গুফতাআন্দ ও শানিদাইম ও খান্দাইম,
দফতর তামাম গাশ্‌ত ও বপায়াঁ রসীদ ওমর
মা হমচুনাঁ দর আওয়াল ওয়াছফে তু মান্দাইম)

অর্থাৎ, 'হে খোদা! তুমি কল্পনা, অনুমান, ধারণা খেয়াল এবং যাহা বলা হইয়াছে, যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা পড়িয়াছি—সব কিছু হইতে বহু ঊর্ধ্বে। কাগজ ফুরাইয়া গিয়াছে এবং আয়ু শেষ হইতে চলিয়াছে; কিন্তু আমরা এখনও তোমার প্রাথমিক গুণাবলীর বর্ণনায়ও ব্যর্থ রহিয়াছি' অর্থাৎ সালেকের পক্ষে প্রথমে যাহা জানা দরকার তাহাই জানিতে পারি নাই।

॥ হক তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দর্শন ॥

হাঁ, যখন বিকাশ ঘটিবে, তখন গুন্‌গুন্ করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিবেন:

بےحجا بانہ درآ از در کاشانۂ ما + کہ کسے نیست بجز درد تودرخانۂ ما

(বে-হেজাবানা দর আ আয দর কাশানায়ে মা
কেহ্ কাসে নীস্ত বজুয দরদে তু দর খানায়ে মা)

অর্থাৎ, 'আমার দ্বারে প্রকাশ্যে চলিয়া আস। কেননা, এখানে তোমার বেদনা ছাড়া আর কেহই নাই।'

ইহার কারণও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তখন সামনাসামনি দর্শন প্রার্থনা করার কারণ এই যে, তখন অন্তরে হক তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিবে না। এখন অন্তরে অন্য বস্তু অনুপ্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। অন্য বস্তুর সহিত হক তা'আলার তাজাল্লী প্রতিভাত হইতে পারে না। কারণ তাহার শান হইল :

چون سلطان عزت عالم بر کشد + جہاں سر بجیب عدم در کشد

(চুঁ সুলতান ইয্‌যতে আলম বর কাশাদ + জাহাঁ সর বজায়বে আদম দর কাশাদ)

অর্থাৎ, 'যখন বাদশাহ্ ইয্‌যতের পতাকা উড়াইয়া দেয় তখন দুনিয়া অস্তিত্বহীন হইয়া যায়।

ইহাতে বুঝা যে, প্রতিবন্ধকতা বান্দার তরফ হইতেই। হক তা'আলার তরফ হইতে কোন বেড়াজাল নাই। এই কারণেই হক তা'আলা মূসা (আঃ)কে لن ترانی অর্থাৎ, 'তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না' বলিয়াছিলেন, لن اری আমি দৃষ্টি গোচর হইব না—এইরূপ বলেন নাই। হক তা'আলা সদাসর্বদাই দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন ; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে দীদারকে বরদাশ্‌ত করার মত শক্তি নাই :

شد ہفت پردہ بر چشم ایں ہفت بردۂ چشم + بےپردہ ورنہ ما ہے چوں آفتاب دارم

(শুদ হাফ্‌ত পর্দা বর চশম ইঁ হাফ্‌ত পর্দায়ে চশম
বেপর্দা ওয়ারনা মাহে চুঁ আফতাব দারাম)

চোখের উপর সাত তবক পর্দা রহিয়াছে। এই সাত তবক পর্দা বেপর্দারই শামিল।'

দুনিয়াতে হক তা'আলাকে দেখার প্রধান উপায় হইল কোরআন শরীফের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রতাপ নিরীক্ষণ করিয়া লওয়া। এ প্রসঙ্গে কবি মখফীর কবিতা মনে পড়িয়া গেল :

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل+ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

(দর সুখন মখফী মানাম চুঁ বুয়ে গুল, দর বর্গে গুল
হর কেহ্ দীদান মায়ল দারাদ দর সুখন বীনাদ মরা)

অর্থাৎ, 'আমি কথার মধ্যে লুক্কায়িত আছি—যেমন ফুলের গন্ধ ফুলের কলিতে, যে কেহ আমাকে দেখিতে চায়, সে কথার মধ্যে আমাকে দেখুক।'

তদ্রূপ দুনিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন হক তা'আলা বলিতেছেন :

هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

যে, আমাকে দেখিতে চায়, সে কথার মধ্যে আমাকে দেখুক।'

কিছুক্ষণ পূর্বেই কোরআন পাঠ করা হইয়াছিল। তখন শ্রোতাগণ কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ ইহাকে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়া বলিলে আমি বলিব যে, এই কারী ছাহেবকেই (১) কাফিয়া (একটি কিতাব) ঠিক ঐ উচ্চারণ কণ্ঠস্বরে পড়িতে বলুন। দেখিবেন বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। অতএব, উহা যে কোরআনেরই প্রতিক্রিয়া তজ্জন্য এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের কারণেও উহাতে কিছু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়া দুই এক বারের পর বাকী থাকে না। কোরআনের মিষ্টতা এত স্থায়ী যে, যতই শুনা হউক না কেন, তৃপ্তি হইতে চায় না। কোন সুশ্রী ও কোকিল কণ্ঠীর মুখে একটি উৎকৃষ্ট গযল শুনুন। প্রথমবার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু পুনরাবৃত্তিতে মন ভরিয়া যাইবে। কেননা, ইহা মানুষের কালাম। কথক ধ্বংসশীল। সুতরাং তাহার কথার মিষ্টতাও ধ্বংসশীল। কিন্তু কোরআনের যতই পুনরাবৃত্তি করা হউক না কেন, উহাতে মন ভরে না। তবে পাঠক কুণ্ঠাহীনভাবে ও বিশুদ্ধ পড়িলেই হয়। কোরআন খোদা তা'আলার কালাম। খোদা তাআলা স্বয়ং যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি তাহার কালামের স্বাদও চিরস্থায়ী ঃ لا يخلق من كثرة الرد 'বারবার পাঠেও উহাতে প্রাচীনত্ব আসে না।'

মুতাকাল্লেমীনের মযহাব অনুযায়ী কোরআন অর্থাৎ শাব্দিক কালাম যদিও আত্মিক কালামের ন্যায় খোদার জাতী ছিফত নহে, তবুও সূর্যের সহিত কিরণের সম্পর্কের ন্যায় হক তা'আলার সত্তার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। সূর্যের মধ্যে চারিটি বিষয় মনে করিয়া লউন। প্রথমতঃ, সূর্যমণ্ডল। ইহা সূর্যের সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, সূর্যের নূরের ছিফত। ইহা সূর্যের সত্তার সহিত কায়েম রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কিরণ। চতুর্থতঃ সূর্যের আলোকে আলোকিত পৃথিবী। এখন কিরণ নূরের ছিফতের মত সূর্যের সহিত কায়েম ও সংযুক্ত নহে, আবার পৃথিবীর মত সূর্য হইতে একেবারে পৃথকও নহে।

তেমনি শাব্দিক কালাম যাতী ছিফতের ন্যায় হক তা'আলার সত্তার সহিত কায়েম নহে, আবার অন্যান্য অনিত্য বস্তুসমূহের ন্যায় দূর সম্পর্কীয়ও নহে, বরং ইহা অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অনিত্য বস্তু অপেক্ষা হক তা'আলার সত্তার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই গভীর সম্পর্কের কারণেই ইহাকে কালামুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র কালাম বল হয়। অন্যান্য অনিত্য কালামকে কালামুল্লাহ্ বলা যায় না। এই কারণেই

(১) ওয়ায আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সভায় কতিপয় কারী ছাহেবান কোরআন তেলাওয়াৎ করিয়াছিলেন।

মুতাকাল্লেমীনের মধ্য হইতে কেহ কেহ এই শাব্দিক কালামকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—যদিও ইহাও অনিত্য হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এই আলোচনাটি অত্যধিক সূক্ষ্ম। বিনা প্রয়োজনে ইহা লইয়া মাথা ঘামানো জায়েয নহে। উভয় মতানুযায়ীই আমার বলার উদ্দেশ্য হাছিল হয়। অর্থাৎ, কোরআনের শব্দসমূহের এমন শান নিহিত আছে যে, বারবার পুনরাবৃত্তি করিলেও ইহাতে প্রাচীনত্ব আসে না।

অতএব, কোরআনের শব্দেই যখন মন বিষণ্ণ হয় না, তখন উহার অর্থে কিরূপে তৃপ্তি হইয়া যাইবে এবং কোরআনের উপর আমল করিলে যে নূর হাছিল হয়, তাঁহাতে কিরূপে অন্তর তৃপ্তি হইতে পারিবে? খোদার কসম, যাঁহারা কোরআনের অর্থ ও কোরআনের আমল লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে। কোনখানেই তাঁহাদের শান্তি নাই; কিন্তু মজার বিষয় এই যে, এই অশান্তির মধ্যেও তাঁহারা এত শান্তিতে থাকেন যে, সপ্ত দেশের রাজত্বও উহার তুলনায় নিতান্তই হেয়। মোটকথা, কোরআনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহার বিষয়বস্তু বর্ণনায় এবং খোদা তা'আলার আহ্‌কাম সম্বন্ধে আলোচনায় কিছুতেই মনে তৃপ্তি ও বিরক্তি আসিতে পারে না। অতএব, উদ্ধৃত আয়াতের আলোচ্য বিষয়টি পূর্বে শুনা হইয়া থাকিলেও উহার পুনরালোচনা নিষ্ফল নহে; বরং মিছরি বারবার খাইলেও যেমন স্বাদ পাওয়া যায়, এই পুনরালোচনায়ও তেমনি স্বাদ রহিয়াছে।

॥ আয়াতের তফ্‌সীর ॥

তাছাড়া বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেই যদি তাহা ত্যাগ করার যোগ্য হইয়া পড়ে, তবে আপনার এই ধারণাটিও তো পুরাতন। আপনি ইহাকে ত্যাগ করেন না কেন? আমি একবার কনৌজে যাইয়া জানিতে পারিলাম যে, তথাকার এক মহল্লার অধিবাসীরা মহল্লার নাম বদলাইয়া দিয়াছে। কারণ, আগের নাম দ্বারা মহল্লাবাসীদের জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিত। উহা ঢাকিবার জন্য মহল্লার নাম পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। আমি ওয়াযে এই বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পুনর্বার ঐ স্থানে ওয়ায করিতে যাইয়া ঐ বিষয়ে আবার আলোচনা করিলাম। ইহাতে মহল্লাবাসীরা বলাবলি করিতে থাকে যে, তিনি তো বেশ আমাদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছেন। আগের বারও ওয়াযে আমাদিগকে মন্দ বলিয়াছেন—এবারও তাহাই করিলেন। এই বলাবলির উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলিল, তিনি মন্দ বলিলেন কোথায়? তোমরাই তো বলাইয়াছ। তোমরা আগেই নিজেদের অবস্থা শোধরাইয়া লইলে দ্বিতীয় বার বলার কোন প্রয়োজন হইত না। আপনিও তেমনি আমাকে বলাইতেছেন। প্রথম বারের আলোচনা শুনিয়াই যদি আপনি সংশোধন হইয়া যাইতেন এবং দুনিয়ার

পিছু ছাড়িয়া দিতেন, তবে আমাকে দ্বিতীয়বার এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে হইত না।

এপর্যন্ত ভূমিকা বর্ণিত হইল। এখন আমি আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছি। যে আয়াতখানি আমি তেলাওয়াৎ করিয়াছি, ঘটনাক্রমে সভায় আমার আগমনের পর কারী ছাহেব ইহাই পাঠ করিতেছিলেন। তখনই আমার ইচ্ছা হয় যে, আজ এই আয়াত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হক তা'আলা যেন কার্যতঃ এই আয়াতের বর্ণনাকেই অগ্রাধিকার দান করিলেন। এই আয়াতে হক তা'আলা নিন্দনীয় দুনিয়ার পিছনে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহ দান করিয়াছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ যোজনা এমন চমৎকার হইয়াছে যে, অল্প কয়েকটি শব্দের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই খোদাতা'আলা ব্যতীত অন্য কেহ এমনটি করিতে পারিবে না। এই আয়াতের পূর্বে দুনিয়ার অসারতা একটি উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

'আপনি তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন। উহার দ্বারা দৃষ্টান্ত যেমন পানি, আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি। অতঃপর উহার দ্বারা পৃথিবীর লতাপাতা ঘন সবুজ হয়। অনন্তর উহা আবার খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় বাতাসে উড়িতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।' এর পর اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াতখানি উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, 'মাল ও আওলাদ পার্থিব জীবনের শোভা সাজসজ্জা।' সকলেই জানে যে, প্রত্যেক বস্তুর শোভা উহার আনুষঙ্গিক হইয়া থাকে। সুতরাং উহা যখন আনুষঙ্গিক হইল, তখন উহার মর্তবা আসল বস্তু হইতে কমই হইবে। আসল বস্তু অর্থাৎ দুনিয়া যে অসার, তাহা পূর্বের আয়াতেই বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই উহার আনুষঙ্গিক বিষয় অর্থাৎ, শোভা যে কি পরিমাণ অসার হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। একটিমাত্র 'যীনত' (শোভা) শব্দ দ্বারাই মাল ও আওলাদের গুরুত্বহীনতা এত গভীরভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কোরআনের চমৎকার শব্দালঙ্কার বটে।

এছাড়া আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। তাহা এই যে, অধিকাংশ সাজসজ্জা ও শোভার বস্তু অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। অতএব, হক তা'আলা "যীনত" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাল আওলাদ অসার ও অপ্রয়োজনীয়। একমাত্র শোভা ব্যতীত ইহারা আর কিছুই নহে। আয়াতের

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আখেরাত ত্যাগ করিয়া যে মাল ও আওলাদের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ এবং উহাকে অভীষ্ট বানাইয়া লইয়াছ, উহা অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বৈ কিছুই নহে। কেননা, মালের উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজন মিটানো এবং প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্য হইল আপন অস্তিত্ব রক্ষা করা। অতএব, আসল উদ্দেশ্যের জন্য মাল হইল মাধ্যমের মাধ্যম। এহেন মাধ্যমকে অভীষ্ট বানাইয়া লওয়া এবং দিবারাত্র উহাতেই মগ্ন হইয়া থাকা নির্বুদ্ধিতা নহে তো কি? আপন অস্তিত্ব রক্ষা করা অভীষ্ট ঠিকই; কিন্তু উহাও অসার। কেননা, উহার স্থায়িত্ব স্বল্পকালের জন্য। ইহা ধর্তব্য নহে। মোটকথা, স্বয়ং মাল অভীষ্ট বস্তু হওয়ার যোগ্য নহে। আওলাদ মাল হইতে আরও বেশী অপ্রয়োজনীয়। কেননা, ইহা আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও নহে; বরং জাতির স্থায়িত্বের জন্য অভীষ্ট বস্তু। শুধু আপনার সন্তানাদি দ্বারাই দুনিয়াতে মানবজাতি স্থায়ী হইবে—ইহারই বা কি প্রয়োজন? যদি আমার কোন সন্তান না জন্মে এবং আপনার দুই জন জন্মে, তবে তদ্দ্বারাও মানবজাতি স্থায়ী হইতে পারে। তাছাড়া মানবজাতির স্থায়িত্বের জন্য আপনার চিন্তার কি প্রয়োজন? হক তা'আলা যতদিন মানবজাতি দ্বারা দুনিয়া আবাদ রাখিতে চাহিবেন, ততদিন তিনিই উহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এ সম্পর্কে আপনি রায় দিবার কে যে, আপনার জাতি স্থায়ী থাকিতেই হইবে এবং আপনার সন্তানাদি দ্বারাই থাকিতে হইবে?

॥ পর্দা ও শিক্ষা ॥

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করা প্রয়োজন। তাহা এই যে, আয়াতে হক তা'আলা بنون অর্থাৎ, পুত্র-সন্তানদিগকে 'পার্থিব জীবনের শোভা' আখ্যা দিয়াছেন, بنات অর্থাৎ, মেয়ে-সন্তানদিগকে দেন নাই। ইহার এক কারণ এই যে, মেয়েদিগকে তোমরা নিজেরাই অনর্থক মনে করিয়া রাখিয়াছ। পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই বেশী আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে মেয়ে-সন্তানদিগকে বিপদ স্বরূপ মনে করা হয়। এমতাবস্থায় তোমাদের মতে মেয়েরা কি ছাই দুনিয়ার শোভা হইবে?

মেয়েদের উল্লেখ না করার আরেকটি কারণ এই যে, হক তা'আলা এতদ্দ্বারা বলিয়া দিলেন যে, মেয়েরা দুনিয়ার শোভাও নহে; বরং শুধু ঘরের শোভা। তাহারাও দুনিয়ার শোভা হইলে এ প্রসঙ্গে হক তা'আলা অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন। অতএব, শুধু ছেলেদিগকে দুনিয়ার শোভা বলায় এবং মেয়েদের উল্লেখ না করায় বুঝা গেল যে, মেয়েরা দুনিয়ার শোভা নহে। কেননা, সর্বসাধারণের মধ্যে এমন জিনিসকেই দুনিয়ার শোভা বলা হইয়া থাকে যাহা প্রকাশ্য স্থানের শোভা বর্ধন করে। মেয়েরা এমন শোভা নহে যে, তোমরা তাহাদিগকে সঙ্গে

লইয়া ঘুরাফিরা করিতে পার এবং সকলেই দেখিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির অতজন মেয়ে, তাহারা এমন এমন বেশভুষায় সজ্জিত ; বরং মেয়েরা শুধু ঘরের শোভা।

এতদ্বারা আয়াতটিতে পর্দা করানোর স্বপক্ষে আভিধানিক সমর্থন পাওয়া যায়। উর্দুভাষায় মেয়েদিগকে আওরত বলা হয়। অভিধানে ইহার অর্থ গোপন করার বস্তু। অতএব, আওরতকে পর্দা করাইও না বলা, খাওয়ার বস্তু খাইও না এবং পরিধানের বস্তু পরিও না বলার ন্যায় হইবে। এরূপ উক্তি যে নিছক অর্থহীন, তাহা অপ্রকাশ্য নহে। সুতরাং "মেয়েদিগকে পর্দা করাইও না" উক্তিটিও অর্থহীন, না হইয়া পারে না। মেয়েদিগকে আওরত বলাই স্বয়ং দলীল যে, তাহাদিগকে পর্দায় রাখিতে হইবে।

জনৈক প্রগতিশীল ব্যক্তি বলিত যে, পর্দা প্রথার ফলেই মহিলাদের শিক্ষাগত উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। আমি বলিলাম, জী হাঁ, এই কারণেই তো নীচ জাতির মেয়েরা—যাহারা পর্দা করে না—খুব শিক্ষিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। আসলে শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা হওয়ার ব্যাপারে পর্দা অথবা বে-পর্দা হওয়ার কোন কার্যকারিতা নাই। এ ব্যাপারে মনোযোগই হইল আসল কার্যকরী। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কোন জাতির মনোযোগ থাকিলে তাহারা বেপর্দা রাখিয়াও মেয়েদিগকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারে। মনোযোগ না থাকিলে বেপর্দা রাখিলেও কিছু হইতে পারে না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে পর্দায় থাকিয়া বেশী শিক্ষা লাভ হইতে পারে। কেননা, শিক্ষার জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন। ইহা নির্জন কক্ষেই বেশী লাভ হয়। এই কারণে পুরুষরাও পুস্তক পাঠের জন্য নির্জন কক্ষ অনুসন্ধান করে। ছাত্রগণ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছে। অতএব, পর্দায় থাকা মহিলাদের শিক্ষার পক্ষে সহায়—প্রতিবন্ধক নহে। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির কি হইল জানি না, তাহারা পর্দাকে শিক্ষার প্রতিবন্ধক মনে করে!

হাঁ, ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষার বেলায় এই কথা খাটে। কেননা, ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য দেশ ভ্রমণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা মহিলাদের যোগ্য নহে। কারণ মহিলারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্না ও অসহিষ্ণু। ফলে দেশ ভ্রমণে তাহাদের অভিজ্ঞতায় সত্যিকার অর্থাৎ চারিত্রিক উন্নতি হইবে না ; বরং অবাধ ঘুরাফিরার অভ্যাস ও অনর্থ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণেই শরীয়ত মহিলাদের হাতে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। কেননা, তাহারা এত অসহিষ্ণু যে সামান্য কারণেই কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। পুরুষরা বহু বছর পর হয়তো এক বার খুব গুরুতর কারণে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে। তাহাও বেশী সংখ্যক পুরুষ নহে ; বরং হাজারে একজন। অধিকাংশ পুরুষ মহিলাদের অসংযত ব্যবহার নীরবে সহ্য করিয়া যায়। মহিলাদের হাতে তালাকের ক্ষমতা থাকিলে তাহারা প্রতি মাসে

স্বামীকে তালাক দিয়া নূতন বিবাহ করিত। অতএব, স্বীয় বাসস্থানে ঘুরাফিরা করাই মহিলাদের ভ্রমণের পক্ষে যথেষ্ট। যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাহাদের জন্য জরূরী, তাহা ঘরে বসিয়াই তাহারা অর্জন করিতে পারে।

॥ আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক রাখার প্রতিক্রিয়া ॥

বরং আমি বলি, হাকীকতের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে পুরুষদের পক্ষেও দেশ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই। পর্যটন ও তামাশা দেখা লক্ষ্য হইলে, তাহাও আপনার নিজের মধ্যে বিদ্যমান আছে। অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখিয়া লও, তোমার নিজের মধ্যে এমন তামাশা দৃষ্টিগোচর হইবে যে, জাগতিক পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান দেখার প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে ঃ

ستم ست اگر هوست کشد که بسیر سر و سمن در آ
تو ز غنچه کم ندمیدهٔ در دل کشا بچمن در آ
چوں کوئے دوست هست بصحرا چـه حاجت ست
خلوت گزیده را بـه تماشا چه حاجت ست

(সেতাম আস্ত আগর হওস্ত কাশাদ কেহ্ বসায়র সরও সমন দর আ
তু যে গুঞ্চায়ে কম নদমীদায়ে দর দিলকুশা বচমন দর আ
চূঁ কূয়ে দুস্ত হাস্ত বছেহ্‌রা চেহ্ হাজত আস্ত
খেলওয়াত গুযীদারা বতামাশা চেহ্ হাজত আস্ত।)

অর্থাৎ, 'তোমার প্রবৃত্তি যদি তোমাকে বাগ-বাগিচার ভ্রমণে লইয়া যায়, তবে তাহা যুলুম বটে। কেননা তোমার মধ্যে অনেক ফুলের কলি উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি অন্তর খুলিয়া তাহা নিরীক্ষণ কর এবং আপন বাগিচায় প্রবেশ কর। তুমি যখন প্রেমাস্পদের গলিতেই আছ, তখন ময়দানে ভ্রমণ করার তোমার কি প্রয়োজন? নির্জনবাসীর পক্ষে তামাশা দেখার কোন প্রয়োজন আছে কি?'

যে ব্যক্তি দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার চোখে কোনকিছু দৃষ্টিগোচর হওয়ারও প্রয়োজন নাই। সে অন্ধ অবস্থায়ও প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে। দৃষ্টিমান হইতে অন্ধ হওয়ার পরও নিশ্চিত থাকিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। তবে হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ)কে কিছুদিন পূর্বেই সকলে দেখিয়াছে। মাওলানা অন্ধ অবস্থায়ও দৃষ্টিমান অবস্থার ন্যায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি কোন নবী ছিলেন না; বরং একজন উম্মত ছিলেন। তিনি যে দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আপনিও লাভ করিতে পারেন। উহা হইল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক। ইহা এমন একটি দৌলত যে, ইহা লাভ হইলে পর্যটন ও তামাশা দেখার প্রয়োজন থাকে না। ইহাতে কেহ এইরূপ মনে করিবেন না যে, আমি মাওলানার

কারামত ছিল বলিয়া দাবী করিতেছি। তিনি অন্ধ অবস্থায়ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ন্যায় সবকিছুই দেখিতে পাইতেন। ফলে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—আমি তাঁহার এইরূপ কোন কারামত দাবী করিতেছি না। তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষদের নিকট কাশ্‌ফ ও কারামতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। মাওলানার নিশ্চিন্ত থাকার একমাত্র কারণ ছিল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক। দুনিয়ার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এই কারণে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় তিনি কোনরূপ চিন্তিত ছিলেন না; বরং ইহাতে যে তিনি আরও আনন্দিত হইয়া থাকিবেন, তাহাও আশ্চর্য নহে। কেননা, পূর্বে খোদা ব্যতীত অন্য বস্তুর উপরও দৃষ্টি পতিত হইত, কিন্তু অন্ধ হওয়ার পর প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর দৃষ্টি পতিত হয় না।

আফ্‌সোস! এমন মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও মূর্খরা সন্দেহ পোষণ করিত যে, তাঁহারা দেশে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের পিছনে কঠোর প্রহরা মোতায়েন করা উচিত। হায়, দুনিয়ার সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্কই নাই; তাঁহারা গোলযোগ খাড়া করিবেন—এ কেমন ধারণা? দুনিয়া যাহাদের লক্ষ্য, গোলযোগ সৃষ্টি করা তাহাদেরই কাজ। পক্ষান্তরে এইসব মনীষীদের অবস্থা এই যে, কোনরূপ গোলযোগ ব্যতিরেকেই কোন দেশ বা রাজত্ব লাভ হইয়া গেলে, তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতেও অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। এমন ব্যক্তিরা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দেশ অধিকার করিবেন—উদ্ভট ধারণা বটে!

সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল কাদের (রঃ)-এর নিকট সাঞ্জার দেশের বাদশাহ্‌র একটি পত্র আসিয়াছিল। উহাতে লিখিত ছিল, আমি আপনাকে আস্তানার ব্যয় বহনের জন্য নীমরোজ রাজ্যের কিছু অংশ দান করিতে চাই। তিনি রাজত্বের অভিলাষী হইলে তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি বাদশাহের নামে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন:

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد + در دل اگر بود هوس ملک سنجرم

(চুঁচত্‌রে সাঞ্জারী রুখ্‌ বখত্‌মে সিয়াহ্‌ বাদ
দর দিল আগর বুয়াদ হওস মুল্‌কে সাঞ্জারাম)

'অর্থাৎ 'আমার অন্তরে তোমার দেশের প্রতি এতটুকু লোভও থাকিয়া থাকিলে খোদা যেন আমার ভাগ্যকে তোমার পতাকার ন্যায় কাল করিয়া দেন।' তখনকার যুগে সুলতানগণ কাল রঙ্গের পতাকা ব্যবহার করিতেন। এরপর উপরোক্ত উৎসুক্য-হীনতার কারণ বর্ণনা করেন:

زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب + من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

(যাঁগাহ্ কেহ্ ইয়াফ্‌তাম খবর আয্‌ মুল্‌কে নীমশব
মান মুল্‌কে নীমরোয বএক জাও নমী খারাম)

অর্থাৎ, 'যেদিন হইতে আমি অর্ধ রাত্রের বাদশাহী লাভ করিয়াছি, তখন হইতে আমি একটি সামান্য যবের পরিবর্তেও নীমরোজ রাজ্য ক্রয় করিতে চাই না। (এই সময় সভার এক পার্শ্ব হইতে আওয়ায আসিল যে, হুযূর, এদিকেও মুখ করুন। এদিকে আওয়ায পৌঁছিতেছে না। তিনি উত্তরে বলিলেন, তবে অন্য একজন বক্তা আনিয়া লও। সে ওদিককার লোকদিগকেও শুনাইতে পারিবে। আমি কাহারও চাকর নই যে, তুমি ঘুরিতে বলিলেই ঘুরিয়া যাইব। যখন মনে চাহিবে, তখন ওদিকেও মুখ করিব। কেহ আওয়ায না পাইলে এবং তজ্জন্য অসহ্য মনে হইলে সে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক।) (১)

খোদার কসম, যে ব্যক্তি এই দৌলত প্রাপ্ত হয়, রাজত্বের প্রতি তাহার সামান্যও লোভ থাকিতে পারে না ; বরং সে উহার নাম শুনিলেই অস্থিরতা বোধ করে। কেননা, ইহাতে খোদার সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা পয়দা হয়। আজকাল মানুষ ছাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে। উদাহরণতঃ কেহ বলে, হযরত আলী (রাঃ)কে প্রথম খলিফা মনোনীত করা উচিত ছিল। আমি কসম করিয়া বলিতেছি—হযরত আলী (রাঃ) আন্তরিক ভাবে শায়খাইন (অর্থাৎ, হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। কেননা, ছাহাবীদের খেলাফত অযোধ্যার বাদশাহ্দের বাদশাহীর ন্যায় ছিল না যে, দিবা-রাত্র কেবল আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদেই ডুবিয়া থাকিবেন।

তাঁহাদের বাদশাহী ছিল এইরূপ : এক দিন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক গরম বাতাস বহিতেছিল। তখন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) জঙ্গলের দিকে গমন করিতেছিলেন। হযরত ওছমান (রাঃ) তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন যে, তিনি আমীরুল মোমিনীন। তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্তী হইলে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, আমীরুল মোমিনীন! এত তীব্র উত্তাপ ও গরম বাতাসের মধ্যে কোথায় গমন করিতেছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, বায়তুল মালের একটি উট হারাইয়া গিয়াছে, উহার খোঁজে যাইতেছি। হযরত ওছমান (রাঃ) আরয করিলেন, কোন চাকর পাঠাইয়া দিলেও তো হইত। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন আমিই জিজ্ঞাসিত হইব, চাকরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। হযরত ওছমান (রাঃ) আরও বলিলেন, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যান, ইতিমধ্যে উত্তাপও কমিয়া যাইবে। খলিফা উত্তরে

---

(১) তখন ছাইয়্যেদুনা আবদুল কাদের (রহঃ)-এর কাহিনীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অমুখাপেক্ষিতার ভাব প্রবল ছিল। তাছাড়া অনুরোধের স্বরটিও অসমীচীন ছিল। সম্ভবতঃ এই সব কারণেই এবম্বিধ উত্তর দিয়াছেন। নতুবা হযরত অধিকাংশ সময় এই ধরণের অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দান করিয়া থাকেন।

বলিলেন : نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ‘জাহান্নামের অগ্নি আরও বেশী উত্তপ্ত হইবে।’ এই বলিয়া তিনি প্রখর রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যেই দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইহা ছিল তাঁহাদের বাদশাহী।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। তিনি খোৎবায় শ্রোতাদিগকে বলিলেন : اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا ‘তোমরা আমার কথা শোন ও আনুগত্য কর।’ সভাস্থল হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল : لَا نَسْمَعُ وَلَا نُطِيْعُ ‘আমরা আপনার কথা শুনিবও না এবং আনুগত্যও করিব না।’ তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, আপনার পরিধানে দুইটি কাপড় দেখা যাইতেছে। গনীমতের মাল বণ্টন হওয়ায় প্রত্যেকে একটি করিয়া কাপড় পাইয়াছে। আপনি দুইটি কাপড় গ্রহণ করিলেন কিরূপে ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভাই, তুমি সত্যই বলিতেছ, (অতঃপর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,) আবদুল্লাহ্‌, তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দাও। ইহাতে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-ওমর দাঁড়াইয়া বলিলেন, অদ্য পরিয়া নামায পড়াইবার মত কোন কাপড় আমীরুল মুমিনীনের নিকট ছিল না। এই কারণে আমি আমার অংশের কাপড়টি তাঁহাকে ধার দিয়াছি। এইভাবে তাঁহার গায়ে দুইটি কাপড় দেখা যাইতেছে। একটি কাপড়কে লুঙ্গী হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরটিকে চাদর হিসাবে পরিয়াছেন। এই উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, খোদা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন। এখন আপনি খোৎবা পাঠ করুন। আমরা শুনিব ও আনুগত্য করিব।

॥ খেলাফতের স্বরূপ ॥

ইহাই ছিল ছাহাবীদের রাজত্ব। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কার্যের সমালোচনা করার জন্য জনগণের প্রতিটি ব্যক্তি উন্মুখ হইয়া থাকিত। এমতাবস্থায় খেলাফত কি কোন আরাম-আয়েশের বিষয় ছিল যে, ছাহাবিগণ উহা কামনা করিবেন, কখনই নহে। খোদার কসম, এরূপ খেলাফতের ন্যায় বিপজ্জনক বিষয় আর কিছুই ছিল না। ইহা না পাওয়ায় হযরত আলী (রাঃ) দুঃখিত হইতে পারিতেন কি ? কিছুতেই নহে।

তাছাড়া, খেলাফত আরাম-আয়েশের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সকলের পক্ষেই তাহা কাম্য নহে। যাহাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি লোভ ও গুরুত্ব আছে, তাহারাই খেলাফত কামনা করিতে পারে। নাউযুবিল্লাহ্‌, বিতর্ককারীগণ হযরত আলী (রাঃ)কে দুনিয়াদার এবং দুনিয়া অন্বেষণকারী মনে করিয়া লইয়াছে। যেন তিনি উহা না পাওয়ায় দুঃখিত হইয়াছেন। তাহাদের এরূপ ধারণা থাকিলে তাহা তাহাদের জন্যই মোবারক হউক। আমরা মনে করি যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর

দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি উহার জন্য বিন্দুমাত্রও লালায়িত ছিলেন না। কেননা, তিনি খোদার সহিত সম্পর্কের দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দৌলতের বিশেষত্ব এই যে :

آں کسں کہ ترا شناخت جاں راچہ کند + فرزند وعیال وخانماں را چہ کند

(আঁকাস কেহ্‌ তোরা শেনাখত জাঁরা চেহ্‌কুনাদ + ফরযন্দ ও আয়াল ও খানমারা চেহ্‌কুনাদ)

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াছে, সে প্রাণ দ্বারা কি করিবে আর সন্তান-সন্ততি ও বাড়ীঘর দিয়াই বা কি করিবে ?'

এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে দেরীতে খেলাফত পাওয়াই কি এবং একেবারে না পাওয়াই বা কি অর্থ রাখে ? তিনি কিছুতেই তজ্জন্য দুঃখিত হইতে পারিতেন না ; বরং এজন্য তিনি আনন্দিতই হইতেন। অতএব, যে বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) নিজে সন্তুষ্ট হন, উহাতে আপনার দুঃখ প্রকাশ করার কি অধিকার আছে ? ইহাকেই বলে : "مدعی سست گواہ چست" "বাদী নীরব, সাক্ষী সরব" যেমন হাতিয়ারে ধার নাই হাতলে বেজায় ধার।

এই দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা প্রকাশ করিয়াই হক তা'আলা বলিতেছেন, মাল ও আওলাদ পার্থিব জীবনের শোভা বৈ কিছুই নহে। ইহাদিগকে শোভা বলার আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব মনে পড়িয়াছে। তাহা এই যে, শোভা ও সাজসজ্জা اعراض -এর (অস্বতন্ত্র বস্তুসমূহের) অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে আয়াতে বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার جواهر (স্বতন্ত্র বস্তুসমূহ)ও আসলে অস্বতন্ত্র বস্তু। যদিও প্রকাশ্যতঃ তাহা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ধ্বংসশীল হওয়ার কারণে আপন সত্তায় উহারা اعراض -এর ন্যায় অস্বতন্ত্র, ইহার বিপরীতে আখেরাতের অস্বতন্ত্র বস্তুও স্বতন্ত্র বস্তু হইবে। কেননা, ঐগুলি হইল باقيات صالحات অর্থাৎ, চিরস্থায়ী নেক আ'মল। এখন মনে এই কয়টি সূক্ষ্মতত্ত্বই ছিল। গভীরভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যাইবে। উহার কোন শেষ নাই।

॥ চিরস্থায়ী নেক আ'মল ॥

এখন আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটি বর্ণনা করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"স্থায়ী নেক আ'মলসমূহ খোদার নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম"

কেননা, মাদ্রাসার জলসায় এই ওয়ায হইতেছে। আর মাদ্রাসাও চিরস্থায়ী আ'মলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হকতা'আলা বলেন, সওয়াব ও আশার দিক দিয়া স্থায়ী বস্তুসমূহ অর্থাৎ, নেকআ'মল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বেশী উত্তম। এখানে

হক তা'আলা اعمال শব্দটি উহ্য রাখিয়াছেন। কেননা, উত্তম হওয়া নির্ভর করে স্থায়িত্বের উপর তাহা বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য যদিও আমলের মাধ্যমে এই স্থায়িত্ব প্রকাশ পাইবে। সুতরাং এখানে اعمال শব্দটি উল্লেখ করিলে باقيات শব্দটি উহার صفت হইয়া تابع অর্থাৎ, গৌণ-বিষয়ে পরিণত হইয়া যাইত। ফলে আসল উদ্দেশ্য (অর্থাৎ স্থায়িত্ববোধক অর্থ) সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হইত না।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি ছাত্রসুলভ সূক্ষ্মতত্ত্ব মনে রহিয়াছে। সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণনা করিতেছি। প্রথমতঃ, এখানে হক তা'আলা মন্দ আমল উল্লেখ করেন নাই। অথচ উহাও স্থায়ী আ'মলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নেক আ'মলের প্রতিদানে যেরূপ জান্নাত পাওয়া যাইবে এবং তাহা চিরস্থায়ী, তদ্রূপ মন্দ আমলের শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে যাইতে হইবে এবং ইহাও চিরস্থায়ী। অতএব, এখানে আ'মলের স্থায়িত্ব বর্ণনা করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন মন্দ আ'মলও উল্লেখ করা উচিত ছিল।

ইহার উত্তর এই যে, মন্দ আ'মল সবগুলিই স্থায়ী নহে। কোন কোন মন্দ আ'মলের শাস্তি স্থায়ী নহে এবং কোনটির শাস্তি যদিও স্থায়ী, যেমন কুফর ও শিরক। কিন্তু এই শাস্তি প্রাপ্তগণের অবস্থা এই হইবে لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى 'জাহান্নামে তাহারা মরিবেও না এবং জীবিতও থাকিবে না।' অতএব, যে জীবন সম্বন্ধে لا يحيى 'জীবিত নহে' বলা যায়, উহাকে স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লওয়ার যোগ্য নহে। কেননা, এই স্থায়িত্ব ধ্বংস সদৃশ্য।

তাছাড়া, باقيات صالحات-এর স্থায়িত্ব শুধু আভিধানিক দিক দিয়া নহে; বরং ইহা স্থায়ী সত্তা অর্থাৎ, আল্লাহ্র নিকট পৌঁছাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকে باقيات صالحات বলা হইয়াছে। একমাত্র নেক আ'মলই আল্লাহ্র সহিত এই সম্পর্ক স্থাপন করিতেপারে, মন্দ আ'মল নহে; বরং মন্দ আ'মল আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কের গোড়া আরও কাটিয়া দেয়। এই কারণে নেক আ'মলই স্থায়ী বলার যোগ্য। অতএব, صالحات শব্দটি শুধু অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখিত হইয়াছে। নতুবা শুধু باقيات শব্দটিই নেক আ'মল বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট। আমি বলিয়াছি যে, হক তা'আলার সহিত সম্পর্কের কারণেই নেক আমল স্থায়ী। এক তফসীর অনুযায়ী একখানি আয়াতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। كل شيء هالك الا وجهه এখানে وجهه শব্দের তফসীর ذاته করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। অপর এক তফসীরে وجهه শব্দের অর্থ ما كان لاجله করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র জন্য সে সব আ'মল করা হয়, তাহা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময়ও কি নেক আ'মল ধ্বংস হইবে না?

ইহার উত্তর এই যে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ আলেমদের মতে নেক আ'মলসমূহ কিছুক্ষণের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তবে উহা এত সামান্য সময় হইবে যে, সাধারণতঃ উহা

স্থায়ী বলিয়াই গণ্য। কেননা, সাধারণ নীতি অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য বিলুপ্ত হওয়া ধর্তব্য নহে।

উদাহরণতঃ বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত অনবরত পথ চলিয়াছে। আসলে এই ব্যক্তি প্রস্রাবের জন্য রাস্তায় কোথাও কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া থাকিলে কেহ তজ্জন্য আপত্তি করিয়া বলে না যে, সে তো পথিমধ্যে পাঁচ মিনিট বিরতিও দিয়াছে।

আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। তাহা এই যে, হক তা'আলা الباقيات الصالحة বলার পরিবর্তে الباقيات الصالحات বলিয়াছেন। এতদ্বারা তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি নেক আ'মলই স্বতন্ত্রভাবে নেকের যোগ্য। এইজন্য صالح (নেক) শব্দটিও বহুবচন ব্যবহার করিয়া এদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নেকের সমষ্টি নেকের যোগ্য হয় তাহা নহে। এই আলোচনায় তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল যাহারা কোন কোন নেক আমলকে নিকৃষ্ট মনে করে।

॥ আমলের গুরুত্ব ॥

কোনও নেক আমলকে নিকৃষ্ট মনে করা মারাত্মক ভুল; বরং প্রত্যেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে—জনৈকা বেশ্যা একটি কুকুরকে দারুন পিপাসার সময় পানি পান করাইয়াছিল। এই আমলের কারণেই তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন আমলকে নিকৃষ্ট মনে করা যাইবে কিরূপে? কোন্ আমলটি হক তা'আলার পছন্দ হইয়া যায়, তাহা জানা যায় না।

تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد 'প্রেমাস্পদ কাহাকে চায় এবং তাহার ঝোঁক কোন্ দিকে জানা যায় না। এখান হইতে সালেক অর্থাৎ খোদার পথের পথিকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আহ্‌লে যাহের অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকগণ আপন আমলকে কখনও নিকৃষ্ট মনে করে না; বরং তাহারা নিজেদের প্রত্যেকটি আমলকে এতই বড় মনে করে যে, উহার মাত্রা আরও হ্রাস করার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু খোদার পথের পথিকগণ নিজ সত্তাকে ফানা করিয়া দেয়। এই কারণে তাঁহারা নিজকে হেয় এবং আপন আমলসমূহকে যারপরনাই নগণ্য ও অস্তিত্বহীন মনে করে। ইহাতে মাঝে মাঝে নম্রতার সহিত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা এই উভয় বিষয় একত্রে লাভ করার উপায় এই যে, আপন আমলকে এই হিসাবে খুবই হেয় মনে কর যে, ইহা তুমি করিয়াছ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন এই হিসাবে উহাকে খুব গুরুত্ব দাও। সারকথা এই যে, এইরূপ মনে কর, আমি নিজে যারপরনাই নালায়েক ও কোন কিছুর যোগ্য নহি; কিন্তু হক তা'আলা আপন কৃপায় আমাকে এই সব দৌলত দান করিয়াছেন। এইরূপ ভাবিলে নম্রতা

ও কৃতজ্ঞতা উভয়টিই হইবে। অতএব, আপন আমলকে সব দিক দিয়া এত ঘৃণিত মনে করা উচিত নয় যে, উহাতে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

মোহাম্মদ শাহ্ ছাহেব ছিলেন এলাহাবাদের সীমান্ত প্রদেশের জনৈক বুযুর্গ। হাফেয আবদুর রহমান ছাহেব বগড়ভী বর্ণনা করেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? সঙ্গী বলিল, তিনি একাধারে হাফেয ও হাজী। ইহাতে হাফেয ছাহেব নম্রতা প্রকাশার্থে বলিয়া ফেলিলেন জী না—আমি তো কিছুই নহি। ইহাতে মোহাম্মদ শাহ্ তাহার প্রতি ক্ষেপিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা, তুমি কি চাও যে, হক তা'আলা তোমার নিকট হইতে হেফ্যের দৌলত ছিনিয়া লউন এবং তোমার হজ্জ বাতিল করিয়া দিন? ইহাতে হাফেয ছাহেব নিরুত্তর হইয়া গেলেন। এরপর কখনও হাফেয ছাহেব তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিতেন, আস হে নাশোক্র, আস হে নাশোক্র!

বন্ধুগণ, ইহারই নাম নম্রতা হইলে জানি না আপনারা নিজদিগকে কি বানাইয়া ফেলিবেন। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ রহিয়াছে। নিজকে মুসলমান বলিলে ইহাতে কামালিয়ত প্রকাশ পায়। মানুষ বলিলেও ইহাতে কামালিয়ত আছে। মেথর, চামার বলিলে ইহাতেও কামালিয়ত আছে। কেননা, তাহারাও তো মানুষ--জন্তু-জানোয়ার হইতে উত্তম। তাছাড়া মেথর ও চামার এমন গুণী যে, আজ তাহারা কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিলে সমস্ত জগদ্বাসীই অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বড়লোকরাও তাহাদের খোশামোদ আরম্ভ করিয়া দিবে।

থানাভবনের জনৈক আলেম তাঁহার কবি শিষ্যকে রাগাইবার জন্য বলিতেন, দুনিয়াতে প্রত্যেক পেশার লোকদেরই প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহারা না থাকিলে অন্যান্য লোকগণ কষ্টে পতিত হইবে। এমন কি, মেথরেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; শুধু কবিগণ ব্যতীত। কেননা, তাহারা কোন কাজেরই নহে। তাহারা সকলেই মরিয়া গেলে দুনিয়ার কেহই অসুবিধায় পড়িবে না। (১)

মোটকথা, নিজকে নিকৃষ্টতম পেশাদার বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও নিস্তার নাই। কেননা, উহাতেও কিছু না কিছু গুণ অবশ্যই আছে। অন্যকিছু না থাকিলেও মানুষ হওয়ার গুণটি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। হাঁ, নম্রতার এক উপায় আছে। তাহা এই যে, নিজকে মানুষই বলিও না—জানোয়ার বলিতে থাক। যেমন, আজকাল

---

(১) অবশ্য বেশ্যা, কাওয়াল এবং ডোমদের কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কেননা, তাহারা কবিদের কবিতা গাহিয়াই টাকা-পয়সা উপার্জন করে। উত্তরে বলা যাইতে পারে পুরাতন কবিতাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। সুতরাং তাহারাও কোনরূপ অসুবিধায় পতিত হইবে না।

কিছু সংখ্যক লোক মানুষ হইতে জানোয়ারে পরিণত হইতেছে। তাহাদের কাহারও পদবী 'তুতীয়ে হিন্দ', কাহারও 'বুলবুলে হিন্দ'। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা ইহাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। জিজ্ঞাসা করি, মানুষ হইতে তোতা এবং বুলবুলে পরিণত হওয়াও কি কোন গৌরবের বিষয় হইতে পারে? এইসব জানোয়ার কি মানুষ হইতেও উত্তম? খোদার শোক্‌র আদায় কর যে, তিনি তোমাকে মানুষ বানাইয়াছেন, মুসলমান বানাইয়াছেন, নামাযী বানাইয়াছেন এবং যিক্‌র করার তৌফীক দান করিয়াছেন। এইসব নেয়ামতের কদর কর এবং এমন নম্রতা দেখাইও না—যাহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল খোদার পথের পথিকগণ আমলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না; কিন্তু হালের প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করে। চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্‌র নাম যিক্‌র করিয়া আনন্দ পায় না; কিন্তু সামান্য কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) কিংবা কান্নাভাব লাভ হইয়া গেলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। ইহা মূর্খতা বৈ কিছুই নহে। মনে রাখ, আমলই হইল আসল বস্তু। ইহাই কাজে আসিবে। হাল লাভ হইল বা না হইল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। হাঁ আমলের সহিত হালও লাভ হইয়া গেলে তাহা সোনায় সোহাগা হইবে। নতুবা শুধু শুধু হালের কোন মূল্য নাই।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ)-এর খেদমতে কেহ যিক্‌রে উপকার পায় না বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি উত্তরে বলিতেন, মিয়া, তুমি যে যিক্‌র করিতেছ, ইহাই কি কম উপকার? এরপর তিনি এই কবিতার আবৃত্তি করিতেন:

یا بم اورا یا نیا بم جستجوئے می کنم + حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

(ইয়াবাম উরা ইয়া নায়াবাম জুস্তজুয়ে মীকুনাম
হাছেল আয়াদ ইয়া নায়ায়াদ আরযুয়ে মীকুনাম)

'তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) পাই বা না পাই, তালাশ করিতে থাকিব। তিনি লাভ হউন বা না হউন আকাঙ্ক্ষা করিতেই থাকিব।'

॥ দুনিয়ার স্বরূপ ॥

মোটকথা, باقیات শব্দের সহিত صالحات শব্দটিও বহুবচন ব্যবহার করায় প্রত্যেক আমলের গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আখেরাতের শোভা 'আমল' চিরস্থায়ী। ইহার বিপরীতে মাল ও আওলাদকে দুনিয়ার শোভা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শোভা শব্দটি দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে যে, দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংসশীল। অতএব, দুনিয়ার মাল আওলাদ যদি আপনার পূর্বেই এবং আপনার সম্মুখেই ধ্বংস হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য দুঃখ করিবেন না। কেননা, উহা তো ধ্বংস হইবার

জন্যই মওজুদ ছিল। এমন ধ্বংসশীল বস্তু সম্বন্ধে যদি আপনি হিসাব করিতে থাকেন যে, এই ছেলেটির এত বয়স হইলে এত টাকা রোজগার করিবে, এরপর বিবাহ করিবে এবং ছেলেপিলে হইবে, তবে এই হিসাব জনৈক ব্যবসায়ীর নদীর পানি হিসাব করার ন্যায় হইবে।

ঘটনা এইরূপ ঃ জনৈক লালাজী ভাড়ার গাড়ীতে আপন পরিবার-পরিজন লইয়া যাইতেছিলেন। পথে নদী পড়িল। নদীতে তখন জোয়ার ছিল। গাড়ীর চালক বলিল, জানি না, কি পরিমাণ পানি হইবে, ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহাতে ব্যবসায়ী লালাজী একটি বাঁশ লইয়া নদীর পানি মাপিলেন। তিনি নদীর কিনারের ও মধ্যখানের পানি মাপিয়া অপর পারেও ইহার অনুরূপ পানি হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেন। অতঃপর শ্লেটে অঙ্ক কষিলেন। মধ্যখানের গভীরতাকে দুই কিনারে ভাগ করতঃ গড় বাহির করিয়া দেখিলেন যে, নদীতে মাত্র কোমর পানি হইবে। এরপর তিনি গাড়ীচালককে বলিলেন, মিয়া, তুমি নিশ্চিন্তে গাড়ী নামাইয়া দাও। আমি গড় বাহির করিয়া দেখিয়াছি, মাত্র কোমর পানি হইবে। সেমতে গাড়ী নদীতে নামাইয়া দেওয়া হইল। মধ্যখানে পৌঁছিতেই গাড়ী ডুবিতে লাগিল। ইহাতে লালাজী অঙ্কটি আবার দেখিলেন ; কিন্তু পূর্বের গড়ই বাহির হইল। এবার লালাজী বলিয়া উঠিলেন ; لیکھا جوں کا توں پھر کنبہ ڈوبا کیوں 'যেমন আছে, তেমনই লিখিয়াছি, তবে কুম্বা অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ডুবিয়াছে কেন ?'

এই বোকা লোকটি যেমন হিসাব করিয়া মনে করিয়াছিল যে, শ্লেটে যেরূপ পানির গড় বাহির হইয়াছে, নদীতেও তদ্রূপ গড় সমান হইয়া গিয়াছে, আওলাদের ব্যাপারে তোমাদের হিসাবও তেমনি। তোমরা মনে মনে হিসাব করিয়া ভাবিতে থাক যে, আসলেও এরূপ হইবে, কিন্তু আসলের কোঠায় যাহা নির্ধারিত আছে, তাহাই হয়, তোমাদের হিসাবে কিছুই হয় না। টাকা-পয়সা নষ্ট হইয়া গেলে তোমরা দুঃখ করিও না ; বরং মনে করিয়া লও যে, ইহা নষ্ট হইবারই জিনিস।

কেহ কেহ মাল নষ্ট হওয়ার কারণে দুঃখ প্রকাশ করার কারণ বর্ণনা করিয়া বলে যে, নষ্ট না হইলে ইহা খোদার রাস্তায় খরচ করিতাম, ফলে সওয়াব পাওয়া যাইত। আমি বলি, প্রথমতঃ ইহা নিছক ধারণা মাত্র। নষ্ট হওয়ার পরই এইরূপ ধারণা মনে জাগে। টাকা নষ্ট না হইয়া ঘরে থাকিলে মনে এইরূপ ধারণা জাগিত না। আর যদি কাহারও বাস্তবিকই এইরূপ নিয়ত থাকে, তবে আমি বলি যে, সে নিশ্চিন্ত থাকুক, সে সওয়াব পাইয়া ফেলিয়াছে। কেননা, সওয়াব পাওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যখন তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার নিয়ত করিয়াছিলে সওয়াব তখনই পাইয়া ফেলিয়াছ। এরপর খরচ করার সুযোগ হউক বা না হউক। তোমার সওয়াব নষ্ট হইবে না। অতএব, এই কারণেও চিন্তিত না হওয়া উচিত।

হাঁ, নেক আ'মল ফওত হইয়া গেলে তজ্জন্য দুঃখ করা উচিত। কিন্তু এই ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাহা এই যে, নেক আ'মল ফওত হইয়া গেলে সাধারণ লোক যত ইচ্ছা তত দুঃখ করুক, ইহা তাহাদের পক্ষে উপকারী। কিন্তু খোদার পথের পথিকদের এই কারণেও বেশী দুঃখ করা সমীচীন নহে; বরং তাঁহাদের উচিত কিছুক্ষণ দুঃখ করতঃ মনে-প্রাণে তওবা করিয়া আবার আপন কাজে লাগিয়া যাওয়া। হায়, এই কাজটি কেন ফওত হইয়া গেল, এই ভুলটি কেন করিলাম?—এইরূপ অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া তাঁহাদের মোটেই উচিত নহে। সদাসর্বদা এইরূপ চিন্তা করা খোদা-পন্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর। কেননা, ইহা খোদার সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইহার কারণ এই যে, আন্তরিক প্রফুল্লতা দ্বারাই খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। উপরোক্তরূপ দুশ্চিন্তা অন্তরের প্রফুল্লতা হ্রাস করিয়া দেয়। তবে অল্পক্ষণ দুঃখ করা এবং কিছু কান্নাকাটি করিয়া লওয়া উচিত—যাহাতে নফ্‌স ত্রুটির শাস্তি পায়। এরপর তওবা ও খুব ভালরূপে এস্তেগ্‌ফার করতঃ মন হইতে দুশ্চিন্তা মুছিয়া পূর্ব কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

আজকাল বেশী দুঃখ করিলে আরও একটি ক্ষতি হইবে। তাহা এই যে, আজকাল স্বভাবতই অন্তর দুর্বল। বেশী দুঃখ করিলে ইহার দুর্বলতা আরও বাড়িয়া যাইবে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অকর্মণ্যতা দেখা দিতে পারে। ইহা প্রকাশ্য ক্ষতি বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, কতিপয় স্থায়ী উপকার ফওত হইয়া যাওয়াও যখন বেশী দুঃখের কারণ নহে, তখন ধ্বংসশীল উপকার অর্থাৎ, পার্থিব উপকার কিছুতেই দুঃখের কারণ হইতে পারে না। অতএব, পার্থিব উপকারের জন্য হা-হুতাশ করা নিতান্তই অর্থহীন। তাছাড়া একথা প্রমাণিত যে, মুসলমানের যে জিনিসই নষ্ট হয়, তাহা সমস্তই হক তা'আলার নিকট জমা থাকে। মুসলমান ব্যক্তি ইহার পরিবর্তে সওয়াব পায়। এমন কি, শরীরে একটি কাঁটা ফুটিলেও উহার সওয়াব পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এই মূলনীতি অনুযায়ী একখানি আয়াতের তফ্‌সীর বুঝিয়া লউন। খুব দরকারী কথা। দুনিয়ার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় হক তা'আলা বলেন:

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔

আয়াতের মোটামুটি অর্থ এই—কাফেরেরা পার্থিব জীবনে যাহা ব্যয় করে, উহার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোন কাফেরের শস্যক্ষেত্র, যাহাতে তুষারপাত হয়। ফলে উহা বরবাদ হইয়া যায়। কাফেরদের এই ক্ষেত শস্যশ্যামলা হওয়ার পর যেমন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি তাহাদের ব্যয় করা মাল ঈমান না

থাকার কারণে একেবারেই বিফলে যায়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই উদাহরণে حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ, 'কাফেরদের শস্যক্ষেত্র' বলিলেন কেন? অথচ তুষারপাত হইলে কাফের ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেতই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মুসলমানের ক্ষেত তুষারপাতের ফলে পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যদিও ক্ষেত বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু এই বিপদে ধৈর্য ধরার কারণে ধৈর্যের প্রতিদান বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার পরিবর্তে আখেরাতে যে সওয়াব পাইবে, তাহা এই ক্ষেত হইতে লক্ষগুণ উত্তম হইবে। কেননা, আখেরাতের সওয়াবের দৃষ্টান্ত এইরূপ:

نیم جاں بستاند و صد جاں دھد + آنچه در و همت نیاید آں دھد

خود که یابد ایں چنیں بازار را + که بیک گل می خری گلزار را

(নীম জাঁ বেসাতানাদ ও ছদ জাঁ দেহাদ + আঁচেহ্ দরু হিম্মত নায়ায়াদ আঁ দেহাদ খোদ কেহ্ ইয়াবাদ ই চুনী বাজার রা + কেহ্ বএক গুল মীখারী গুলযার রা)

অর্থাৎ, 'অর্ধেক প্রাণ গ্রহণ করেন এবং শত শত প্রাণ দান করেন। যাহা বরদাশ্‌ত করার শক্তি নাই, তাহা দান করেন। এমন বাজার বিনা কষ্টে কে পাইতে পারে—যেখানে একটি ফুল দ্বারা সুশোভিত ফুলের তোড়া ক্রয় করা যায়?'

অতএব, কাফেরের আ'মল বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হিসাবে কাফেরের ক্ষেতই উপযুক্ত। ইহাই তুষারপাতের ফলে পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কেননা, কাফের উহার কোন প্রতিদান পায় না। মুসলমানের পূর্ণ ও প্রকৃত ক্ষতি হয় না। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই حرث قوم-এর সহিত ظلموا انفسهم-এর সংযোগ করা হইয়াছে। খোদার কসম, ইহা বড়ই চমৎকার সংযোগ। ইহা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, পার্থিব কোন ক্ষতি দ্বারাই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রকৃত ক্ষতি শুধু কাফেরের হয়। মুসলমানের জন্য সর্বদা আনন্দই নির্ধারিত—সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেও আনন্দ এবং বিপদাপদেও আনন্দ। অমুসলমানরাও বলিয়া থাকে যে, মুসলমানের উন্নতি হইলে আমীর, অবনতি হইলে ফকীর (যাহার সম্মান আমীরের চেয়েও বেশী) এবং মরিয়া গেলে পীর। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতির উন্নতি হইলে সুপুত, অবনতি হইলে কুপুত এবং মরিয়া গেলে ভুত। তখন তাহারা প্রেতাত্মা হইয়া জীবিতদের পিছনে ধাওয়া করে। মুসলমানের মনস্কাম সিদ্ধ হইলেও আনন্দ এবং সিদ্ধ না হইলেও আনন্দ। মাওলানা রূমী বলেন:

گر مرادت را مذاق شکر ست + بے مرادی نے مراد دلبر ست

(গার মুরাদাত রা মযাকে শুক্‌র আস্ত + বেমুরাদী ন্যায় মুরাদে দিলবর আস্ত)

'তোমার আকাঙ্ক্ষায় যদি কৃতজ্ঞতার রুচি থাকে, তবে মাশুককে আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা নহে।'

উদ্দেশ্য সফল হইলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, সফল না হইলেও তেমনি সওয়াব পাওয়া যায়। কেননা, উহা হক তা'আলার ইচ্ছার অনুকূলে সওয়াব না হইলেও আশেকদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। তদুপরি তাঁহারা সওয়াব পায়। প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির মধ্যেই প্রেমিকের আনন্দ নিহিত—একারণেই যত বড় বিপদই আসুক না কেন তাহা তাহাদের জন্য আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।

হুযূর (দঃ)-এর ওফাতের চেয়ে বড় বিপদ মুসলমানদের পক্ষে আর কি হইবে? এই ওফাতের সময় খিযির (আঃ) ছাহাবীদিগকে এইভাবে সান্ত্বনা দেন:

إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ

فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যেই প্রত্যেক বিপদের সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক বিগত বস্তুর প্রতিদান নিহিত আছে। অতএব, আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা রাখ এবং তাঁহার কাছেই আশা রাখ। কেননা, যে ব্যক্তি সওয়াব হইতেও বঞ্চিত হয়, সে-ই পূর্ণরূপে বঞ্চিত। (মুসলমান কোন বিপদেই সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয় না।)' আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এরও প্রতিদান আছে, তখন প্রতিদানের আর কি বাকী রহিল? এরপর এমন কোন বিপদই নাই—যাহাতে মুসলমানগণ খোদা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পেরেশান হইতে পারে। তবে ধর্ম-কর্মে ত্রুটি থাকিলে তজ্জন্য দুঃখ করা উচিত। কেননা, ইহার কোন প্রতিদান নাই। পূর্বেকার বর্ণনা অনুযায়ী এই দুঃখ প্রকাশও সীমিত পর্যায়ে হওয়া দরকার। কেননা, তওবা, এস্তেগ্‌ফার কান্নাকাটি ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম-কর্মের ক্ষতি পূরণ হইতে পারে।

॥ আশার গুরুত্ব ॥

এখন আমি আবার আয়াতের তরজমা করিতেছি। এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার বর্ণনা শেষ করিতে চাই। হক তা'আলা বলেন:

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"স্থায়ী নেক আ'মলসমূহ খোদার নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম।" অর্থাৎ, নেক আ'মল করিলে বান্দা যেমন সওয়াব পায়, তদ্রূপ তাহার মনে আশারও সঞ্চার হয় যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ খোদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এইরূপ আশা অতি উচ্চ। ইহার সত্যিকার মূল্য আশেকরা বুঝিতে পারে। তাহারা এই আশার ভরসায়ই জীবিত থাকে। কেহ চমৎকার বলিয়াছেন:

اگرچه دور افتادم بدیں امید خرسندم + که شاید دست من باردگر جانان من گیرد

(আ্গরচেহ্ দুর উফ্‌তাদাম বদীঁ উমেদ খুরসন্দাম
কেহ্ শায়াদ দস্তে মান বারে দিগার জানানে মান গীরাদ)

অর্থাৎ, 'যদিও দূরে পড়িয়াছি, তবুও এই আশায় জীবিত আছি যে, হয় তো আমার হাত আবার প্রেমাস্পদকে ধরিতে পারিবে।"

এই আশা কোনরূপ কামনাজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতির নাম নহে; বরং এই আশার বদৌলতে অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত ও সঞ্জীবিত হয়। জনৈক আশেক মৃত্যু-কষ্টে পতিত অবস্থায় সংবাদ পায় যে, তাহার প্রেমাস্পদ আসিতেছে। ইহাতে আগ্রহের আতিসয্যে সে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পড়ে। এরপর জানিতে পারিল যে, প্রেমাস্পদ দরজা পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনা মাত্রই সে আবার ঢলিয়া পড়িয়া গেল। অতএব, বুঝা গেল যে, আশা মরণোম্মুখ ব্যক্তির দেহেও একবার নবজীবন সঞ্চার করিয়া দেয়। এই ব্যক্তির প্রেমাস্পদ কৃত্রিম ও যালেম ছিল। এই কারণে তাহার আশা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু হক তা'আলা সর্বদাই আছেন এবং থাকিবেন। তিনি দাতা, দয়ালু ও প্রেমিকপরায়ণ। তাঁহার প্রতি আশা পোষণ করিলে তাহা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। খোদার কসম, খোদা-প্রেমিকগণ এই আশার বদৌলতে সর্বক্ষণ নবজীবন লাভ করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নেক আ'মলের উপকার নগদও পাওয়া যায়—শুধু বাকীই নহে। হাঁ, বাকী উপকারও একটি আছে। তাহা হইল সওয়াব। আশা নেক আ'মলের একটি নগদ উপকার। ইহা নেক আ'মল ব্যতীত লাভ হয় না। কোন অপরাধীকে আশাবাদী দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, সে সত্যিকার আশাবাদী নহে; বরং সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ও ভ্রমে পতিত আছে। যদি সত্য সত্যই আশাবাদী হয়, তবে অবশ্যই তাহার নিকট কোন নেক আ'মলের পুঁজি আছে। উহার কারণেই সে আশা লাভ করিতে পারিয়াছে। অন্য কোন আ'মল না থাকিলেও ঈমান ও ইস্‌লামের আ'মল আছে। কেননা, ঈমান নেক আ'মলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কোন কাফের ব্যক্তি কোনক্রমেই খোদার প্রতি বিশুদ্ধ আশাবাদী হইতে পারে না। লালসা ও অহঙ্কার ছাড়া তাহার অন্য কোন কিছু লাভ হইতে পারে না। মোটকথা, আশা হইল নেক আ'মলের নগদ উপকার।

তেমনি মন্দ আ'মলসমূহের একটি বাকী ও একটি নগদ ফলাফল রহিয়াছে। বাকী ফলাফল হইল জাহান্নামের শাস্তি এবং নগদ ফলাফল হইল আতঙ্ক, মানসিক অন্ধকার এবং অস্থিরতা। এগুলি অবশ্য গোনাহের প্রতিক্রিয়া। এই কারণেই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জান্নাত ও দোযখ বর্তমান কালেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। যাহার নিকট নেক আ'মলের পুঁজি আছে, জান্নাত এখনই তাহাকে

পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেননা, আশার কারণে সে অত্যন্ত শান্তিতে দিনাতিপাত করে। পক্ষান্তরে যাহার নিকট মন্দ আ'মল আছে, জাহান্নাম এখনই তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেননা, পাপের আতঙ্ক ও অন্ধকারের দরুন এই ব্যক্তি দুনিয়াতে অস্থিরতা ও শাস্তি ভোগ করিতেছে।

আমি নিজে হযরত মাওলানা ফযলুর্‌রহমান (রঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, ভাই, জান্নাতের মজা সত্য, হাউযে কাউছারের আনন্দ সত্য, কিন্তু নামাযে যে স্বাদ পাওয়া যায়, তাহা কোন কিছুতেই নাই। নামাযে সেজদায় যাওয়ার সময় মনে হয়, যেন খোদাতা'আলা আদরের পরশ দান করিয়াছেন। সোব্‌হানাল্লাহ্‌, যিনি নেক আ'মলের এবংবিধ স্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ হইবে না কেন?

কেহ কেহ বলে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বটে; কিন্তু উহা বাকী এবং দুনিয়া নগদ। মানুষ স্বাভাবতই নগদ বস্তুর প্রতি অনুরাগী। এই কারণে বাধ্য হইয়াই মানুষ দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দান করে। উপরোক্ত আলোচনায় তাহাদের এই উক্তির জওয়াবও নিহিত আছে। এসম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, নগদ বস্তুকে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রথমতঃ, ইহাই ঠিক নহে। মনে করুন, কেহ আপনাকে বলিল, যদি এখন বাসা চাও, তবে এই কাঁচা বাড়ী পাইবে। আর যদি এক বৎসর পর লইতে চাও, তবে বিরাট পাকা বাড়ী দেওয়া হইবে। বলুন, এমতাবস্থায় আপনি কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দান করিবেন। নিশ্চয়ই পাকা বাড়ী পাওয়ার আশায় আপনি এক বৎসর কাল অপেক্ষা করাকেই পছন্দ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, আখেরাতকে বাকী মনে করাও ভুল। খোদার কসম, আখেরাতের আ'মলসমূহের ফলাফল নগদও পাওয়া যায়। যাঁহারা এই ফলাফলের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা সপ্ত দেশের রাজত্বের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না। এই ফলাফল হইল খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্ক ও তাঁহার প্রতি আশান্বিত হওয়া। এই কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমাদের নিকট যে ধন আছে, দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা উহার সন্ধান পাইলে তলোয়ার লইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে এবং উহা ছিনাইয়া লইতে চাহিবে। কোরআন পাকের এক স্থানে হক তা'আলা নেক আ'মলসমূহের দুইটি ফলাফল উল্লেখ করিয়াছেন :

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

'তাহারা (নেক আ'মলকারীরা) আপন প্রতিপালকের তরফ হইতে হেদায়তের উপর কায়েম রহিয়াছে এবং তাহারাই পূর্ণরূপে কৃতকামী।' অর্থাৎ, নেক আ'মলের এক ফলাফল আখেরাতের কামিয়াবী তো আছেই, হেদায়তও উহার অপর একটি দ্রুত ফলাফল। এপ্রসঙ্গে বাহ্যতঃ প্রশ্ন হয় যে, হেদায়ত ফলাফল হইবে কিরূপে?

যাহাতে আনন্দ আছে, তাহাই স্বাদযুক্ত। হেদায়ত আ'মলের একটি অবস্থা বিশেষ। ইহাতে আনন্দের কি আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ আমার একটি নিজস্ব কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, হেদায়ত (সুপথ প্রাপ্তি হওয়া)ও একটি ফল।

একবার আমি সাহারানপুর হইতে কানপুর যাইতেছিলাম। তজ্জন্য সাহারানপুর হইতে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনে সওয়ার হইলাম। এই গাড়ীতেই আমার জনৈক স্বদেশবাসী জেন্টলম্যান বন্ধু পূর্ব হইতেই সওয়ার ছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, হয় তো তিনিও লক্ষ্ণৌ যাইবেন। কেননা, এককালে লক্ষ্ণৌ শহরের সহিত তাঁহার খুব সম্পর্ক ছিল। শীতের রাত্রি ছিল। বন্ধুবর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। শীতবস্ত্র কম্বল ইত্যাদি সঙ্গে কিছুই ছিল না। সঙ্গে কোনরূপ আসবাবপত্রের বোঝা না রাখাই আজকালকার জেন্টলম্যানদের ভ্রমণ করার নিয়ম। ট্রেন চালু হইয়া গেলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি লক্ষ্ণৌ যাইতেছেন ? তিনি বলিলেন, আমি মিরাট যাইতেছি। আমি বলিলাম, আপনি মিরাট যাইতে পারেন, কিন্তু আফ্‌সোস যে, এই গাড়ীটি লক্ষ্ণৌ যাইতেছে। আসলে আমি তাহাদের প্রচলিত বচন-ভঙ্গী অনুযায়ীই কথাবার্তা বলিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, গাড়ীটি কি সত্যই লক্ষ্ণৌ যাইতেছে ? আমি বলিলাম, হাঁ। এরপর তিনি বারবার লা-হাওলা পাঠ করতঃ এদিকওদিক তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, সাহেব, রোড়কী ষ্টেশনের এদিকে আর গাড়ী থামিতেছে না। পেরেশান হইয়া লাভ কি ? নিশ্চিন্তে বসিয়া কথাবার্তা বলুন। ইহাতে বন্ধুবর রাগত স্বরে বলিলেন, আপনি তো বেশ কথাবার্তা বলার তালে আছেন। এদিকে আমার পেরেশানীর অন্ত নাই। তখন আমি নিজের ও তাহার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলাম। আমি এখনও গন্তব্যস্থানে পৌঁছি নাই। তিনিও আপন অভীষ্ট স্থান হইতে বেশী দূরে নহে ; বরং ফেরৎ গাড়ীতে তিনি আমার পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া যাইবেন। তাসত্ত্বেও আমি নিশ্চিন্ত আর তিনি অস্থিরপ্রাণ। আমার নিশ্চিন্তা ও তাঁহার অস্থিরতার কারণ কি ? চিন্তা করার পর বুঝিলাম যে, আমি আমার পথেই ছিলাম। এই কারণে আমার মধ্যে কোনরূপ দুশ্চিন্তা ছিল না ; কিন্তু তিনি আপন পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার মনে অস্থিরতা বিরাজ করিতেছিল। তখন ট্রেনটি যতই পথ অতিক্রম করিতেছিল, আমার আনন্দ ও মানসিক শান্তি ততই বাড়িতেছিল। পক্ষান্তরে গাড়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ বন্ধুবরের মনে কাঁটার ন্যায় বিধিতেছিল।

আয়াতে উল্লেখিত হেদায়তও যে আ'মলের একটি বড় ফলাফল, উপরোক্ত ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাস্তবিক হেদায়ত অর্থাৎ পথে থাকা একটি বড় নেয়ামত ও ধন। দুনিয়াতে প্রত্যেক মুসলমান এই ফলাফল প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু কাফের ইহা হইতে বঞ্চিত।

॥ ছদ্‌কায়ে জারিয়া ॥

নেক আমলসমূহের পুরস্কার আখেরাতে চিরস্থায়ী হইবে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক আ'মল শুধু স্থায়ীই হইবে এবং কিছু সংখ্যক আমলকে অতিমাত্রায় স্থায়ী বলা উচিত। যেমন, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ (ফকির দরবেশদের আস্তানা) স্থাপন করা। এগুলি ছদ্‌কায়ে জারিয়া। অতএব, ইহাকে সোনার উপর সোহাগা বলিতে হইবে। অর্থাৎ, কিছু সংখক আ'মলের সওয়াব মৃত্যুর পর বৃদ্ধি পায় না। জীবদ্দশায় যতটুকু সওয়াব উপার্জন করা হয়, ততটুকুই বাকী থাকিবে। উহাতে উন্নতি হইবে না। কিন্তু ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব মৃত্যুর পরও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। তুমি যখন কবরে শায়িত থাকিবে, ফেরেশ্‌তা তখনও তোমার আ'মলনামায় ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব লিখিতে থাকিবে। অতএব, যেসব আ'মলের সওয়াব মৃত্যুর পরও বাড়ীতে থাকে, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ উহাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আজকাল খানকাহ্‌র নামে খানকাহ্ স্থাপন করা উচিত নহে; বরং মাদ্রাসার নাম দিয়া স্থাপন করত উহাতে খানকাহ্‌র কাজ-কর্ম করা উচিত; কেননা, খানকাহ্ নাম দিলে উহা বেশী পরিমাণে খ্যাত হইয়া যায়। তাছাড়া, পরবর্তীকালে উহাতে বেদআত হইতে থাকে। কেহ ওরশ করে, কেহ কাওয়ালীর আসর জমায় আবার কোথাও কোথাও গদীনশীনী হইয়া থাকে—যাহাতে বিভিন্ন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনর্থ দেখা দেয়। এরচেয়ে খানকাহ্ নাম না দেওয়াই উত্তম। বরং মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উহাতে চরিত্র শুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কাজ কর। এমতাবস্থায় ইহা প্রকৃত মাদ্রাসাও হইবে এবং খানকাহ্‌ও হইবে। অতএব, যে মাদ্রাসায় শিক্ষার সাথে সাথে আ'মলের প্রতিও বিশেষ নযর দেওয়া হয়, উহাই প্রকৃত মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পরিচালকগণ শুনুন, আপনারা নিজ নিজ মাদ্রাসার সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিন এবং উহাদিগকে সত্যিকার মাদ্রাসায় পরিণত করুন। অর্থাৎ, ছাত্রদের আ'মলেরও দেখাশুনা করুন। নতুবা স্মরণ রাখুন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

'তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই আপন প্রজাসাধারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।' এই নীতি অনুযায়ী আপনারা এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবেন। কেননা, আপনারা ছাত্রদের রক্ষক এবং তাহারা আপনাদের প্রজা। অতএব, ছাত্রদিগকে শুধু সবক পড়াইয়া পৃথক হইয়া যাওয়া জায়েয নহে; বরং ইহাও দেখা দরকার যে, কোন্ ছাত্রটি এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করে এবং কে করে না? যাহাকে আ'মলের প্রতি মনোযোগী দেখেন, তাহাকে পড়ান। নতুবা মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিন। এরূপ করিলে আপনার মাদ্রাসা সত্যিকার দারুল এল্‌ম অর্থাৎ এল্‌মের মহল হইবে। নতুবা ফারসী ভাষার দারে এল্‌ম অর্থাৎ এল্‌মের বধ্যভূমিতে পরিণত

হইবে। ছাত্রদের যাবতীয় কাজকর্মের দেখাশুনা করুন। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। যাহারা কোট, প্যান্ট, বুট ইত্যাদি পরিধান করে, তাহাদিগকে আলেমদের পোশাক পরিতে নির্দেশ দিন। নতুবা মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দিন। সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ সবরকম সাদৃশ্যের ব্যবস্থা করুন এবং ছাত্রদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিন ঃ

یا مکن با پیلبا نا ں دوستی + یا بنا کن خا نه بر ا ند ا ز پیل

(ইয়া মকুন বাপীলবানাঁ দুস্তী + ইয়া বেনাকুন খানা বর আন্দাযে পীল)

'হাতী-চালকদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, যদি কর, তবে হাতীর যোগ্য উচ্চ গৃহ নির্মাণ কর।

অর্থাৎ, এল্‌ম হাছিল করিতে হইলে তালেবে এল্‌মদের ন্যায় আকৃতি বানাও, নতুবা বিদায়। এই পর্যন্ত আলেমদিগকে বলা হইল। এখন জনসাধারণকে বলিতেছি, আপনারা মাদ্রাসার খেদমত করুন। মাদ্রাসার যে কোন কাজেই আপনি সাহায্য করিবেন, তাহা স্থায়ী আ'মল হইবে। কেহ কেহ শুধু শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করাকে ছদ্‌কায়ে জারিয়া মনে করে, ইহা ভুল ধারণা। মাদ্রাসার গৃহ নির্মাণ এবং ছাত্রদের খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য সাহায্য করা ইত্যাদি সমস্তই ছদ্‌কায়ে জারিয়া। কেননা, এগুলি দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানেই সাহায্য করা হয়। এই ছাত্ররা লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া যখন অন্যান্য লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবে, তখন আপনি সর্বদাই উহার সওয়াব পাইতে থাকিবেন। এই মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা দুনিয়াতে যতদিন এল্‌মের আলোধারা চালু থাকিবে, ততদিন সমভাবে আপনার আ'মলনামায় সওয়াব লিখিত হইতে থাকিবে। ইহা কতবড় আনন্দের কথা যে, আপনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত মাদ্রাসার খেদমত করিলেন কিংবা বেশী বয়স হইলে একশত বৎসর পর্যন্ত করিলেন, কিন্তু আপনার আ'মলনামায় হাজার বৎসর বরং ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সওয়াব লিখা হইবে। কেননা, খোদা চাহেন তো ক্বিয়ামতের কিয়ৎকাল পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়াতে এলমের চর্চা থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি জীবদ্দশায় এই সব কাজে সাহায্য না করেন, তবে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কারণ টাকা-পয়সা যেভাবেই হউক ব্যয় হইয়া যাইবে—বাকী থাকিবে না। বাজে ও না-জায়েয কাজে ব্যয় হইয়া টাকা-পয়সা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিংবা আপনার পর উত্তরাধিকারীরা তাহা দ্বারা বিলাসিতায় গা এলাইয়া দিবে এবং এই গোনাহের চিহ্ন আপনার আ'মলনামায় বাকী থাকিবে।

উদাহরণতঃ একটি গল্প বলিতেছি। জনৈক ব্যক্তি প্রত্যহ বিছানায় প্রস্রাব করিয়া দিত। এই বদভ্যাসের দরুন এক দিন তাহার স্ত্রী তিরস্কার করিয়া বলিল, একি বাজে অভ্যাস! তুমি এতবড় হইয়াও বিছানায় পেশাব করিয়া দাও! আমি প্রত্যহ বিছানা ধুইতে ধুইতে অতিষ্ঠ হইয়া গেলাম। ইহার উত্তরে লোকটি বলিল,

বেগম, কি বলিব, প্রত্যহ স্বপ্নে শয়তান আমার নিকট আসিয়া বলে, আস, তোমাকে ভ্রমণ করাইয়া আনি। আমি তাহার সহিত চলিয়া যাই। পথিমধ্যে পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আমি স্বপ্নের মধ্যে পেশাবখানার চত্বরের উপর বসিয়া পেশাব করিয়া দেই। কিন্তু বাস্তবে তাহা বিছানার উপরই হইয়া যায়। বেগম বলিল, শয়তান যখন তোমার এতবড় বন্ধু, তখন এক কাজ কর। অদ্য তাহাকে বলিও যে, তোমার দুস্তি আর কি কাজে আসিবে? আমরা দরিদ্র। কোথাও হইতে আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে টাকা আনিয়া দাও। স্বামী বলিল, ভাল কথা, আজ অবশ্যই তাহাকে একথা বলিব। রাত্রিবেলায় যখন স্বপ্নলোকে তাহার নিকট শয়তান উপস্থিত হইল, তখন সে বেগমের পয়গাম আদ্যোপান্ত তাহাকে জানাইয়া দিল। শয়তান বলিল, আরে কি যে বল, তোমার জন্য বহু টাকা রক্ষিত আছে। আমার সঙ্গে চল। এই বলিয়া শয়তান তাহাকে একটি ধনাগারে লইয়া গেল। সে টাকা-পয়সার এতবড় একটি বোঝা লোকটির পিঠে উঠাইয়া দিল যে, উহাতে লোকটির পায়খানা বাহির হইয়া গেল। সকাল বেলায় যখন চোখ খুলিল তখন দেখে কি, বিছানায় পায়খানা মৌজুদ, কিন্তু টাকার বোঝা উধাও। বেগম বলিল, এ কি! স্বামীপ্রবর আগাগোড়া ঘটনা বেগমকে শুনাইলে সে বলিল, ব্যাস কর। এরূপ টাকা হইতে তওবাই ভাল। এখন হইতে তুমি প্রত্যহ পেশাবই কর— আর পায়খানা করিও না।

তদ্রূপ গোনাহের কাজে টাকা-পয়সা খরচ করিলে পরিণামে টাকা-পয়সা উধাও হইয়া যাইবে; কিন্তু আ'মলনামায় উহার গোনাহ্ বাকী থাকিবে। এরপর জাহান্নামের শাস্তি পৃথক ভোগ করিতে হইবে। এই কারণে নেক আ'মলের প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আপন উপার্জিত ধন সৎকাজে ব্যয় করুন, যত্নসহকারে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকুন এবং হক তা'আলার সন্তুষ্টি ও আনুগত্য অর্জনের জন্য চেষ্টিত হউন।

এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। উপসংহারে আপনাদের নিকট অনুরোধ এই যে, এক্ষণে মাদ্রাসার যে-সব কার্যক্রম হইবে, তাহা দেখিয়া যাইবেন। আমার বর্ণনার পরই ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবেন না। দোআ করুন, যেন হক তা'আলা আমাদিগকে আ'মলের তৌফীক ও বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি দান করেন। (হযরত মাওলানা মিম্বর হইতে অবতরণের সময় বলিলেন যে, অদ্যকার বর্ণনার নাম "মাযাহেরুল আ'মাল" রাখা হউক।)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

সাফল্যের উপায়

সাফল্য অর্জন সম্পর্কে এই ওয়াজ ১৬ই ছফর ১৩৩১ হিজরী কনৌজের জামে মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করেন। আড়াই ঘণ্টায় ইহা শেষ হয়। মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ ছাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

◎

আপনি যদি সাফল্য কামনা করেন অর্থাৎ আনুষঙ্গিকভাবে দুনিয়ার সাফল্য এবং উদ্দেশ্য-মূলকভাবে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন, তবে ইহার উপায় এই যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করুন এবং দ্বীনের আহ্‌কাম যথাযথভাবে পালন করুন। কেননা, হক তা'আলা এইসব নির্দেশ পালনের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল রাখিয়াছেন।

◎

بسم الله الرحمن الرحيم ○

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم -

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

يايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ○

আয়াতের অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর। (যখন কাফেরদের সহিত মোকাবিলা হয়, তখন) মোকাবিলায় ছবর কর। (মোকাবিলার সম্ভাবনা থাকার সময়) মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় খোদাতা'আলাকে ভয় করিতে থাক। (শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিও না।) যেন তোমরা পুরাপুরি কামিয়াব হইতে পার।

॥ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ॥

এই আয়াতখানি সূরায়ে আলে-এমরানের পরিশিষ্টে উল্লেখিত হইয়াছে। সূরায়ে আলে-এম্‌রানে হক্ তা'আলা বিভিন্ন অধ্যায়ের আহ্‌কাম (নির্দেশাবলী) বর্ণনা করিয়াছেন। সূরাটি পাঠ করিলে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। সমস্ত আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর উপসংহারে উহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি ব্যতীত আহ্‌কামে পূর্ণতা অর্জন সম্ভবপর নহে। এগুলি যেসব আহ্‌কামকে পূর্ণতা দান করে, তদ্রূপ উহাদিগকে সহজও বানাইয়া দেয়। এতদ্বারা আপনি কোরআনের বর্ণনাভঙ্গীর সমাপ্তি-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোরআনের বিষয়বস্তু যেমন সর্বোৎকৃষ্ট, তদ্রূপ উহার সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই নযীরবিহীন। সাধারণতঃ সূরার উপসংহারে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়, সেগুলি সমস্ত সূরার নির্যাস, উহার আহ্‌কামকে পূর্ণতা দানকারী এবং সহজকারী হইয়া থাকে। ইহাতে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, হক্ তা'আলা আপন বান্দাদের প্রতি যারপরনাই মেহেরবান। আহ্‌কামকে সহজ করিতে পারে—এমন যেসব বিষয়বস্তু আছে, হক্ তা'আলা সেগুলি বাদ দেন নাই; বরং আহ্‌কাম বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে সহজ করার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন।

ওহী এবং যাহা ওহী নহে—এতদুভয়ের মধ্যে ইহাই হইতেছে পার্থক্য। ওহী নহে—এরূপ কালামের মধ্যে এতসব সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয় না। কেননা, বক্তা যখন ওহীর অধিকারী নহে, তখন তাহার কথার আসল উৎস অর্থাৎ দৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। ফলে তাহার কথায় সূক্ষ্ম বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টির বহু ত্রুটি থাকিবে। পক্ষান্তরে ওহীর অধিকারীর (পয়গম্বরের) দৃষ্টি সবকিছুর প্রতি ব্যাপক হইয়া থাকে। ফলে পয়গাম্বরের নিজস্ব কালাম হইতেও ওহীর সাহায্যে তাঁহার দৃষ্টি বিষয়বস্তুর প্রতিটি কোণে গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। তাঁহার কথায় কোন কঠিন বিষয় থাকিলে, তিনি উহা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে সহজ করিয়া দেন। আর যদি ওহীর অধিকারী ব্যক্তি হুবহু ওহী বর্ণনা করেন, তবে উপরোক্ত গুণটি তাঁহার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায় বিদ্যমান থাকে। ওহীর অধিকারী নহে—এরূপ ব্যক্তি দৃষ্টির ত্রুটির কারণে প্রথমতঃ জানিতেই পারে না যে, তাঁহার কথায় কোন কঠিন বিষয় আছে কি না। জানিতে পারিলেও সে উহা সহজ করার সামর্থ্য রাখে না। ওহীর অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টি যেহেতু সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত, এই কারণে সে সবগুলি দিকের প্রতি খেয়াল রাখিয়াই কথা বলে। প্রথমতঃ তাহার কথার কোন দিক স্বয়ং কঠিন হয় না; কিন্তু কোন কারণে যেমন সম্বোধিত ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্ত—বিধিনিষেধ আরোপ করিলে আতঙ্কিত হয়—এরূপ কারণে বাহ্যতঃ কোন দিক কঠিন হইলেও তিনি উহা সহজ

করার উপায় বলিয়া দেন। ওহীর অধিকারীর দুইটি অর্থ। (পূর্বেও এদিকে ইশারা করা হইয়াছে।) প্রথমতঃ, যে ওহী নাযিল করে অর্থাৎ, খোদাতা'আলা। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় অর্থাৎ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওহীর অধিকারী বলিয়া হক্ তাআলাকে বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টি যে সবকিছুকে বেষ্টনকারী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ নবী বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টিও সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। এই বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত। দলীল এই যে, হযরত (দঃ) খোদার তরফ হইতে নুবুওত ও রেসালত পদ হিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা উপার্জন করা যায় না; বরং খোদার দান। দ্বীনগত পদের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকিতে পারে না। হক্ তা'আলা যাহাকে এই শ্রেণীর পদে অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাকে গুণ এবং বৈশিষ্ট্যও পরিপূর্ণভাবে দান করেন।

॥ নবীগণ নিষ্পাপ ॥

উদাহরণতঃ দুনিয়াতে কোন শাসনকর্তা যখন কাহাকেও কোন পদ দান করেন, তখন নিজ জানা মতে মনোনয়নে ত্রুটি করেন না। মনোনয়নকারী স্বয়ং খোদাতা'আলা হইলে এই মনোনয়নে কোনরূপ ত্রুটি থাকিতে পারে না। দুনিয়ার শাসকগণ নিজ জানামতে যদিও মনোনয়নে ত্রুটি না করে, কিন্তু তাহাদের মনোনয়নে ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু হক্ তা'আলার মনোনয়নে ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই পয়গাম্বরগণ এল্ম ও আ'মল সকল দিক দিয়াই কামেল হইয়া থাকেন। হক্কানী আলেমগণ এই কারণেই নবীদিগকে নিষ্পাপ আখ্যা দিয়াছেন। আ'মলের পূর্ণতা হইল ইহার উদ্দেশ্য। যদি নবী নিষ্পাপ না হইল এবং তাঁহার দ্বারা গোনাহ্র কাজ হওয়া সম্ভব হয়, তবে ইহার অর্থ হইবে তাঁহার আ'মল অসম্পূর্ণ। কোন কাজ খোদাতা'আলার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে হইতে না পারাই আ'মলের পূর্ণতা। নবীর পক্ষে এই পূর্ণতা অর্জন একান্তই জরুরী। কেননা, হক্ তা'আলা তাঁহাকে একটি পদ দান করিয়াছেন। পদ দান করার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ, যাহাকে পদ দান করা হয়, তাহার মধ্যে উহার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে সে উহার দায়িত্ব সুন্দররূপে পালন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে পদ দানকারীর সম্পূর্ণ অনুগত ও তাবেদার হইতে হইবে।

উদাহরণতঃ বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে গভর্ণর (প্রতিনিধি) বানাইয়া পাঠাইলে তাহার মধ্যে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমতঃ, তাহার মধ্যে রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের সর্বোত্তম ক্ষমতা আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ, সে পুরাপুরিভাবে সরকারের অনুগত কি না। বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বিদ্রোহের নামগন্ধও তাহার মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যে ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বিদ্রোহ

কিংবা বিদ্রোহের নামগন্ধ থাকে, কোন বাদশাহ তাহাকে পদ দান করে না। অতএব, কেহ গভর্ণরের মধ্যে রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে যোগ্যতার অভাব আছে বলিয়া মন্তব্য করিলে কিংবা তাহার আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিবাদ করিলে প্রকৃতপক্ষে এই মন্তব্য ও প্রতিবাদ বাদশাহের বিরুদ্ধেই হইবে। কেননা, বাদশাহ্‌ই তাহাকে এই পদ দান করিয়াছেন। কাজেই প্রতিবাদের সারমর্ম এই হইবে যে, বাদশাহ জনৈক অযোগ্য ব্যক্তিকে কিংবা সরকারবিরোধী ব্যক্তিকে গভর্ণর বানাইয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তিকে বাদশাহের অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে। তবে গভর্ণরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে তাহা কখনও কখনও ন্যায় সঙ্গত হওয়াও সম্ভাবনা আছে। কেননা, দুনিয়ার বাদশাহদের দৃষ্টি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের মনোনয়ন ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে এহেন প্রতিবাদ করার মোটেই অবকাশ নাই। অতএব, খোদা তা'আলার আপন মনোনয়নের মাধ্যমে যাহাকে কোন পদ দান করেন, তাহার মধ্যে ঐ পদের পুরাপুরি যোগ্যতা এবং খোদা তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকা একান্তই অপরিহার্য।

এতএব, বুঝা গেল যে, পয়গাম্বরগণকে যে সব পদ দান করা হয় উহাতে তাঁহারা এল্‌ম তথা জ্ঞানের দিক দিয়া কামেল হইয়া থাকেন। আর যেহেতু খোদা তা'আলা আপন মনোনয়ন দ্বারা তাঁহাদিগকে পদ দান করেন, ফলে তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ বা নাফরমানীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। এই কারণে তাঁহারা আ'মলের দিক দিয়াও কামেল হইয়া থাকেন। নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ ইহাই। অতএব, কোন ব্যক্তি পয়গাম্বরদের এল্‌ম ও আ'মলের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহা খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইবে। কাজেই নবী হওয়ার পর হকতা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এই আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার কথা শুধু কোরআন ও হাদীস হইতেই জানা যায় না; বরং যুক্তির মাধ্যমেও ইহার সারবত্তা অনুধাবন করা যায়।

তাছাড়া পয়গাম্বরদের এল্‌ম তথা জ্ঞানেও কোনরূপ ত্রুটি সম্ভপর নহে; বরং এই পদের জন্য যেসব জ্ঞান জরূরী, উহাতে তাঁহারা কামেল হইয়া থাকেন। কেননা, যাহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা নাই, হকতা'আলা তাহাকে পদ দান করেন না। যোগ্যতার অর্থই এই যে, এই পদের জন্য যে সব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা।

হাঁ, এই পদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরূরী নহে। কেননা, তহ্‌শীলদার ব্যক্তির পক্ষে ঐসব জ্ঞানেরই প্রয়োজন, যাহা তহ্‌শীলদারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অর্থাৎ আইন-কানূন জানা। তদ্রূপ কাহাকেও চিকিৎসক বানাইলে,

তাহাকে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিষয় অর্থাৎ রোগ ও সুস্থতা সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে হইবে। তদ্রূপ পয়গাম্বরদের পক্ষে নুবুওত সম্বন্ধীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া জরুরী। বান্দার ভাল-মন্দের প্রতি ব্যাপক দৃষ্টি থাকা এইসব জ্ঞানের অন্যতম। এই কারণে 'ওহীর অধিকারী' বলিয়া নবী বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টিও বান্দার ভাল-মন্দের প্রতি ব্যাপক ভাবে বিরাজমান থাকা প্রয়োজন, কেননা, বিনা কায়ক্লেশে খোদাতা'আলা তাঁহাকে নুবুওতের পদ দান করিয়াছেন। ইহার সরাসরি সম্পর্ক হইল বান্দার ভাল-মন্দের সহিত। মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, ওহীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবগুলি দিকের প্রতি পুরাপুরি খেয়াল রাখা হয়। এই কারণেই কোরআন শরীফে প্রত্যেক দিকের প্রতি এমন খেয়াল রাখা হইয়াছে যে, অন্য কোন কালামে তদ্রূপ নাই।

॥ খোদার কালামের পারস্পরিক সম্বন্ধ ॥

কোরআনে শুধু আইনের ঘর পূর্ণ করা হয় নাই। এই বিষয়টি আপনি এইভাবে সহজে বুঝিবেন যে, সরকারী কর্মচারী দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার কর্মচারী শুধু আইনের পাবন্দী করে। আইনগতভাবে তাহাদের যিম্মায় যেসব কাজ ন্যাস্ত থাকে, তাহারা শুধু উহাই সম্পাদন করে এবং আইনানুযায়ী জনসাধারণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দেয়। কঠিন বিধিনিষেধগুলি কানুন হইতে বাদ দেওয়া কিংবা সেগুলি সহজ করার উপায় বলিয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে মোটেই জরুরী নহে। দ্বিতীয় প্রকার কর্মচারীরা জনসাধারণের প্রতি মহব্বত রাখে। তাহারা জনগণকে আরাম ও শান্তি দিতে চায়। তাহারা যথাসম্ভব কানুনের মধ্যে কোন কঠিন বিধিনিষেধ প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। কোন বিশেষ উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কঠিন বিধি-নিষেধ রাখিলেও তাহা সহজ করার উপায়ও জনসাধারণকে বলিয়া দেয়। ইহা করিতে যাইয়া তাহাদের কষ্টও হয়; কিন্তু ইহা দয়াভিত্তিক কাজ। জনগণের প্রতি যাহাদের অন্তরে দয়া আছে, তাহারাই শুধু এইসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারে।

আরও একটি উদাহরণ বুঝুন। ওস্তাদ এবং পিতা উভয়েই উপদেশ দেয়, কিন্তু পিতার উপদেশ অন্যান্য লোকের উপদেশ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। ওস্তাদ শুধু আইনের ঘর পূর্ণ করে, কিন্তু পিতা তাহা পারে না। সে উপদেশ দিতে যাইয়া লক্ষ্য রাখে যে, পুত্রকে এমন ভাষা ও ভঙ্গীতে উপদেশ দিতে হইবে—যাহাতে উহা তাহার অন্তরে স্থায়ী আসন পাতিয়া লয়। কেননা, পুত্রের সংশোধন হউক এবং উহাতে কোনরূপ ত্রুটি না থাকুক—পিতা আন্তরিকভাবে তাহা কামনা করে। পিতা পুত্রকে কোন কঠিন কাজ করিতে বলিলেও এমন পন্থা অবলম্বন করে যাহাতে পুত্রের পক্ষে কাজ করা সহজ হইয়া যায়। এইসব ভাল-মন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার একমাত্র কারণ

হইল স্নেহ বা দয়ার্দ্রতা। স্নেহ থাকিলেই সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়। এই কারণেই উপদেশ দেওয়ার সময় পিতার উক্তিসমূহ মাঝে মাঝে পারস্পরিক সম্বন্ধহীন ও এলোমেলো হইয়া যায়।

উদাহরণতঃ পিতা পুত্রকে খাদ্যরত অবস্থায় উপদেশ দিতেছে এবং তাহাকে কু-সংসর্গে চলাফিরা করিতে নিষেধ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যে সে দেখিতে পাইল যে, পুত্র একটি বড় লোক্‌মা মুখে পুরিতে উদ্যত হইয়াছে। এমতা-বস্থায় সে তৎক্ষণাৎ আগের উপদেশ বাদ দিয়া এইরূপ বলিতে বাধ্য হইবে যে, একি কাণ্ড! কখনও বড় লোক্‌মা লইতে নাই। এরপর সে আবার পুর্বের উপদেশে ফিরিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি মহব্বত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নহে, সে এইস্থলে বলিবে যে, এ কেমন এলোমেলো উক্তি! কু-সংসর্গের আলোচনার সহিত লোক্‌মার কি সম্বন্ধ ? কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও বাপ হইয়াছে, সে জানে যে, এই এলোমেলো উক্তি সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস উক্তি হইতে অনেক উত্তম। মহব্বত ইহাই চায় যে, এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথার প্রয়োজন দেখা দিলে পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মধ্যস্থলে অন্য কথা বলিয়া আবার পূর্ব কথায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত।

এই কারণেই খোদা তা'আলার কালাম কোথাও বাহ্যতঃ পারস্পরিক সম্বন্ধহীন মনে হইয়া থাকে। এই বাহ্যিক সম্বন্ধহীনতার একমাত্র কারণ হইল দয়ার্দ্রতা ও মহব্বত। হক তা'আলা বচন লেখকদের মত কথা বলেন না। লেখকরা লক্ষ্য রাখে যে, এক বিষয়ে আলোচনা শুরু হইলে মধ্যস্থলে অন্য বিষয় যেন প্রবিষ্ট না হয়। হক তা'আলা একটি বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি মধ্যস্থলে অন্য বিষয় সতর্ক করার প্রয়োজন দেখেন, তবে মহব্বতের কারণে মধ্যস্থলেই সে বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেন। এরপর আবার পুর্বের কথা বর্ণনা করেন।

এ প্রসঙ্গে একখানি আয়াত মনে পড়িল। আয়াতখানি পূর্বাপর সম্বন্ধহীন বলিয়া অনেকেই আপত্তি তুলিয়াছে। সূরায়ে ক্বিয়ামায় হক তা'আলা ক্বিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তখন মানুষ খুবই পেরেশান হইবে এবং পলায়নের পথ খুঁজিতে থাকিবে। আপন আপন আ'মল জানিতে পারিবে। সে দিন মানুষকে তাহার পূর্বাপর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হাতেনাতে দেখানো হইবে। এরপর হক তা'আলা বলেন: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ অর্থাৎ, (শুধু দেখাইলেই মানুষ তাহার আ'মল সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবে না; বরং সে দিন) মানুষ নিজ (অবস্থা ও আমল) সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল হইবে। (কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হইবে) যদিও মানুষ (আপন স্বভাব অনুযায়ী) শত বাহানা উপস্থিত করে।' যেমন কাফেরেরা বলিবে, খোদার কসম আমরা দুনিয়াতে মুশ্‌রিক ছিলাম না। কিন্তু মনে মনে তাহারাও জানিবে যে, তাহারা মিথ্যাবাদী। মোটকথা,

ক্বিয়ামতের দিন মানুষ আপন অবস্থা সম্বন্ধে খুবই জ্ঞাত হইবে। কাজেই আ'মলসমূহ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখানোর উদ্দেশ্য হইবে, নিরুত্তর করিয়া দেওয়া, প্রমাণ বাস্তবায়িত করা এবং ধমকি দেওয়া—স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে। এ পর্যন্ত আয়াতে ক্বিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এরপর হক তা'আলা বলেন :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا

قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

অর্থাৎ, হক তা'আলা হুযূর (দঃ)কে বলেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাহা দ্রুত মুখস্থ করার নিমিত্ত আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে কোরআন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া এবং মুখে পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন আমি কোরআন নাযিল করি, তখন ফেরেশ্‌তার পাঠ অনুসরণ করুন। আপনি কোরআনের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন—ইহাও আমার কাজ। এরপর ক্বিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ - অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছ এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছ।' আবার বলেন : وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'ঐ দিন কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইবে। তাহারা আপন প্রতিপালককে দেখিতে থাকিবে।'

অতএব, দেখা গেল যে, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আয়াতখানির পূর্বেও ক্বিয়ামতের বর্ণনা এবং পরেও ক্বিয়ামতেরই বর্ণনা। মধ্যস্থলে বলা হইয়াছে যে, কোরআন পাঠ করার সময় তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। এই স্থলের পূর্বাপর সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেকেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বহু ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন; কিন্তু সবগুলি ব্যাখ্যাই জবরদস্তিতে পূর্ণ। কেহ চমৎকার বলিয়াছেন :

کلام میکه محتاج معنی باشد لا یعنی ست

(কালামে কেহ্ মুহতাজে মা'না বাশাদ লা-ইয়ানীস্ত)

'যে উক্তি ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী, তাহা নিরর্থক বটে।'

হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে হক তা'আলার সম্পর্কের কথা যে ব্যক্তি জানে, সে ক্বিয়ামতের বর্ণনার মধ্যস্থলে উপরোক্ত আলোচনার যথার্থতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারে। বন্ধুগণ, পিতা যেমন পুত্রকে খাদ্যরত অবস্থায় কু-সংসর্গে চলিতে নিষেধ করিতেছিল এবং কু-সংসর্গের কুফল বর্ণনা করিতেছিল; কিন্তু মধ্যস্থলে পুত্রকে বড় লোক্‌মা লইতে দেখিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিল যে, বড় লোক্‌মা লওয়া অন্যায়, তেমনি হক তা'আলাও আয়াতে হযরত (দঃ)-কে এমনিভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

বাহ্যতঃ লোক্‌মার আলোচনা একেবারেই পূর্বাপর সম্বন্ধহীন ; কিন্তু যে পিতা হইয়াছে সে ভালভাবেই জানে যে, উপদেশের মধ্যস্থলে লোক্‌মার কথা বলার কারণ হইল এই যে, ছেলেকে বড় লোক্‌মা লইতে দেখিয়া পিতা মহব্বতের আতিশয্যে মধ্যস্থলেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আয়াতেও হক তা'আলা কিয়ামতের আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু হুযুর (দঃ) মনে করিলেন যে, আয়াতগুলি যাহাতে ভুলিয়া না যাই ; তজ্জন্য এগুলি তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিয়া লই। এই কারণে খোদা তা'আলা মহব্বতের আতিশয্যে মধ্যস্থলেই বলিয়া দিলেন যে, আপনি মুখস্থ করার জন্য চিন্তা করিবেন না। আমিই ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শুনিতে থাকুন। কোরআন শরীফ আপনাআপনি আপনার অন্তরে সংরক্ষিত হইয়া যাইবে। অতএব, বুঝা গেল যে, এই বিষয়টি মধ্যস্থলে বর্ণনা করার একমাত্র কারণ হইল মহব্বতের আতিশয্য। তদনুযায়ী এখানে মোটেই পূর্বাপর সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বহু সম্বন্ধ হইতে উত্তম ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এস্থলে একটি স্বতন্ত্র সম্বন্ধও রহিয়াছে। যেস্থলে সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, সেখানেও সম্বন্ধ থাকা খোদা তা'আলার কালামেরই অলৌকিক ক্ষমতা বটে। কোরআনের পূর্বাপর সম্বন্ধ সম্পর্কে যেসব পুস্তিকা রচিত হইয়াছে সেগুলি পাঠ করিলে এই আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ জানা যাইবে। আমি নিজেও একখানি স্বরচিত আরবী পুস্তিকায় এবং স্বরচিত উর্দু তফ্‌সীরে এ আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছি। যাহা একটি অতিরিক্ত অনুগ্রহ স্বরূপ, নতুবা এই আয়াতে সম্বন্ধের কোন প্রয়োজনই ছিল না। (১)

এ প্রসঙ্গে কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যখন সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, তখন বর্ণিত সবগুলি সম্বন্ধই মনগড়া। সুতরাং ইহাদের প্রয়োজন কি? (কেননা, পূর্বোল্লেখিত আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, মহব্বতের আতিশয্য

---

(১) 'সবকুল গায়াত' নামক পুস্তিকায় পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত আয়াতের সম্বন্ধ প্রথমতঃ উহাই বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহব্বতের আতিশয্যে হুযুর (দঃ)-কে মধ্যস্থলেই জিহ্বা সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, সম্ভবতঃ তখন তিনি নিজেও পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সম্বন্ধটি কাফাল হইতে নকল করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই যে, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ হুযুর (দঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় নাই ; বরং ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে ইহা বলা হইবে যে, আমলনামা পাঠে এত তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তোমার সকল আ'মলই একে একে বলিয়া দিতেছি। তুমি শুধু দেখিতে থাক এবং আমার বক্তব্য শুনিতে থাক। তফ্‌সীরে যে সম্বন্ধটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে হুযুর (দঃ)কেই সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আয়াত হইতে জানা গিয়াছে যে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তাহার ※

হইলে পূর্বাপর সম্পর্কের কোন প্রয়োজন হয় না ; বরং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলিতে হয়। সম্বন্ধ হউক বা না হউক। ক্বোরআনের বর্ণনাভঙ্গীও এবম্বিধ। অতএব, ক্বোরআনের আয়াত সমূহে যেসব সম্বন্ধ বর্ণনা করা হইবে, তাহা মনগড়া না হইয়া পারে না। কেননা, বক্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্যই রাখেন নাই।) এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদিও ক্বোরআনে রচনার ভঙ্গী অবলম্বন করা হয় নাই বরং মহব্বতের ভঙ্গী অবলম্বিত হইয়াছে, তাসত্ত্বেও পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কাজেই তফ্সীকারদের বর্ণিত সম্বন্ধসমূহ মনগড়া নহে।

ক্বোরআনে সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখার দলীল এই যে, হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, ক্বোরআন নাযিল হওয়ার যে ধারাবাহিকতা ছিল, তাহা বর্তমানের ক্বোরআন তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ, ঘটনা পরম্পরায় ক্বোরআন নাযিল হইয়াছে। যখনই কোন ঘটনা সংঘঠিত হইয়াছে, তখনই সেই অনুযায়ী একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা ঘটনা পরম্পরার সহিত সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে তেলাওয়াতের মধ্যেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিলে বাস্তবিকই সম্বন্ধ বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা স্বয়ং হক তা'আলা বদলাইয়া দিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হইত, তখনই জিব্রায়ীল (আঃ) খোদার নির্দেশে হুযূর (দঃ)কে বলিতেন যে, এই আয়াত যেমন উদাহরণত সূরায়ে বাকারার অমুক আয়াতের পর স্থাপন করুন এই আয়াত অমুক আয়াতের পর এবং এই আয়াত অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর। অতএব, বুঝা গেল যে, বর্তমান ক্বোরআনের ধারাবাহিকতা নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা হইতে ভিন্ন। হক তা'আলাই এই ধারাবাহিকতা

---

* আ'মল সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হইবে। আ'মল বলিয়া দিলেই মানুষ তাহা জানিতে পারিবে- শুধু তাহাই নহে ; বরং মানুষ নিজেও তাহার নফসের অবস্থাদি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল হইবে। ইহা হইতে দুইটি বিষয়বস্তু জানা গেল। ১। আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত এবং ২। হক তা'আলার রীতি এই যে, কোন হেকমত বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে সৃষ্ট জীবের মস্তিষ্কে বহু বিস্মৃত জ্ঞান হঠাৎ উপস্থিত করিয়া দেন—যদিও এইসব বিস্মৃত জ্ঞান হঠাৎ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া যাওয়া সাধারণ নিয়মের খেলাফ। ক্বিয়ামতের দিন এইরূপ করা হইবে। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল হওয়ার সময় আপনি তাহা স্মরণ রাখার চিন্তা করেন কেন ? আপনি বরং নিশ্চিত হইয়া ওহী শুনিতে থাকুন। আমি ক্বোরআন আপনার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব এবং আপনি যখনই ক্বোরআন পড়িতে চাহিবেন, তখনই আপনার মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিব।

রাখিয়াছেন। অতএব, যে আয়াতকে অন্য আয়াতের সহিত মিলানো হইয়াছে, উভয়টির মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক অবশ্যই আছে। কেননা, এরূপ না হইলে নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা একেবারেই নিরর্থক হইবে। কাজেই কোরআন বিস্ময়কর ও নযীরবিহীন কালাম বটে! পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ইহাতে পুরাপুরি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই দলীলের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা খোদার কালামে স্বতন্ত্র সম্বন্ধের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। যদি কোন সম্বন্ধ নাও থাকিত, তবুও কোরআন সম্বন্ধে আপত্তি তোলার অবকাশ ছিল না। কারণ, তখন আমরা এই উত্তর দিতে পারিতাম যে, কোরআনে রচনার ভঙ্গী অবলম্বন করা হয় নাই; বরং মহব্বতের সহিত উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী অবলম্বিত হইয়াছে।

॥ কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী ॥

এই প্রকার বর্ণনাভঙ্গীতে সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলা হয়। ইহার সম্বন্ধহীনতা অনেক সম্বন্ধপূর্ণ কথা হইতে উত্তম হইয়া থাকে। এই মহব্বতের কারণেই কোরআনের প্রত্যেকটি শিক্ষাই কামেল বা সম্পূর্ণ। ইহাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রত্যেকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণেই হক তা'আলা প্রত্যেকটি সূরায় অনেকগুলি আহ্‌কাম বর্ণনা করিয়া পরিশেষে এমন কথা বলিয়া দেন—যাহা সবগুলিকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখে এবং যাহা আ'মলে আনিলে সমস্ত আহ্‌কাম সহজ হইয়া যায়। যেমতে সূরায়ে-আলে এমরানে বিভিন্ন অধ্যায়ের আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর কথা শেষ করিয়া দেন নাই; বরং পরিশেষে সর্বমোট হিসাবে এমন একটি কথা বলিয়া দিয়াছেন যাহা সবগুলিকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা বিস্তারিত হিসাবের পর মোট ফলের ন্যায়। বিস্তারিত হিসাবের পর যদিও মোট বাহির করার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু মোট বাহির করিয়া দিলে সম্পূর্ণ বিষয়টি এক প্রকারে আয়ত্তাধীনে চলিয়া আসে। কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব স্মরণ রাখা কঠিন; কিন্তু মোট স্মরণ রাখা কঠিন নহে।

তদ্রূপ সূরা আলে-এমরানের এই শেষ আয়াত পূর্ণ সূরার মোট স্বরূপ। ইহাতে সংক্ষেপে সূরায় সমস্ত আহ্‌কাম সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু দেখিতে দুই তিনটি কথা মাত্র। এই দুই তিনটি কথার উপর আ'মল করা খুবই সহজ। খোদাতা'আলা সকল স্থানেই এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখিয়াছেন। কোরআন ব্যতীত অন্য কোন কালামেই এইরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী বিদ্যমান নাই।

ইহা এরূপ, যেমন মেহেরবান পিতা বিস্তারিত উপদেশ দানের পর পরিশেষে একটি সূক্ষ্ম নীতি বলিয়া দেন। মহব্বত হইতেই ইহার উৎপত্তি। পিতা মনে করে

যে, ছেলে হয়তো সমস্ত কথা স্মরণ রাখিতে পারিবে না কিংবা এতগুলি কথা শুনিয়া ঘাব্‌ড়াইয়া যাইবে। তাই শেষে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট বলিয়া দেয় যে, ইহা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্যকে মহব্বত শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, তাঁহার কালামে মহব্বতের প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা হইবে না কেন ?

মোটকথা, সূরার এই শেষ আয়াতে ঐ কথাই বর্ণিত হইয়াছে যাহা পূর্ণ সূরায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ দ্ব্যর্থ বোধকতা নাই যে, ইহার সঠিক অর্থ বুঝা যাইবে না ; বরং পূর্ণ সূরার বিষয়বস্তু এই আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখিত হইয়াছে। (অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে 'ইজায' বলা হইয়া থাকে।) অর্থাৎ, অল্প কয়েক শব্দ দ্বারা একটি বড় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা বিস্তারিত বর্ণনাটি বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাকে 'সংক্ষেপ' এই জন্য বলা হইয়াছে যে, এই আয়াতে এক প্রকার সমষ্টিগত অর্থ (کلیة) রহিয়াছে। সমষ্টি (کلیاة)-এর মধ্যে যদিও সমস্ত جزئی উহার অন্তর্ভুক্ত থাকে ; কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্তভাবে থাকে —বিস্তারিতভাবে নহে।

ইহার একটি উদাহরণ বুঝুন। কেহ হুযূর (দঃ)-এর নিকট আরয করিল :

ان شرائع الاسلام قد كثرت على فقل لى قولا احفظه و اخذبه (او كما قال)

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখিতেছি যে, ইসলামের আহ্‌কাম অনেক বেশী। অতএব, আমাকে এমন একটি কথা বলিয়া দিন—যাহা আমি স্মরণ করিয়া তদনুযায়ী আ'মল করিতে পারি। হুযূর (দঃ) বলিলেন : قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ, তুমি বল যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। এরপর স্থির ও অটল হইয়া থাক।' হুযূর (দঃ) এই একটিমাত্র বাক্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শরীয়ত বলিয়া দিয়াছেন। অথচ প্রশ্নকারী শরীয়তের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করে নাই। অতএব, হুযূর (দঃ) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ বাক্যাংশের মধ্যে সংক্ষেপে সমস্ত বিশ্বাস মূলক বিষয়সমূহ বলিয়া দিয়াছেন। এরপর ثُمَّ اسْتَقِمْ বাক্যাংশের মধ্যে আমল-সমূহে স্থৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেনদেন, সামাজিকতা ইত্যাদি সমস্তই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (কেননা, স্থিরতা ও সমতা শরীয়তের আ'মলসমূহের বিশেষ গুণ। এগুলি লংঘন করিলে আ'মলে সমতা থাকিবে না।) সবস্থানেই এবং সব আ'মলেই স্থিরতার প্রয়োজন। (এভাবে হুযূর (দঃ) প্রশ্নকারীকে এমন কথা বলিয়া দিয়াছেন—যদ্দ্বারা সে প্রত্যেক আ'মলের জায়েয ও না-জায়েয সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। যে আ'মলে স্থিরতা ও সমতা দেখিবে, উহা শরীয়তের আ'মল বলিয়া পরিগনিত হইবে এবং যেখানে এই বৈশিষ্ট্য থাকিবে না উহা শরীয়ত-বহির্ভূত বিষয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।)

প্রশ্নকারীর উক্তির এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, হুযূর, আমাকে এমন কথা বলিয়া দিন যে, আমি সব আহ্‌কাম ভুলিয়া গিয়া কেবল উহাই স্মরণ রাখিব ; বরং

তাহার উক্তির সঠিক অর্থ এই যে, আমাকে এমন একটি কথা বলিয়া দিন যে, আমি শরীয়তের সমস্ত কাজকর্মে উহার প্রতি খেয়াল রাখিব এবং উহা দ্বারা কোন্ নির্দেশটি শরীয়তের এবং কোন্‌টি শরীয়তের নহে—তাহা জানিতে পারিব। হুযূর (দঃ) এই অর্থ অনুযায়ীই এমন একটি কথা বলিয়া দিয়াছেন—যাহা শরীয়তের মূল্ আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ খোদার মহত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং কাজে-কর্মে ও হালে অটল থাকে।

ইহা জানা কথা যে, যে কোন শাস্ত্রের মওযূ তথা আলোচ্য বিষয় জানা হইয়া গেলে ঐ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুসমূহ অন্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুসমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় জানিয়া ফেলে, সে যেন সংক্ষেপে ঐ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়বস্তু জানিয়া ফেলে। কেননা, এরপর যেকোন বিষয়বস্তু তাহার সম্মুখে আসিবে, সে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু কি না।

এই কারণে প্রত্যেক শাস্ত্রেই আলোচ্যবিষয় নির্ধারিত করা হয়। উদাহরণতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু সংখ্যক বিক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু রহিয়াছে। এগুলি আয়ত্তে আনা সুকঠিন। যাবতীয় মাসায়েল মুখস্থ করিলেও সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পার্থক্য করা কঠিন যে, কোন্ বিষয়টি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি নহে। উদাহরণতঃ এতটুকু উচ্চ দালানের ভিত্তি কি পরিমাণ গভীর ও প্রশস্ত হওয়া দরকার—এই বিষয়টি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কি না, তাহা শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়বস্তু পড়িয়া লইলেই জানা যাইবে না। কেননা, কিতাবাদিতে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণিত হয় নাই—ইহা সম্ভবও নহে। অতএব, যে সব খুঁটিনাটি বিষয় কিতাবে বর্ণিত হয় নাই কিংবা আমরা স্মরণ রাখিতে পারি নাই, সেগুলি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত কি না, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারিব ? ইহা জানার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি আলোচ্য বিষয় ঠিক করিয়াছেন। তাহা এই যে ঃ

بَدَنُ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ

'অর্থাৎ রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়া মানব দেহ হইল চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।' এই আলোচ্য বিষয়টি জানা হইয়া গেলে চিকিৎসা শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয়বস্তু হইতে পৃথক হইয়া যাইবে।

এরপর যদি কেহ শুনে যে, বনফ্‌শা (এক প্রকার ঔষধের উপাদান) সর্দিতে উপকার করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিবে যে, এই বিষয়বস্তুটি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে যদি শুনে যে, এতটুকু গভীর ভিত হইলে এই পরিমাণ উচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়, তবে শোনামাত্রই বুঝিয়া ফেলিবে যে, ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নহে। তদ্রূপ যদি শুনে যে, মানব দেহ অনিত্য, তবে বুঝিয়া ফেলিবে যে, ইহাও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় নহে। কারণ ইহাতে যদিও মানব দেহের একটি

অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু রোগ ও সুস্থতার সহিত এই অবস্থাটির কোন সম্পর্ক নাই। মানব দেহ যে কোন অবস্থাতেই চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে ; বরং শুধু সুস্থতা ও রোগের পরিপ্রেক্ষিতেই। মোটকথা, যে ব্যক্তির আলোচ্য বিষয় জানা থাকিবে, সে এই সব বিষয়েই উহার প্রতি খেয়াল রাখিবে।

আলোচ্য হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রশ্নকারীকে শরীয়তের আলোচ্য বিষয় বলিয়া দিয়াছেন। ইহা স্মরণ থাকিলে শরীয়তের সমস্ত বিষয়বস্তুই সংক্ষেপে তাহার স্মরণ থাকিবে। ফলে সে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই জানিতে পারিবে যে, শরীয়তের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে কি না। কেননা. সে সব বিষয়েই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

তেমনি হক তা'আলাও সূরায়ে আলে-এমরানের সমস্ত আহ্কাম বর্ণনা করার পর পরিশেষে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট বলিয়া দিয়াছেন। ইহা যেন সমস্ত সূরার আলোচ্য বিষয়। সবগুলি আহ্কামের সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। হক তা'আলা বলেন ঃ

يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله

لعلكم تفلحون ○

'হে বিশ্বাসীগণ,! (শরীয়তের আমলসমূহে) ধৈর্যধারণ কর। (যখন কাফেরদের সহিত মোকাবিলা হয়, তখন) মোকাবিলায় ছবর কর। (মোকাবিলার সম্ভাবনা থাকার সময়) মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় খোদা-তা'আলাকে ভয় করিতে থাক। (শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করিও না।)—যাহাতে তোমরা পুরাপুরি কামিয়াব হইতে পার।' (এইসব আমল যত্ন সহকারে করিলে আখেরাতের কামিয়াবী সুনিশ্চিত। এমন কি, ইহার ফলে দুনিয়াতেও অধিকাংশ সময় কামিয়াবী হইয়া থাকে।)

এই আয়াতে যেসব কথা উল্লেখিত হইয়াছে, সূরার সমস্ত আহ্কামের সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। এমন কি, আমি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, শরীয়তের যাবতীয় আহ্কামের সহিতই ইহাদের নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, জাগতিক জীবিকা নির্বাহের সমস্ত বিষয়ের সহিতও ইহাদের সম্পর্ক আছে। ঘটনাক্রমে এই বিষয়টিও আমার নিকট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে জাগতিক বিষয়াদির সহিত সম্পর্ক শরীয়তের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় হিসাবে নহে ; বরং এই কারণে যে, শরীয়ত যেমন আমাদের আখেরাতের বিষয়সমূহে পূর্ণতা দান করে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষয়সমূহেও

পূর্ণতা দান করে। তাই শরীয়তের আহ্‌কাম এইভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, উহা প্রকারান্তরে জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলকেও অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে।

॥ জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিক্রিয়া ॥

আজকাল শরীয়তের নির্দেশসমূহে জাগতিক মঙ্গল বর্ণনাকারীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদল মনে করে যে, দুনিয়ার মঙ্গলই আসল ও মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহার উপরই শরীয়তের নির্দেশাবলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহারা প্রথমে জাগতিক মঙ্গল লাভের প্রতি উৎসাহ দান করে। এরপর ইহার সমর্থনে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করে। তাহাদের এই বক্তৃতা ভঙ্গী দেখিয়া অনেকেই ধোকায় পড়িয়া যায় যে, তাহারাও ধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া তাহারা ধর্মকে মিটাইয়া দেওয়ার কারসাজিতে লিপ্ত রহিয়াছে।

আজকাল নিম্নরূপ বিষয়বস্তু প্রচুর পরিমাণে বক্তৃতায় ও পত্র পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ পারস্পরিক একতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীয়তও ইহাকে খুবই গুরুত্ব দিয়াছে। এই কারণেই খোদা তা'আলা জমাতের সহিত পাঞ্জেগানা নামায পড়া ওয়াজেব করিয়াছেন—যাহাতে প্রতিটি মহল্লার মুসলমানগণ কমপক্ষে দিনে পাঁচবার একত্রে মেলামেশা করিতে পারে। এরপর সপ্তাহে একবার সমস্ত এলাকার লোকদিগকে একত্রিত করার জন্য জুমআর নামায ফরয করা হইয়াছে—যাহাতে এলাকার সমস্ত মুসলমান পরস্পরকে চিনিতে পারে এবং একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ পায়। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক মুসলমান শহর হইতে দূরে বসবাস করে। তাহাদিগকে একত্রিত করার জন্য দুই ঈদের নামাযের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—যাহাতে বৎসরে দুইবার করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য মুসলমানদের সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। এরপর বিশ্বের মুসলমানদিগকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে – যাহাতে সারাজীবনে কমপক্ষে একবার সকল এলাকার মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া পারস্পরিক মত বিনিময় করিতে পারে।

আজকাল এই বিষয়বস্তুটি খুব গর্বের সহিত বর্ণনা করা হয়। অনেক সরল লোক এই ধরণের বক্তাদিগকে শরীয়তের রহস্যবিদ মনে করে আর ভাবে যে, ব্যস, এই ব্যক্তিই শরীঅতের রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা পরস্পর বলাবলিও করে যে, দেখুন জ্ঞান ইহাকেই বলে। একটি কোরআন হাদীস ভিত্তিক বিষয়কে কিরূপে যুক্তির মানদণ্ডে খাড়া করিয়া দেখাইয়া দিলেন এবং শরীয়তের রহস্যকে যুগোপযোগী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু খোদার কসম, ইহা আসলে এইরূপঃ

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

(চুঁ নাদীদান্দ হাকীকত রাহ আফ্‌সানা যাদান্দ)

'যখন তাহারা আসল স্বরূপ দেখিতে পায় না, তখন কেচ্ছাকাহিনীর পথ ধরে।

ইহা কোন রহস্যও নহে এবং যে ইহা বুঝে তাহারও কোন বাহাদুরী নাই ; বরং বক্তৃতা-ভঙ্গীটি হলাহলপূর্ণ। যে ইহা জানিতে পারিবে, তাহার বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, এই ধরণের বক্তারা শরীয়তের রহস্য বর্ণনা করিয়া শরীয়ত-প্রীতি পরিচয় দিতেছে না ; বরং শরীয়তের সহিত শত্রুতা করিতেছে। তাহারা ইসলামের রক্ষক নহে ; বরং ইসলামের অজ্ঞান হিতাকাঙ্ক্ষী।

دوستی بے خرد چوں دشمنی ست

(দুস্তী বেখিরদ চুঁ দুশ্‌মনীস্ত)

"জ্ঞানশূন্য বন্ধুত্ব শত্রুতারই শামিল।"

উপরোক্ত বক্তৃতায় কি বিষ রহিয়াছে—এক্ষণে আমি তাহাই বর্ণনা করিব। উক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, একতাই আসল বস্তু। পাঞ্জেগানা নামাযের জমাআত, জুমুআ, দুই ঈদের নামায হজ্জ ইত্যাদি এই একতা সৃষ্টি করার অবলম্বন মাত্র। ইহাতে কোন কোন লোকের মধ্যে এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যে, তাহারা শরীয়তের এইসব আহ্‌কামকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিবে না। কোন সময় অন্য কোন উপায়ে একতা অর্জন করা সম্ভবপর হইলে তাহারা খুব সহজেই জমাআত ও নামায উভয়টি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। কেননা, তাহাদের ধারণায় এইসব আহ্‌কাম একতা অর্জনের জন্যই নির্ধারিত হইয়াছিল। ক্লাবে এবং থিয়েটারে একত্রিত হইলেও এই একতা অর্জিত হইতে পারে। সেখানে আরও বেশী আরাম আছে। গা ভাসাইয়া আরাম-কেদারায় উপবেশন করা যায় এবং গদী বালিশ ইত্যাদিতে স্থান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহারা মস্‌জিদে আসিয়া ওযূ, নামাযের কষ্ট কেন ভোগ করিবে ? উপরোক্ত বক্তৃতার এই ক্ষতির দিকটি আজকাল প্রকাশ পাইতেছে।

জনৈক ব্যক্তির একটি উক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে বলে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওযূর প্রয়োজন ছিল—আজকাল নাই। কেননা, তখন আরবের বেদুইনগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত না। জঙ্গলে কাজ-কর্ম করার দরুন তাহারা ধূলায় রঞ্জিত হইয়া বাড়ী ফিরিত। কাজেই তাহাদিগকে ওযূ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আজকাল আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি। সর্বদাই মোজা এবং হাতমোজা পরিধান করিয়া থাকি। ফলে হাত-পায়ে ধূলা লাগিতে পারে না। অতএব, আমাদের পক্ষে ওযূ করার প্রয়োজন নাই।

ইহা পূর্বোক্ত রহস্য বর্ণনা করারই পরিণাম। এখনই সকলেই এই প্রকার মঙ্গলকে আসল উদ্দেশ্য মনে করিতে শুরু করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি যদি নামাযও ত্যাগ করিয়া বসে, তাহাও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। সে-ও বলিতে পারিবে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের প্রয়োজন ছিল। কেননা, অন্ধকার যুগ হওয়ার

দরুন তখন মানুষ যারপরনাই গর্বিত ও অবাধ্য ছিল। তাহাদিগকে সুসভ্য বানাইবার নিমিত্ত বিনয় ও নম্রতাবোধক নামায প্রবর্তন করা হইয়াছিল। আজকাল আমরা সুশিক্ষিত। শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে। এমতাবস্থায় নামাযের প্রয়োজন কি ?

তদ্রূপ জনৈক মুসলমান ব্যক্তি বিলাত হইতে আমার নিকট পত্র লিখে যে, কোরবানী শরীয়তের উদ্দেশ্য নহে। এক দিনে এতগুলি জন্তু যবেহ করা যে, মানুষ উহাদের গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করিতে পারে না—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার বৈ কিছুই নহে। কোরবানীর জন্তুর গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করা যায় না বলিয়াই মক্কার মিনা নামক স্থানে কোরবানী করার পর জীবদিগকে মাঠের গর্তে ফেলিয়া দেয়। (১) সর্বনাশ, আজকাল খোদার উপরও যুক্তির রাজত্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফ্‌সোস! আমি বলি, যদি বিচারক কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়, আর অপরাধী বলে যে, এই শাস্তি সম্পূর্ণ বিবেক-বহির্ভূত, তবে বিচারক তাহার কথা শুনিবে কি ? কখনই নহে; বরং সে পরিষ্কার বলিয়া দিবে যে, আইনের উপর তোমার বিবেকের রাজত্ব চলিবে না; বরং বিবেকের উপর আইনের রাজত্ব রহিয়াছে। বিচারকের এই উক্তি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজকালকার মুসলমান আপন বুদ্ধির উপর খোদায়ী আইনের রাজত্ব স্বীকার করে না; বরং তাহারা উহাকে আপন বুদ্ধির অধীন করিতে চায়। পত্রলেখকের উক্তি মানিয়া লইয়া এই উত্তর দেওয়া হইল, নতুবা খোদার কানুন পুরাপুরিই যুক্তিসঙ্গত। তবে শর্ত এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থ হইতে হইবে। প্রতেক ব্যক্তির আপন বুদ্ধি দ্বারা খোদায়ী আইনের রহস্য বুঝিয়া ফেলিবে—ইহা মোটেই জরুরী নহে। জিজ্ঞাসা করি, পার্লামেন্টের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেসব আইন পাশ করেন, যে কোন সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান কি উহাদের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে ? কখনই নহে; বরং উহাদের মঙ্গলামঙ্গল ও রহস্য বিশেষ শ্রেণীর অফিসারগণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

---

(১) পত্রলেখকের মতে এত বেশী গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করা যায় না। তাই কোরবানীর পর জন্তুগুলি গর্তে পুঁতিয়া ফেলা হয়। পুঁতিয়া ফেলার এই কারণটি নিতান্তই ভ্রান্তিপ্রসূত। কেননা, হজ্জের মওসুমে যেসব লোক তথায় জমায়েত হয়, তাহারা সকলেই মালদার হয় না এবং সকলেই কোরবানী করে না; বরং হাজীদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। কাজেই আমরা দাবী করিয়া বলিতে পারি যে, মিনার কোরবানীর সমস্ত গোশ্‌ত হাজী এবং বুদ্দুদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলে তাহা সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে না; বরং বহু লোকই বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। বস্তুতঃ ডাক্তারদের পরামর্শ ক্রমেই মিনায় কোরবানীর গোশ্‌ত গর্তে পুঁতিয়া ফেলা হয়। অতএব, যেসব ডাক্তারের পরামর্শক্রমে এরূপ করা হয়, তাহারাই এই অযৌক্তিক কাজের উত্তর দিতে বাধ্য।

এমতাবস্থায় খোদায়ী আইনের মঙ্গলামঙ্গল ও রহস্য প্রত্যেকে আপন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে কেন ? এস্থলে কেন বলা হয় না যে, খোদার কানুন বিবেক-বহির্ভূত নহে ? তবে আমাদের বিবেক উহা বুঝিতে অক্ষম। বিশেষ বিশেষ লোকগণই ইহা বুঝিতে সক্ষম। যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, কোন একটি আইনের রহস্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরও বোধগম্য নহে, তবুও কানুন পরিবর্তন করার অধিকার কাহারও নাই। কেননা, আইনের উপর বিবেকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে ; বরং বিবেক আইনের অধীন ও অনুগামী।

মোটকথা, উপরোক্ত ব্যক্তি বিলাত হইতে আমার নিকট পত্র লিখিলেন যে, স্বয়ং কোরবানী শরীয়তের উদ্দেশ্য নহে ; বরং আসল উদ্দেশ্য হইল দরিদ্রদের সাহায্য করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের নিকট নগদ টাকা-পয়সা কম ছিল—গৃহপালিত পশু ছিল বেশী। তাই পশু যবেহ করিয়া গরীবদিগকে গোশ্‌ত দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়। আজকাল নগদ টাকা-পয়সা পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। এতএব, কোরবানীর পরিবর্তে এখন নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য করা উচিত।

(এই ব্যক্তি দরিদ্রদের সাহায্যকে কোরবানীর হেকমত মনে করিয়া দেখিল যে, এই হেকমত অন্য উপায়েও সহজে লাভ হইতে পারে। কাজেই সে কোরবানী ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়া বসিল। অথচ এই হেকমতটি উদ্দেশ্যই নহে ; বরং আদেশ পালনই হইল উদ্দেশ্য। এই হেকমতটি উদ্দেশ্য হইলে জীবিত জন্তু গরীবদিগকে দান করিয়া দেওয়ার বেলায় ওয়াজেব আদায় না হওয়ার কোন কারণ থাকিত না। প্রাথমিক যুগে নগদ টাকা-পয়সা ও খাদ্যশস্য কম ছিল এবং পশু বেশী ছিল, ফলে পশু দ্বারাই দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রথা চালু করা হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে জন্তু যবেহ করিয়া দরিদ্রদিগকে গোশ্‌ত দিলেই ওয়াজেব আদায় হইবে, জীবিত দিলে নহে—ইহার অর্থ কি ? আরও জিজ্ঞাসা করি, প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ কি কখনই নগদ টাকা পয়সার অধিকারী হন নাই ? আসলে ইহা ভ্রান্তি বৈ কিছুট নহে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখুন, ছাহাবিগণ যখন রোম ও পারস্য সম্রাটের ধন-ভাণ্ডার অধিকার করেন, তখন তাহাদের নিকট এত বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল যে, আজকাল উহার এক দশমাংশও নাই। এমতাবস্থায় উপরোক্ত ব্যক্তি বিলাতে বসিয়া যে রহস্যটি আবিষ্কার করিলেন, তাহা ছাহাবীদের চিন্তায় আসিল না কেন ? তাঁহারা কোরবানীর পরিবর্তে নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য করার পথ বাছিয়া লইলেন না কেন ?

তাছাড়া এই হেকমতটি যদি কোরবানীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তবে তদনুযায়ী কোরবানীর গোশ্‌তের একটি অংশ দান করিয়া দেওয়া অবশ্যই ওয়াজেব হইত। অথচ

শরীয়তে এমন কোন নির্দেশ নাই ; বরং কেহ যদি কোরবানীর সমস্ত গোশ্‌ত একাই রাখিয়া দেয় এবং গরীবদিগকে বিন্দুমাত্রও না দেয়, তবুও কোরবানীতে কোনরূপ ত্রুটি দেখা দেয় না। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দরিদ্রদের সাহায্য করা কোরবানীর মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; বরং মুখ্য উদ্দেশ্য অন্যকিছু। এই প্রকার রহস্য বর্ণনার কু-ফল যে কি পর্যন্ত গড়ায়, তাহা আপনি দেখিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আবিষ্কৃত হেকমতের উপরই আহ্‌কামকে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করিতে থাকে।)

এই ধারণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বালকান যুদ্ধের চাঁদার বেলায় এই কু-মতলব মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। সাহসী লোকগণ ফৎওয়া দিয়া বসিলেন (খোদা তাহাদিগকে হেদায়ত করুন) যে, মুসলমানগণ এবৎসর কোরবানী বন্ধ রাখিয়া উহার মূল্য বালকান যুদ্ধের চাঁদা হিসাবে দান করিলে তাহাই উত্তম হইবে। এইভাবেও কোরবানী আদায় হইয়া যাইবে। কেননা, কোরবানীর উদ্দেশ্য হইল গরীব মুসলমানদের সাহায্য করা। এক্ষণে নগদ টাকা সাহায্য করিলে তুরস্কবাসীদের বেশী উপকার হইবে।

জনৈক সাধারণ ব্যক্তি এই ফৎওয়ার চমৎকার জওয়াব দিয়াছে। সে বলিয়াছে, হুযুর (দঃ)-এর যমানায়ও যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তখনও গাযীদিগকে নগদ টাকা দ্বারা সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হুযুর (দঃ) কি কখনও এরূপ ফৎওয়া জারী করিয়াছিলেন যে, এবৎসর মুসলমানগণ কোরবানী বন্ধ রাখিয়া নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা যুদ্ধের সাহায্য করুক ? এই ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিল না।

কোরবানী সম্বন্ধে যখন কিছু সংখ্যক লোকের মাথায় কু-মতলব গজাইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল, তখন অন্যান্য আহ্‌কামের বেলায়ও এরূপ হইতে পারিবে। অন্যান্য আহ্‌কামের হেক্‌মত লইয়া আজকাল চটকদার প্রবন্ধাদি লিখা হয়। উহাদের প্রতিক্রিয়াও এই হইবে যে, মানুষ এইসব মঙ্গল ও হেকমতকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করিতে থাকিবে। ফলে যখন ঐ হেকমত অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হইতে দেখিবে তখন বিনা দ্বিধায় শরীয়তের আহ্‌কাম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে।

ইহার আরও একটি নযীর মনে পড়িল। সকলেই স্বীকার করে যে, একতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কিছু আঘাত খাওয়ার পর ইহাও সকলের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ধর্মের পাবন্দী ছাড়া একতা লাভ করা যায় না। ফলে আজকাল প্রায় সকল বক্তৃতার মধ্যেই ধর্মের পাবন্দী করার প্রতি খুব জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে, ধর্মের পাবন্দী ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হইতে পারে না এবং একতা ব্যতীত উন্নতি সম্ভবপর নহে। বাহ্যতঃ এই বাক্যটি খুবই আনন্দদায়ক। কিন্তু ইহাতেও পূর্বোক্ত বিষ লুক্কায়িত আছে। অর্থাৎ আসলে ধর্ম উদ্দেশ্য নহে ; বরং উদ্দেশ্য হইল পারস্পরিক একতা। তবে যেহেতু ধর্ম একতার একটি উপায়, এই কারণে

ধর্মেরও প্রয়োজন আছে। এই ধারণার পরিণাম এই দাঁড়াইবে যে, যতদিন ইসলামের উপর কায়েম থাকিয়া একতা লাভ করার আশা থাকিবে, ততদিন তাহারা ইসলামের উপর কায়েম থাকিবে এবং অপর লোককেও তজ্জন্য উৎসাহ দান করিবে। কিন্তু যখনই এই আশাতরু উৎপাটিত হইয়া যাইবে, তখনই তাহারা ইসলামকে ত্যাগ করিয়া বসিবে।

উদাহরণতঃ মনে করুন, এক সময় মুসলমানদের মধ্যে এত ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, তাহারা ইসলামের উপর কায়েম থাকিয়া একতা বজায় রাখিতে সক্ষম নহে। তখন যদি তাহাদের সম্মুখে এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত হয় যে, অমুক ধর্ম অবলম্বন করিলে একতা লাভ হইবে, তখন তাহারা বিনা দ্বিধায় ইসলাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিবে। কেননা, তাহাদের ধারণায় একতার খাতিরেই ইসলামের প্রয়োজন ছিল, আসল উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, বুঝা গেল যে, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের উপরই আহ্‌কামের ভিত্তি স্থাপন করার পথটি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। ইহার নামও কখনও মুখে আনিবেন না। যাক, যে দলটি জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলকে উপরোক্তরূপ প্রাধান্য দান করে, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইল।

॥ আনুগত্য ও সাফল্য ॥

ধর্মের দ্বারা শুধু পারলৌকিক সাফল্য লাভ হয়, ইহলৌকিক সাফল্য লাভ হয় না—এইরূপ আরও একটি মতবাদ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহাদের মতে ধর্ম দ্বারা ইহলৌকিক মঙ্গল মোটেই লাভ হয় না। প্রথমোক্ত মতবাদ যতদুর ভ্রান্ত, ইহা ততদুর ভ্রান্ত নহে। কোরআন ও হাদীস এই মতবাদের পরিপন্থী না হইলে আমরা ইহা স্বীকার করিয়া নিতাম। কিন্তু কোরআন ও হাদীস এই মতবাদেরও বিরোধিতা করে। কাজেই ইহাও অভ্রান্ত নহে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদা তা'আলার আনুগত্য করিলে দুনিয়ার মঙ্গল এবং আরাম আয়েশও লাভ হয়। খোদা তা'আলার অবাধ্যতা করিলে জাগতিক ক্ষতিও সাধিত হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

'এই বস্তীর অধিবাসীরা ঈমান আনিলে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করিলে আমি তাহাদের উপর আকাশ এবং জমিনের বরকত খুলিয়া দিতাম কিন্তু তাহারা মিথ্যারোপ করিয়াছে। কাজেই তাহাদের কৃতকর্মের দরুন আমি তাহাদের পাকড়াও করিলাম।'

অন্যত্র আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও নাছারা) দের সম্বন্ধে বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ○

'ইহুদী ও নাছারা জাতি তৌরীত, ইঞ্জিল এবং যে কিতাব (কোরআন) আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার উপর পূর্ণরূপে আমল করিলে (এবং হুযূর [দঃ]কে অনুসরণ করার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার অনুসরণ করিলে) তাহারা উপর হইতে (অর্থাৎ আকাশ হইতে) জীবিকা লাভ করিত এবং পায়ের নীচ হইতেও (অর্থাৎ, জমিন হইতে)। অন্যত্র এরশাদ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ○

"তোমরা যেসব বিপদাপদে পতিত হও, তাহা তোমাদের কর্মের ফলেই। হক তা'আলা অনেককিছু মাফ করিয়া দেন।"

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আনুগত্য করিলে ইহলোকেও সাফল্য লাভ হয় এবং অবাধ্যতা করিলে ইহলৌকিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, আমরা উপরোক্ত মতবাদও স্বীকার করিতে পারি না।

এখন শ্রোতাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যাহারা শরীয়তের আহ্‌কামে দুনিয়ার মঙ্গলের কথা বলে, তাহাদের মতবাদও ভ্রান্ত বলা হইল এবং যাহারা বলে না, তাহাদের মতবাদও ভ্রান্ত বলা হইল। কিন্তু উভয়টি কিরূপে ভ্রান্ত হইতে পারে ? ইহাদের মধ্যে একটি মতবাদ তো শুদ্ধ হওয়া দরকার।

হাঁ, আমি উভয় মতবাদই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একটিও শুদ্ধ নহে ; বরং এই দুইটি ব্যতীত একটি মধ্যবর্তী মতবাদ আছে। উহা শুদ্ধ এবং আমরা উহাতেই বিশ্বাসী। তাহা এই যে, শরীয়তের আহ্‌কাম পালন করিলে দুনিয়ার সাফল্য লাভ হয় ঠিকই ; কিন্তু এই দুনিয়ার সাফল্য উদ্দেশ্য নহে ; বরং শরীয়তের আহ্‌কাম পালন করার আসল উদ্দেশ্য হইল খোদা তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসাবে দুনিয়ার নেয়ামতও হাছিল হইয়া যায়।

উদাহরণতঃ হজ্জ করিতে গেলে বোম্বাই পথে পড়ে ; কিন্তু বোম্বাই হজ্জযাত্রীর উদ্দেশ্য নহে। এখন মনে রাখুন তিনটি মতবাদ হইল। এক ব্যক্তি বলে, বোম্বাই ভ্রমণ করাই হজ্জের উদ্দেশ্য। এইভাবে মুসলমানগণ দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে হজ্জের উদ্দেশ্য হইল কাবা শরীফের যিয়ারত করা এবং বোম্বাই পথেও পড়ে না। এই দুইটি উক্তিই ভ্রান্ত।

এ ব্যাপারে শুদ্ধ মতবাদ তৃতীয়টি। তাহা এই যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে হইল কাবা শরীফের যিয়ারত করা এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পথে বোম্বাই পড়ে; কিন্তু উহা উদ্দেশ্যের অন্তভু ক্ত নহে।

তদ্রূপ দুনিয়ার সাফল্যের সহিত শরীয়তের আহ্কামের এত গভীর সম্পর্ক নাই যে, উহাই উদ্দেশ্য হইবে এবং এত সম্পর্কহীনতাও নাই যে, উহা দ্বারা দুনিয়ার সাফল্য হাছিলই হইবে না। শুদ্ধ মতবাদ এই যে, শরীয়তের আহ্কাম পালন করিলে দুনিয়ার সাফল্য লাভ হয় বটে; কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য নহে। কেহ দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে নেক আ'মল করিলে তাহা নেক আ'মল থাকিবে না। এ সম্পর্কে রাসূলে খোদা (দঃ) বলেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ -

'নিয়ত দ্বারাই আ'মল ভালমন্দ হইয়া থাকে। যে যেরূপ নিয়ত করিবে, সে তদ্রূপ পাইবে। যদি কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলকে লাভ করার জন্য হিজরত (দেশত্যাগ) করে, তবে তাহার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যই হইবে এবং মক্‌বূল হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ দুনিয়া লাভ করার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করে, তবে তাহার হিজরত খোদা ও রাসূলের জন্য হইবে না; বরং যে জিনিসের নিয়ত করিয়াছিল, উহার জন্যই হইবে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নেক আ'মলের মধ্যে দুনিয়াকে উদ্দেশ্য মনে করিলে নেক আ'মল বাকী থাকে না; বরং উহা আ'মলের প্রহসন মাত্র। অতএব, দুনিয়াকে শরীয়তের আ'মলের উদ্দেশ্য বানানো না-জায়েয, কিন্তু খোদার আনুগত্য করিলে পরোক্ষভাবে দুনিয়ার সাফল্যও লাভ হইয়া যায়। আমি উপরে বলিয়াছিলাম যে, আয়াতে হক তা'আলা যেসব ব্যাপক আহ্কাম বর্ণনা করিয়াছেন, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও উহাদের সম্পর্ক আছে—যদিও তাহা উদ্দেশ্য নহে। এতক্ষণে আমার এই বাক্যটির যথার্থতা আপনারা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

॥ আয়াতের অর্থ ও তফ্‌সীর ॥

আয়াতে কি কি আহ্কাম রহিয়াছে, এখন তাহাই বুঝুন। হক তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الْآيَةَ -

'অর্থাৎ হে ইমানদারগণ ধৈর্য ধারণ কর। যে সব আমল অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না, সেগুলিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা اِصْبِرُوْا দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। আরও এক জায়গায় ছবর করার প্রয়োজন হয়। তাহা এই যে, কোন আ'মল করিবার সময় অন্যের তরফ হইতে বাধা দেওয়া হইলে সেখানেও ধৈর্য ধারণ করিতে হয়। صَابِرُوْا দ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, অপরের সহিত মোকাবিলার সময় ছবর কর এবং অটল থাক। এরপর বলা হইয়াছে وَرَابِطُوْا ইহার দুই অর্থ। ১। সীমান্তের হেফাযত কর এবং ২। সদা প্রস্তুত থাক। প্রথম অর্থ বিশেষ আ'মলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় অর্থ সকল আ'মলের বেলায়ই খাটে। এরপর বলেন: وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ইহাতে আশা করা যায় যে, তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে।' এই অনুবাদ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, আয়াতে প্রথমতঃ, ছবরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ছবরের দুইটি স্তর রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 'রিবাত' (সীমান্তের হেফাযত করা কিংবা সদা প্রস্তুত থাকা)-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এরপর তাক্‌ওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ হইল। ইহা ছাড়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ আরও দুইটি বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি শুরুতে উল্লেখিত হইয়াছে এবং অপরটি শেষে। প্রথমটি হইল ঈমান এবং শেষটি হইল সাফল্য। একটি প্রাথমিক বিষয় এবং অপরটি ফলাফল সদৃশ। ইহাদের মধ্যস্থলে চারিটি নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, সর্বমোট ছয়টি বিষয় হইল। ইহাদের মর্যাদা-স্তরে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সফর, গন্তব্য স্থান ও মধ্যবর্তী পথের পার্থক্যের ন্যায়। সফরের একটি আরম্ভ থাকে এবং একটি মধ্যবর্তী পথ। এই পথের দূরত্বের বিভিন্ন স্তর থাকে। সর্বশেষে সফরের একটি ফলাফল অর্থাৎ, গন্তব্য স্থান থাকে।

অতএব, আয়াতের কথাগুলি এমন—যেমন আমরা কাহাকেও বলি, হে মুসাফির! অমুক পথ দিয়া যাইবে, অমুক স্থানে বিশ্রাম করিবে এবং চোর হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এইভাবে তুমি দিল্লী পৌঁছিয়া যাইবে। এই বাক্যগুলি হইতে তিনটি বিষয় জানা গেল। প্রথমতঃ, দিল্লী পৌঁছার জন্য সফরেরও প্রয়োজন। কেননা, মুসাফিরকেই এই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা নির্দেশরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। কারণ সম্বোধিত ব্যক্তি নিজেই সফর আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অতএব, তাহাকে 'হে মুসাফির! সফর আরম্ভ কর' বলা অর্থহীন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা দীর্ঘ করা বৈ কিছুই নহে। তাহাকে মুসাফির বলিয়া সম্বোধন করাতেই সফরের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। ইহা সংক্ষেপে পরিপূর্ণ অর্থবোধক বাক্য। মোটকথা, প্রথমতঃ সফর করা জরুরী। দ্বিতীয়ত, মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করা এবং নিজের হেফাযত করাও জরুরী। তৃতীয়তঃ, গন্তব্য স্থান অর্থাৎ দিল্লী পৌঁছিয়া যাওয়ার ওয়াদা। অতএব, সফর হইল পৌঁছার শর্ত এবং

মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করা, চোর হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি পৌঁছার আহ্কাম। তৃতীয় বিষয়টি হইল ফলাফল। প্রত্যেক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য এই তিনটি বিষয় জরূরী।

ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত লউন। কেহ বলিল, ওহে তালেবে এল্‌ম! রাত্রি জাগরণ করিও এবং পরিশ্রম করিও, তবেই এল্‌ম লাভ হইবে। এই কথা হইতে প্রথমতঃ এল্‌ম তলব করা জরূরী বুঝা গেল। দ্বিতীয়তঃ, রাত্রি জাগরণ করা এবং পরিশ্রম করার আবশ্যকতা জানা গেল। তৃতীয়তঃ, ফলাফলের ওয়াদা রহিয়াছে যে, এরূপ করিলে এল্‌ম হাছিল হইয়া যাইবে। এখানেও এল্‌ম তলব করার বিষয়টি নির্দেশরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি স্বয়ং এল্‌ম তলব করার কাজে মশ্‌গুল রহিয়াছে।

তদ্রূপ আয়াতেও يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলায় ঈমানের আবশ্যকতা বুঝা গেল। কিন্তু ইহাকে নির্দেশরূপে প্রকাশ করিয়া آمِنُوا বলা হয় নাই। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তিরা পূর্ব হইতেই ঈমানদার। তাহাদিগকে آمِنُوا (ঈমান আন) বলার প্রয়োজন নাই। কারণ, আহ্কাম দুই প্রকার। (১) যাহারা ঈমান কবুল করে নাই, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আহ্কাম এবং (২) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আহ্কাম। প্রথম প্রকার আহ্কামে প্রথমেই ঈমানের নির্দেশ থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার আহ্কামে নির্দেশসূচক পদ দ্বারা ঈমানের হুকুম থাকিবে না। যেমন, এল্‌ম তলব করা সম্বন্ধে তালেবে এলমকেও সম্বোধন করা যায় এবং তালেবে এল্‌ম নহে—এরূপ ব্যক্তিকেও সম্বোধন করা যায়। তালেবে এলম নহে—এরূপ ব্যক্তিকে সম্বোধন করার সময় প্রথমেই 'এল্‌ম তলব কর' বলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তালেবে এলমকে সম্বোধন করিলে ইহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। কোরআন শরীফেও এই দুই প্রকারে সম্বোধন করা হইয়াছে।

কোরআনের বিষয়বস্তু নূতন নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি উপরোক্ত উদাহরণগুলি বর্ণনা করিয়াছি। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ বিশেষ বাক্য-পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলি, কোরআনেও তদ্রূপ কালাম করা হয়। তবে কোরআনের শিক্ষা দানের ভঙ্গী এমন অভিনব যে, অন্যের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নহে। কেননা, কোরআনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল দিকের প্রতিই খেয়াল রাখা হয়। সূরা আলে এমরানে যেহেতু বেশীর ভাগ আহ্কাম রহিয়াছে এবং ইহাতে ঈমানদারদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বেশীর ভাগ সম্বোধন করা হইয়াছে—এইজন্য নির্দেশসূচক পদ آمِنُوا বলা হয় নাই। তবে ঈমান যে শর্ত তাহা يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারাই বুঝা গিয়াছে। উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি এই বিষয়টি বুঝাইয়াছি।

আজকাল সাফল্য অর্জনের জন্য ঈমানকেও জরূরী মনে করা হয় না—এই ভ্রান্তি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই আমি উপরোক্ত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমি জাগতিক সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই না। এই সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা এইরূপ :

ما قصۂ سکندر ودارا نہ خواندہ ایم
از ما بجز حکایت مہر ووفا مپرس

(মা কিছ্ছায়ে সেকান্দর ও দারা না খান্দায়ীম
আয্ মা বজুয হেকায়েতে মিহ্‌র ও ওফা মপুর্‌স)

'আমরা সম্রাট সেকান্দর ও দারার কাহিনী পড়ি নাই। দয়ার্দ্রতা ও আনুগত্যের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।'

॥ মালামতির সংজ্ঞা ॥

আমরা জাগতিক উন্নতি লাভ করিতে নিষেধও করি না; কিন্তু ইহার আহ্‌কাম বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। সেমতে জাগতিক উন্নতির জন্য ঈমান শর্ত কি না—এই আলোচনায় পড়িতেও আমরা নারায। এক্ষণে পারলৌকিক সাফল্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইবে। পরিতাপের বিষয়, কিছু সংখ্যক মুসলমান পারলৌকিক সাফল্য এবং খোদাপ্রাপ্তির জন্য ঈমানকে জরূরী মনে করে না। ঈমানের সহিত সম্পর্ক নাই এবং নামায-রোযার কাছেও ঘেষে না—এমন ভাংখোর ফকীরদের পিছনে বহুলোক ঘুরাফিরা করে এবং বলে দরবেশীর পথ এইরূপ। কোন হিন্দু যোগী আগমন করিয়া দুই চারিটি ভেল্কীবাজী দেখাইলে এবং তাহার ধ্যানে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেই অনেকে তাহাকে ওলী মনে করিয়া ভক্তি করিতে থাকে।

কানপুরে জনৈক নোংরা এবং পাগল খৃষ্টান ছিল। কিন্তু কানপুরবাসীরা তাহাকে ওলী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমাতাপ্রাপ্ত মনে করিত। অথচ তাহার চেহারা হইতে এমন কুলক্ষণ বর্ষিত হইত যে, দেখিলে রীতিমত ভয় লাগিত। তাসত্ত্বেও মানুষ তাহাকে ভক্তি করিত। মোটকথা, সাধারণ লোকের মতে ওলী হওয়ার জন্য কোন শর্ত নাই। হাঁ, শরীয়ত তরক করার শর্ত অবশ্যই আছে। অতএব, ইহা এমন একটি অভিনব পদ যে, ইহার জন্য কোন কোর্স পড়ার এবং পাশ করার প্রয়োজন নাই; বরং সমস্ত কোর্স ত্যাগ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কানপুরের জনৈক উকিল সাহেব বলেন—এখানে একজন ভাংখোর ফকীর আসিয়াছিল। সে همہ اوست (তিনিই সব) বলিয়া বেড়াইত। সে ভাং পান করিয়া বেশ্যাদের সহিত অবস্থান করিত এবং কু-কর্ম করিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও জনসাধারণ তাহাকে কামেল মনে করিয়া ভক্তি করিত।

জনসাধারণ এব্যাপারে একটি কথা মনে রাখিয়াছে। তাহা এই যে, বুযুর্গদের মধ্যে মালামতি নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তাহারা বাহ্যতঃ এমন সব কাজ-কর্ম করে যাহাতে মানুষ তাহাদিগকে মন্দ বলে। সেমতে মানুষ এইসব ভাংখোরদিগকেও মালামতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদের কাজ-কর্মের কদর্থ করিয়া লয়। জিজ্ঞাসা করি, মালামতির কোন সঠিক সংজ্ঞা আছে, না ইহার অর্থ এতই ব্যাপ্রক যে, যে কেহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ? ইহার অর্থ ব্যাপক হইয়া থাকিলে সাহাবিগণ তলোয়ার দ্বারা কাফেরদিগকে হত্যা করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। মালামতি শব্দের অর্থ যখন এতই ব্যাপক যে, কাফেরেরাও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে, তখন ছাহাবিগণ কাফেরদিগকে মালামতি মনে করিয়া তাহাদের কুফরের সদর্থ করিয়া লইলেন না কেন ? সদর্থ করা এতই সস্তা হইলে প্রত্যেক বিষয়েরই সদর্থ করা যায়। এমতাবস্থায় শরীয়ত অনর্থক ইসলাম ও কুফরের আহ্‌কাম বর্ণনা করিয়াছে। 'বন্ধুগণ, যাহার মধ্যে বেশীরভাগ পরহেযগারীর লক্ষণ পাওয়া যায় এবং তাক্‌ওয়ার খেলাফ সামান্য কোন কাজ ঘটিয়া যায়, সে ক্ষেত্রেই সদর্থ করা হয়। সদর্থকে ওড়্‌না, বিছানা বানাইয়া ফেলা এবং আপাদমস্তক প্রত্যেক কাজে সদর্থ করা কিছুতেই জায়েয নহে।

এরূপ হইলে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিও এক প্রকার সদর্থ বটে। ইহা আমার জনৈক আত্মীয় একজন হিন্দুর মুখে শুনিয়াছিলেন। সেই আত্মীয় গোয়ালিয়র রাজ্যে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাসস্থানের নিকটেই একটি মন্দির ছিল। সেখানে জনৈক মূর্তিপূজারী প্রত্যহ সকালে আসিয়া মূর্তির গায়ে পানি দিত। এক দিন সে পানি দিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় একটি কুকুর আসিয়া পা উঠাইয়া মূর্তির গায়ে পেশাব করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে আমার আত্মীয়টি ঐ হিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, পণ্ডিতজী, একটু এদিকে আসুন। সে ফিরিয়া আসিলে আত্মীয়টি বলিলেন, দেখুন, কুকুর আপনার দেবতার সহিত কি কাণ্ড করিতেছে। হিন্দু পণ্ডিত বলিল, হুযূর, এ কিছু নহে। সে-ও দেবতাকে পানি দিতেছে।

সদর্থ করা এতই সস্তা হইলে কুকুরের পেশাব করাকে পানি দেওয়া বলাও একটি সদর্থ বটে। আজকালকার সাধারণ লোকের সদর্থ করার অবস্থাও তথৈবচ। কেহ যত বড় কাফের, ফাসেক বা গোনাহ্‌গার হউক না কেন, যত কু-কাণ্ডই করুক না কেন, তাহারা সদর্থের সাহায্যে তাহাকেও মালামতি বুযুর্গ মনে করিয়া লয়। আপনি মালামতির সংজ্ঞা জানেন কি ? এই শব্দটি ছুফীদের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। অতএব, ইহার অর্থ তাহাদের নিকট হইতেই জানা উচিত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়াই মানুষ শুধু কয়েকটি শব্দ মুখস্থ করিয়া উহা গাহিয়া দিবে। ইহা সর্বনাশা ব্যাপার বটে।

শুনুন, ঐ ব্যক্তিকে মালামতি বলা হয়, যিনি ফরয ব্যতীত অন্যান্য নেক আমল গোপনে সম্পাদন করেন এবং গোপনে গোপনে নফল নামায পড়েন। যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সাধারণ লোক মনে করে, এই জন্য তিনি প্রকাশ্যে নফল এবাদত করেন না।

তদ্রূপ বুযুর্গদের অপর একটি সম্প্রদায়কে কলন্দর বলা হয়। তাঁহারা স্বল্প পরিমাণে নফল আমল করেন; কিন্তু অন্তরে যিকির ইত্যাদি বেশী করিয়া থাকেন। বাহ্যিক আমলের মধ্যে ফরয ও ওয়াজেব ব্যতীত অন্যান্য আ'মলের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকে না। আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক আমলের প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ বেশী। ইহাতে কিরূপে প্রমাণিত হয় যে, মালামতি বুযুর্গগণ গোনাহেও লিপ্ত হয়? ইহা সর্বৈব মিথ্যা ও মনগড়া ধারণা বৈ কিছুই নহে। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে, ওলী হওয়া তাহার পক্ষে সুদুর পরাহত। হাঁ, সে শয়তানের ওলী অবশ্যই হইতে পারে। অতএব, ভাংখোর ফকীরদিগকে মালামতি বলা নিরেট ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, কিছু সংখ্যক বুযুর্গ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা শরীয়তের বিপরিতও কোন কোন কাজ করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে মন্দ বলুক—ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব, তাঁহারা বুযুর্গ ছিলেন কি না? তাঁহারা বুযুর্গ হইলে ভাংখোর ফকীরদিগকেও আমরা তদ্রূপ বুযুর্গ মনে করি।

এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন। প্রথমতঃ যে সব বুযুর্গ হইতে এই ধরণের ঘটনা বর্ণিত আছে, তাঁহারা আসলে শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই; বরং তাঁহাদের কাজ প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল। ইহা শুধু পায়জামা পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া যাওয়ার ন্যায়। ইহাতে গোনাহ্ নাই; কিন্তু ইহা প্রচলিত আচার ব্যবহারের খেলাফ। এইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া গেলে সকলেই মন্দ বলে। কোন বুযুর্গ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করিয়া থাকিলেও তাহা শুধু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতেই শরীয়তের খেলাফ ছিল। বাস্তব পক্ষে উহা শরীয়তের খেলাফ ছিল না।

(উদাহরণতঃ জনৈক বুযুর্গ মুরীদ সমভিব্যাহারে পথ চলিবার সময় জনৈকা মহিলার সাক্ষাৎ পান। তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার অনেক মুরীদ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া দিল। কিছু সংখ্যক মুরীদ তবুও তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গেল। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বুযুর্গ একটি দোকান হইতে দোকানদারের অনুমতি ব্যতিরেকেই হালুয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে জানা গেল যে, ঐ মহিলা তাঁহার বাঁদী ছিল। কাজেই শরীয়ত মতে তাহাকে চুম্বন করা বৈধ ছিল। হালুয়া বিক্রেতাও বুযুর্গ ব্যক্তির একান্ত ভক্ত ছিল। মুরীদ বুযুর্গকে আসিতে দেখিয়া সে

নিজেই হাদিয়া পেশ করার ইচ্ছা করিতেছিল। শায়খকে এইভাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া হালুয়া খাইতে দেখিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়।)

তাছাড়া, ইহাও দেখা দরকার যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই সব আপত্তিজনক কাজ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন ? তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অহংকারের চিকিৎসা করা—যাহাতে মানুষ তাঁহাদিগকে বুযুর্গ না ভাবে। তখনকার যুগে মাতালদের আচার-ব্যবহার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য হাছিল হইত। এরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বনকারীকে তখন শাস্তি দেওয়া হইত। এই কারণে তাঁহারা মাতালের ন্যায় দুই একটি কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন—যাহাতে জনসাধারণ ভক্ত হইয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ না করে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল জনসাধারণ এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'কুতুব' 'আবদাল' মনে করিয়া থাকে। কাজেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য এখন মাতালসুলভ আচার-ব্যবহার দ্বারা হাছিল হইতে পারে না। আজকাল এই উদ্দেশ্য মোল্লার আকৃতি ধারণ করিলে এবং শরীয়তের পাবন্দী করিলে হাছিল হয়। আজকাল যে কেহ মোল্লার আকৃতি ধারণ করে, জগতের সকলেই তাহাকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া বলে, মাসআলা মাসায়েল ছাড়া এই ব্যক্তি আর জানে কি ? অতএব, এই যুগে মালামতি হওয়ার একমাত্র উপায় শরীয়তের পাবন্দী করা। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের খেলাফ কাজ করিয়াছেন—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রসূত। ইহার আসল স্বরূপ ইহাই যাহা আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি।

॥ শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ॥

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, যে ব্যক্তি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কখনও বুযুর্গ হইতে পারে না। যদি কাহারও প্রতি আপনার মনে দয়ারই উদ্রেক হয়, তবে তাহাকে ভাল-মন্দ কিছু বলিবেন না ; কিন্তু তাহার ভক্ত হইবেন না। কাহাকেও মন্দ বলার অধিকার জনসাধারণের নাই ; ইহা আলেমদের কাজ। আপনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইহার দায়িত্ব আলেমদের হাতে ছাড়িয়া দিন। ফাসেক লোকদিগকে মন্দ বলার দায়িত্ব আলেমদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এমন কি, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ভাল লোকদিগকেও মন্দ বলার অধিকার রাখেন।

সেমতে শায়খ আকবর (রহঃ)কে জনৈক বুযুর্গ আলেম আজীবন 'যিন্দীক' (ধর্ম ভ্রষ্ট) বলিয়াছেন। কিন্তু শায়খ আকবরের এন্তেকালের সংবাদ পাইয়া তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকেন যে, আফ্‌সোস, আজ একজন মহান ছিদ্দীকের এন্তেকাল হইল। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যবোধ করিলেন যে, আজীবন যাহাকে যিন্দীক বলিলেন, আজ তাহাকেই মহান ছিদ্দীক বলিতেছেন। অবশেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল,

লোকটি যদি বাস্তবিকই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, তবে আপনি তাহাকে যিন্দীক বলিয়া আমাদিগকে তাঁহার কল্যাণ ও বরকত হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? বুযুর্গ ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, বাস্তবিকই তিনি মহান ছিদ্দীক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন উপকার হইত না। তোমরা তাঁহার সংসর্গে থাকিলে যিন্দীকই হইয়া যাইতে। কেননা তাঁহার সূক্ষ্মজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আওতা-বহির্ভূত ছিল। তোমরা তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আপন বিবেক অনুযায়ী অর্থ বুঝিতে এবং আসল স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছিতে পরিতে না। ফলে তোমরা ধর্ম ভ্রষ্টতায় পতিত হইতে। এই কারণে আমি তাঁহাকে বাহ্যতঃ যিন্দীক বলিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সংসর্গ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি।

মোটকথা, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে আলেমগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই কোন কোন ভাল লোককেও মন্দ বলিয়াছেন। ইহাও আলেমদের কাজ, সাধারণ লোকের নহে। সেমতে যদি কোন ভাংখোর ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার মনে ওলী হওয়ার সন্দেহ জাগে, তবে তাহাকে মন্দ বলা হইতে বিরত থাকুন। কেননা, মন্দ বলা আপনার উপর ফরয নহে। হযরত রাবেয়া বছরী (রাঃ) শয়তানকেও মন্দ বলিতেন না। তিনি বলিতেন, দোস্তের স্মরণে ব্যস্ততার সহিত দুশমনকে লইয়া বসার আমার অবসর কোথায়? কাজেই আপনি কাহাকেও মন্দ না বলিলে তজ্জন্য তিরস্কৃত হইবেন না। ইহা উত্তম গুণ। বরং আপনি যদি এইসব ভাংখোরদের নিকট পারলৌকিক কিংবা জাগতিক উপকার লাভ করিতে যান, তবেই তিরস্কৃত হইবেন।

॥ 'মজযুব'দের ব্যাপার ॥

যদি তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কেহ মজযুব হয়, তবে ইহাতে আপনার কি লাভ? ধর্মের লাভ না হওয়া সকলেরই জানা। তাহাদের নিকট হইতে দুনিয়ারও কোন উপকার পাইবেন না। সকলেই মনে করে, মজযুবদের মুখ তরবারি সদৃশ্য—যাহা বলিয়া দেয়, অকাট্য। শুনুন যাহা হওয়ার জন্য অবধারিত মজযুবদের মুখ হইতে শুধু তাহাই নির্গত হয়। তাহাদের বলায় কোন কিছু ঘটে না। তাহাদের কথাকে ঘটনার কারণ মনে করাও মানুষের একটি অজ্ঞতা অথচ মজযুবগণ স্বেচ্ছায় কোন কথাও বলিতে পারেন না। যাহা ঘটিবে, তাহাদের মুখ হইতে শুধু তাহাই প্রকাশ পায়। তাহারা না বলিলেও তাহা অবশ্যই ঘটিত। এতএব, মজযুবদের নিকট হইতে যখন দ্বীন বা দুনিয়া কোন প্রকার উপকারই পাওয়া যায় না, তখন অনর্থক তাহাদের নিকট কেন গালি খাইতে যায়? আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। যাঁহারা হাসিমুখে সকলকে সাক্ষাৎ দান করেন, মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পালায় আর যাহারা কথায় কথায় গালি বর্ষণ করে, তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে।

উদাহরণতঃ একটি গল্প শুনুন। জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী পরমাসুন্দরী ছিল। কিন্তু সে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না। অধিকন্তু সে একটি বেশ্যার জালে আবদ্ধ ছিল। এক দিন স্ত্রী ভাবিল, বেশ্যাটি কেমন দেখা দরকার। সে কৌশলে বেশ্যাকে দেখিল যে, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু যখন তাহার স্বামী বেশ্যার নিকট গমন করিল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে' বলিয়া বেশ্যা তাহার পিঠে কয়েক ঘা জুতা লাগাইয়া দিল। বেশ্যা তাহাকে জুতা মারিত আর সে খোশামোদ করিত। এই দৃশ্য দেখিয়া স্ত্রী মনে মনে ভাবিল, এই অধমের জন্য এইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার দরকার। এরপর স্বামী যখন ঘরে আসিল স্ত্রীও তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিল। অর্থাৎ, দুই চারিটি জুতা লাগাইয়া অনবরত গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে স্বামী হাসিয়া বলিল, বিবি তোর মধ্যে এই বিষয়টিরই অভাব ছিল। এখন হইতে আমি কোথাও যাইব না। বাস্তবিকই লাথির ভূত বচনে তুষ্ট হয় না। কিছু সংখ্যক লোক গালি খাওয়া ও মন্দ শুনাকেই পছন্দ করে। ইহা সকলে করিতে পারে, তবে ভদ্রতা ইহাতে বাধা দান করে।

কেহ কেহ মজযুবদের কাছেও দোআর প্রার্থী হয়। স্মরণ রাখুন, তাঁহারা কাহারও জন্য দোআ করেন না। তাঁহাদের নিকট দোআর কোন বিভাগই নাই। তাঁহারা শুধু হুকুমের অপেক্ষা করেন। মাওলানা বলেন ঃ

کفر باشد نزد شاں کردن دعا + کاے خدا از ما بگرد ایں قضا

(কুফর বাশাদ নয্‌দে শাঁ করদান দোআ + কায় খোদা আয্‌মা বগর্‌দ ঈ কাযা)

'তাহাদের নিকট এইরূপ দোআ করা কুফর যে, হে খোদা। এই ফয়সালাটি আমাদের উপর হইতে ফিরাইয়া লও।'

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, বাদশাহ্‌র প্রধান পুলিশ কর্মচারী ও মুসাহিব এতদুভয়ের মধ্যে কোন অপরাধীর জন্য সোফারিশ করার ক্ষমতা পুলিশ কর্মচারীর নাই সে শুধু আদেশের অধীন। যাহার জন্য শাস্তির হুকুম হয়, সে তাহাকে শাস্তি দান করে এবং যাহার জন্য মুক্তির আদেশ হয়, সে তাহাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মুসাহিবের সোফারিশ করার ক্ষমতা থাকে। সে গুরুতর অপরাধীর বেলায়ও সোফারিশ করিতে পারে।

অতএব, মজযুবদের মর্তবা পুলিস কর্মচারীর ন্যায়। তাহারা সোফারিশ ও দোআ করিতে পারে না। কিন্তু সালেক তথা সুস্থ জ্ঞানী বুযুর্গদের অবস্থা ভিন্নরূপ অর্থাৎ, তাঁহাদের মধ্যে মুসাহিবের শান থাকে। তাঁহারা দোআ ও সোফারিশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্ষমতা ব্যাপক নহে। তবে মকবুল তাঁহারাই বেশী।

যেমন সুলতান মাহ্‌মুদের সম্মুখে এক ব্যক্তি ছিল আয়ায অপর ব্যক্তি ছিল হামান মেমন্দী। উযীরে আযম হিসাবে হামান মেমন্দীর ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। কিন্তু

আইনগত ভাবে আয়াযের কোন ক্ষমতা ছিল না। কেননা, সে কোন পদাধিকারী ছিল না। তা সত্ত্বেও আয়াযই ছিল সুলতানের নিকট অধিক স্বীকৃত (মকবূল) ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। যখন সুলতান মাহ্‌মুদ কোন বিষয়ে রাগান্বিত হইতেন, তখন কাহারও টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা থাকিত না। হামান মেমন্দীর সকল ক্ষমতা সিকায় ঝুলিয়া থাকিত। তখন সকলে আসিয়া আয়াযকেই খোশামোদ করিত যে, এখন সুলতান তোমাকে ছাড়া অন্য কাহারও কথা শুনিবেন না।

সুতরাং সালেকদের শান আয়াযের শানের ন্যায়। তাঁহারা সব সময়ই দোআ ও সোফারিশ করিতে পারে। অতএব, তাঁহাদের নিকট দুনিয়াও পাওয়া যায়। দুনিয়া পাওয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা তোমাকে ধনভাণ্ডার দিয়া দিবেন; বরং অর্থ এই যে, উপরওয়ালার খেদমতে আরয করিয়া দিবেন। আর দ্বীন তো শুধু তাঁহাদের নিকট হইতেই পাওয়া যায় কিন্তু মানুষ আশ্চর্যরকমে খিচুড়ি পাকাইয়াছে। তাহারা মজযূবদের নিকট হইতেই দুনিয়া ও দ্বীন উভয়টি তলব করে। অথচ ইহাদের কোনটিই তাহাদের ক্ষমতায় নাই। তাহারা ওলী ঠিকই; কিন্তু কাহাকেও কিছু দিতে পারে না। মজযূব তখন ওলী হইতে পারে, যখন হালবিশিষ্ট হয়। হাল না থাকিলে সে ওলীও নহে। যেমন আজকাল প্রায়ই এ ধরণের ভণ্ড ফকিরকে ঘুরাফিরা করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বদ্ধ পাগল। আর কিছু সংখ্যক ছদ্মবেশী। ইহারা পুরাপুরি শয়তান। হালবিশিষ্ট হওয়ার পরিচয় আলেমদের জন্য এই যে, তাহাদের নিকট বসিলে অন্তরে খোদার মহব্বৎ বেশী হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত লোপ পায়। এখন লক্ষ্য করুন, এই ভণ্ডদের কাছে বসিলে কখনও এরূপ হয় কি? কখনই নহে।

অতএব, বুঝিয়া লউন, প্রত্যেক পাগল মজযূব নহে। কেহ হইলেও তাহার নিকট দ্বীন ও দুনিয়া বলিতে কিছুই নাই। দুনিয়া না থাকার কারণ, তাহারা দোআ করিতে সক্ষম নহে এবং দ্বীন না থাকার কারণ ই যে, তাহাদের শিক্ষা দানের ক্ষমতা নাই। কাজেই তাহারা হালবিশিষ্ট হইলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। হালবিশিষ্ট কি না, তাহা আলেমগণই বুঝিতে পারেন। মুর্খ ব্যক্তি মজযূব ও উন্মাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। দেখা-সাক্ষাৎ ব্যতীত মজযূবদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। আমি আলেমদিগকেও বিশেষ করিয়া এই কথাই বলি।

॥ ধর্ম ও উন্নতি ॥

মোটকথা, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারা বুঝা গেল যে, আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য ঈমান অবশ্যই শর্ত। ইহা দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, কোরআন কত

গভীর অর্থবোধক। সামান্য কয়েকটি শব্দ দ্বারাই বিরাট মাসআলা জানা গেল। আয়াতে এই শর্তটির প্রতি জোর দেওয়া হয় নাই এবং নির্দেশমূলক পদ ব্যবহার করা হয় নাই সত্য ; কিন্তু সম্বোধনের ভঙ্গী হইতেই এই শব্দটি এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব, প্রথম স্তর হইল ঈমানের এবং দ্বিতীয় স্তর হইল মধ্যবর্তী চারিটি কাজের। এগুলি : اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। এরপর তৃতীয় স্তর হইল ফলাফলের। ইহা لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অংশে ব্যক্ত করা হইয়াছে। গণনায় ইহা ষষ্ঠ।

এই ধারা অনুযায়ী প্রথমে মধ্যবর্তী চারিটি কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি প্রয়োজন বশতঃ ফলাফলকেই প্রথমে বর্ণনা করিতেছি। কেননা, আজকাল উন্নতি ও সাফল্য সম্পর্কিত আলোচনায় চতুর্দিক মুখরিত। প্রত্যেকেই উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে। শুনুন, হক তা'আলা ঈমান ও কতিপয় আহ্কাম বর্ণনা করার পর ফলাফল হিসাবে বলেন, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'যাহাতে তোমরা সাফল্য অর্জন করিতে পার।' ইহা দ্বারা প্রথমতঃ বুঝা যায় যে, সাফল্য সর্বশেষ ও উদ্দিষ্ট বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ওয়াদা উল্লেখিত চারিটি আ'মলের পর দেওয়া হইয়াছে। এখানে সাফল্য مطلق ব্যবহৃত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ধর্মীয় সাফল্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হয় নাই। শব্দের এই ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়া কিংবা দ্বীন যেকোন সাফল্যই হউক না কেন, তাহা উল্লেখিত আহ্কামের উপর আমল করিলেই অর্জিত হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, শরীয়তের আমলের আসল উদ্দেশ্য শুধু দ্বীনের সাফল্য হইলেও দুনিয়ার সাফল্যও ইহা দ্বারা লাভ হয়। অতএব, দ্বীনের সাফল্য এই আয়াতের مدلول مطابقى (পূর্ণ ও আসল অর্থ) এবং দুনিয়ার সাফল্য ইহার مدلول التزامى (বাহ্যিক অর্থ)। অর্থাৎ, শরীয়তের উপর আমল করিলে দুনিয়ার সাফল্য অবশ্য হাছিল হয়—যদিও তাহা উদ্দেশ্য নহে।

এখন শুনুন, বর্তমান যুগে প্রত্যেকেই সাফল্য তলব করে। দুনিয়ার সাফল্যের পিছনে ধাওয়া করে, এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। এমন কি, তাহারা তজ্জন্য দ্বীনকেও বরবাদ করিয়া দেয়। অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, দ্বীন বরবাদ না করা পর্যন্ত দুনিয়ার সাফল্য অর্জিত হইতে পারে না। সে মতে কিছু সংখ্যক লোককে গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে বলা হইলে তাহারা উত্তরে বলে, সাহেব! আমরা তো দুনিয়াদার লোক। আমরা কি অতসব দ্বীনদারী করিয়া পারি ? ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, দুনিয়াদারী দ্বীনদারীর পরিপন্থী। শব্দান্তরে তাহারা ধর্মের উন্নতিকে দুনিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক মনে করে। এই কারণেই কেহ ব্যবসা করিলে শরীয়তের

বিধিনিষেধের প্রতি খেয়াল রাখে না, কেহ কৃষি কাজ করিলে উহাতে না-জায়েয বিষয়াদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, দ্বীনদার হওয়ার অর্থ হইল ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে সিকায় উঠাইয়া রাখা। এইসব কাজে মশ্‌গুল হইয়া দ্বীনদার হওয়া সুকঠিন। কেননা, দ্বীনদারী এইসব কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দ্বীনদারী কিছুতেই দুনিয়ার সাফল্য ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে। দ্বীনদার হইয়াও ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা যায়। তবে ইহার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, জীবিকার অবলম্বনটি দ্বীনের খেলাফ না হওয়া চাই। এরূপ হইলে উহা দুনিয়া থাকে না ; বরং সাক্ষাৎ দ্বীন হইয়া যায়। হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ 'হালাল উপার্জন অন্যতম ফরয বা কর্তব্য।'

এমতাবস্থায় ব্যবসা এবং কৃষিকার্যও সওয়াবের কাজ। বরং এই সব কাজে মশ্‌গুল হইয়া দ্বীনের পাবন্দী করা শুধু যিকির ইত্যাদি করা হইতে উত্তম।

জনৈক সংসারত্যাগী, দরবেশ ও সূফী ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হযরত! আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে একজন পুত্র-কন্যাবিশিষ্ট মজুর বসবাস করিত, সে শ্রেষ্ঠত্বে আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেননা, সে দিবারাত্র আপন পুত্র-কন্যাদের জন্য মেহনত মজুরী করিত এবং স্বল্প পরিমাণেই যিকির ইত্যাদি করিত। তবে সে সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, অবসর পাওয়া গেলে আমার ন্যায় আরও বেশী পরিমাণে যিকির ইত্যাদি করিবে। এই নিয়তের বরকতে হক তা'আলা তাহাকে এমন মর্তবা দান করিয়াছেন—যাহা আমার ভাগ্যেও ঘটে নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল উপার্জনের সহিত খোদায়ী আহ্‌কাম পালন করিলে তাহা কোন কোন সময় অবিমিশ্র যিকির হইতে উত্তম হইয়া থাকে। এই ঘটনা হইতে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, সকলের জন্যই এই পথটি উত্তম এবং সকলেই ইহা অবলম্বন করুক। আসলে এইসব মঙ্গলামঙ্গল পরস্পর বিরোধী। এক জনের জন্য এক পথ মঙ্গলজনক হইলে অন্যের জন্য তাহাই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

উদাহরণতঃ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক একটি রোগের জন্য একাধিক ঔষধ ফলপ্রদ হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেকের জন্য উপকারী নহে ; বরং ইহাতে প্রত্যেকেরই মেযাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কয়েকটি ঔষধের মধ্য হইতে একটি মনোনীত করিতে হয় এবং উহার সহিত অন্য ঔষধও মিলাইতে হয়—যাহাতে উহার ক্ষতি প্রশমিত হইয়া উপকার জোরদার হইতে পারে। চিকিৎসক এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া থাকে। যদি কোন রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অগ্রাহ্য করিয়া

উহা হইতে মাত্র একটি ঔষধ বাছিয়া লয়, তবে তাহা নিতান্তই ভুল হইবে। এইভাবে সে কোন দিন আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। কেননা, তাহার মনোনীত ঔষধটি যদিও এই রোগে ফলপ্রদ ; কিন্তু রোগীর মেযাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহার সহিত পথ প্রদর্শক ও সংশোধনকারী ঔষধ মিলাইবারও প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া ঐ ঔষধ রোগ উপশম করিতে সক্ষম নহে।

তদ্রূপ আত্মিক রোগের বেলায়ও প্রত্যেক রোগীকে শায়খের মনোনয়নের অনুসরণ করিতে হইবে। নিজ খেয়াল খুশীমত কোন পথ বাছিয়া লওয়ার অধিকার তাহার নাই। স্বীকার করিলাম যে, উপার্জনে মশ্‌গুল হওয়াও কোন কোন সময় খোদাপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হয় ; কিন্তু সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য নহে ; বরং বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায়ই ইহা যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশেষ যোগ্যতা ব্যতীত ইহা উপকারী নহে।

উদাহরণতঃ তালেবে এল্‌মদের মধ্যে একথা সর্বজনবিদিত যে, শর্‌হে মোল্লাজামী নামক কিতাব ভালরূপ জানা হইয়া গেলে সকল এলমের যোগ্যতার জন্য যথেষ্ট হয়। জনৈক তালেবে এলম এই কথা শুনিয়া প্রথমেই শর্‌হে মোল্লাজামী কিতাব পড়িতে আরম্ভ করিল। সে দশ বার বৎসর পর্যন্ত এই কিতাবটিই পড়িল ; ইহা তাহার নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। কেননা, অন্যান্য এলমের যোগ্যতার জন্য শরহেজামী যথেষ্ট বটে ; কিন্তু স্বয়ং ইহার জন্যও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। এই যোগ্যতা, মীযান, মুন্‌শাআব, নহ্‌ভমীর ও হেদায়াতুন্নহভ্‌ নামক কিতাব পড়া ব্যতীত হাছিল হইতে পারে না। তেমন উপার্জনে লিপ্ত হওয়া খোদাপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য যথেষ্ট ; কিন্তু ইহার জন্যও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। ঐ যোগ্যতা হাছিল করার জন্য কামেল চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। কামেল চিকিৎসক যাহাকে উপার্জনে মশ্‌গুল হওয়ার ব্যবস্থা দেন, তাহার পক্ষে উহাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাহাকে জীবিকার উপায় তরক করার ব্যবস্থা দেন, তাহার জন্য উহাই উপকারী। কেননা, শায়খ যে উপায় মনোনীত করেন হক তা'আলা উহাকে শাগরেদের পক্ষে উপযুক্ত করিয়া দেন। কোন উপায় উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত হওয়া প্রকৃত পক্ষে হক তা'আলার ক্ষমতাধীন এবং তাঁহার নিকট হইতেই সবকিছু পাওয়া যায়। তবে তিনি প্রায়ই কামেল শায়খদের অন্তরে প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেন :

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں + مصلحت راتہمتے برآ ہوئے چین بستہ اند

'সুগন্ধি ছড়ানো তোমার কেশগুচ্ছেরই কাজ। কিন্তু আশেকগণ মছলেহাতের কারণে চীনদেশীয় মৃগনাভির উপর অপবাদ লাগায়।'

মোটকথা, হক তা'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি বিশেষ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন যে, উহা দ্বারাই হক তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কেহ উপার্জনে মশ্‌গুল

হইয়া এই ধন প্রাপ্ত হয় এবং কেহ উপার্জনের উপায় ত্যাগ করিয়া। অতএব, শায়খ যাহার জন্য যে উপায় অবলম্বন করার ব্যবস্থা দেন, সে উহাই অবলম্বন করুক এবং উহাতে সন্তুষ্ট থাকুক। কাহারও পক্ষে হাস্য করা মুনাসিব এবং কাহারও পক্ষে কান্নাকাটি করা। ইহাতে নিজের খেয়ালখুশীকে আমল দিতে নাই। কবি বলেন :

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست + بعندلیب چه فرمودهٔ که نالاں ست

(বগুশে গোল চেহ্ সুখন গোফ্‌তায়ী কেহ্ খান্দা আস্ত
বঅন্দলীব চেহ্ ফরমুদায়ী কেহ্ নালা আস্ত)

'ফুলের কানে কি কথা বলিয়াছ যে, সে কেবল হাস্য করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে সর্বদাই কাঁদে।' মাওলানা রূমী বলেন :

چونکه بر میخت به بند و بسته باش
چوں کشاید چابک و بر جسته باش

(চুঁকে বরমীখত ববন্দ ও বস্তা বাশ + চুঁ কুশায়াদ চাবুক ও বরজুস্তা বাশ)

'অর্থাৎ, শায়খ যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তুমি তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলে নিশ্চিন্ত থাক এবং চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে বলিলে উহাতেই সন্তুষ্ট থাক। কেননা, চিন্তা ও হতবুদ্ধিতা দ্বারাও উন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। তলব ইহাকেই বলে। ইহা ছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই পথে নিজ খেয়াল-খুশীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া দরকার। কেহ কেহ এইসব ব্যবস্থার কথা শুনিয়াই পেরেশান হইয়া যায়। তাহারা নিজের জন্য একটি বিশেষ অবস্থা পছন্দ করিয়া রাখে যে, ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে। এরপর যখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং অন্য অবস্থা প্রকাশ পায় তখন তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়।

আমি জনৈক বয়োবৃদ্ধ আলেম ডেপুটি কালেক্টরকে দেখিয়াছি। পেন্‌সন পাওয়ার পর নীরবে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতে তাঁহার মনে সাধ জাগিল। খোদার কি মহিমা, যিকির আরম্ভ করার পর তাঁহার এক পুত্র ও এক পৌত্র হঠাৎ উন্মাদ হইয়া গেল। তিনি ভীষণ পেরেশান হইলেন। কেননা, এখন তাঁহাকে তাহাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাঁহার নির্জনতা ও একাগ্রতা বিনষ্ট হইয়া গেল। এমনকি আল্লাহ্ আল্লাহ্ করার নছীবও তাঁহার সব সময় হইত না। কিন্তু আরেফগণ (খোদাতত্ত্ব জ্ঞানিগণ) এইসব ব্যাপারে পেরেশান হয় না। কেননা আরেফ নিজের জন্য নিজে কোন অবস্থা বাছিয়া লয় না। হক তা'আলা যতক্ষণ তাহাকে নির্জনতায় রাখেন, ততক্ষণ সে নির্জনতায় থাকে এবং যখন নির্জনতা হইতে বাহিরে আনিতে চায়, তখন সে বাহিরে চলিয়া আসে এবং উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। মাওলানা তাই বলেন :

چونکه بر میخت بہ بند و بستہ باش
چوں کشاید چابک و برجستہ باش

“তিনি যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।”

আমি বলি, আসল উদ্দেশ্য হইল হক্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। ইহা নির্জনে থাকিয়া যেমন লাভ হয়, তেমনি মাঝে মাঝে সৃষ্ট জীবের খেদমত করিয়াও লাভ হইতে পারে। অতএব, ডেপুটি কালেক্টর সাহেব উন্মাদদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কি সওয়াব পাইতেন না? নিশ্চয়ই পাইতেন। এমতাবস্থায় চিন্তাই উন্নতির কারণ। এই সময়ে নিশ্চিন্ততা ও নির্জনতা মোটেই উপকারী নহে। তখন নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিলে যে সওয়াব পাওয়া যাইত, উন্মাদদের খেদমত করিলে তদপেক্ষা বেশী সওয়াব পাওয়া যাইত। সুতরাং পেরেশানী কিসের?

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেবের (কুদ্দিসা সির্‌রুহু) খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফলে কয়েক ওয়াক্তের নামায হেরেম শরীফে যাইয়া পড়িতে পারি নাই। ইহাতে দারুন মনঃকষ্টে পতিত আছি। হযরত বলিলেন, নৈকট্যের বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে ঘরে নামায পড়িয়া হেরেম শরীফে উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হওয়াও একটি উপায়। তিনি যে অবস্থাতেই রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অতঃপর আরও বলিলেন, উদাহরণতঃ, বোম্বাই ও করাচী উভয় স্থান হইতেই লোক হজ্জে যায়। যদি হক তা'আলা বোম্বাই হইতে হজ্জের জন্য ডাকেন, তবে বোম্বাই হইতেই চলিয়া যাও আর যদি করাচী হইতে ডাকেন, করাচী হইতেই চলিয়া যাও। উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাই মাওলানা রূমী বলেন:

چوں بر میخت بہ بند و بستہ باش
چوں کشاید چابک و برجستہ باش

‘তিনি তোমাকে বাঁধিয়া রাখিলে তদবস্থায়ই থাক এবং যখন খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।’

তদ্রূপ হক তা'আলা যদি আপনাকে জীবিকা উপার্জনের উপায়সমূহে আবদ্ধ রাখেন, তবে উহাতেই আবদ্ধ থাকুন আর যদি উহা হইতে পৃথক রাখেন, তবে পৃথক থাকুন। সেমতে কেহ শরীয়তসম্মত উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজ করিলে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু না করিলে তাহাতে সাক্ষাৎ সওয়াব হইবে। এমতাবস্থায় ইহাকে দুনিয়া বলা হইবে না; বরং ইহা সাক্ষাৎ দ্বীন। হাঁ, শরীয়তের খেলাফ কোনকিছু করিলে তাহা অবশ্যই দুনিয়া হইবে এবং দ্বীনের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। অতএব, সাধারণতঃ মানুষের যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে যে, দ্বীনের সহিত

দুনিয়ার কাজ সম্ভবপর নহে এবং দ্বীনদারী ত্যাগ করা ব্যতীত জাগতিক উন্নতি হইতে পারে না—তাহা নিতান্তই ভুল। খোদা তা'আলার কালাম এই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে। কেননা, হকতা'আলা আয়াতে কতিপয় আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ বলিয়াছেন। শব্দের ব্যাপকতার দরুন ইহাতে জাগতিক সাফল্যও শামিল রহিয়াছে।

॥ সাফল্যের স্বরূপ ॥

ইহাতে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত আমলগুলি যেমন পারলৌকিক সাফল্যের উপায়, তদ্রূপ উহা দ্বারা জাগতিক সাফল্যও অবশ্যই হাছিল হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম "ফালাহ্" শব্দের স্বরূপ বুঝা দরকার। "ফালাহ্" সাফল্যকে বলা হয়—মাল প্রাপ্তিকে বলা হয় না। আজকাল মানুষ ধনাঢ্যতাকেই 'ফালাহ্' তথা সাফল্য মনে করিয়া লইয়াছে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। দেখুন, কারূণকে অনেকেই সৌভাগ্যশালী ও সাফল্যের অধিকারী মনে করিত। তাহারাও আজকাল-কার কিছু সংখ্যক লোকদের সমমনোভাবাপন্ন ছিল। কারূণ যখন তাহার লোকজন, চাকর-নওকর ও আসবাবপত্র লইয়া বাহির হইল ঐ সমস্ত লোকের মুখ লালসার পানিতে ভরিয়া গেল। তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল :

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٥

"কারূণ যেমন আসবাবপত্র লাভ করিয়াছে, আমাদের তদ্রূপ লাভ হইলে কি চমৎকার হইত! বাস্তবিকই সে বিরাট ভাগ্যবান।" তখনকার যুগে যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই সমস্ত ভ্রান্ত লোককে সতর্ক করিয়া বলিলেন, সাফল্য ও সৌভাগ্য ধনাঢ্যতা দ্বারা অর্জিত হয় না; বরং খোদার আনুগত্য করিলেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। এসম্পর্কে কোরআনে এরশাদ হইয়াছে :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ

وَعَمِلَ صَالِحًا ط وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ -

'এবং যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা বলিল—আরে তোমাদের সর্বনাশ হউক। (তোমরা এইসব ধন-দৌলত ও আসবাবপত্রের লালসা করিতেছ কেন?) আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াব (ইহা হইতে) হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ, উহা এমন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে, যে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। তাছাড়া উহা (পূর্ণরূপে) ঐসব লোককে দেওয়া হয়, যাহারা (জাগতিক লোভ-লালসা হইতে) ধৈর্য ধারণ করে। এই জওয়াব হইতে জানা যায় যে, ধনাঢ্যতা দ্বারা সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ হয় না; বরং জাগতিক সাফল্য এবং সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য দ্বারা

হাছিল হয়। ঐ যুগের লোকগণ সম্ভবতঃ যৌক্তিক দিক দিয়া এই উত্তর শুনিয়াই চুপ হইয়া গিয়াছিল। তাসত্ত্বেও বোধ হয় তাহারা ইন্দ্রিয়গত দলীলের অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ যুগটিও ছিল বড় আশ্চর্য ধরণের। প্রায় সকল ব্যাপারেই দলীল ও নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাইত। সেমতে হক তা'আলা এমন নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দিলেন, যদ্দরুন দুনিয়াদারগণও স্বীকার না করিয়া পারিল না যে, খোদা তা'আলার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্যও লাভ করিতে পারে না—যদিও তাহারা অগাধ ধন সম্পদের অধিকারী হয়। বরং দুনিয়াতেও একমাত্র দ্বীনদার ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান ও সাফল্যের অধিকারী হইয়া থাকে। হক তা'আলা বলেন :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ط وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ ط

'অতঃপর আমি কারূণকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিলাম। তখন এমন কোন দল দেখা গেল না, যে তাহাকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে এবং সে নিজেও নিজেকে বাঁচাইতে পারিল না। গতকল্য যাহারা তাহার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহারা (অদ্য তাহাকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়া যাইতে দেখিয়া) বলিতে লাগিল, মনে হয়, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বেশী রুযী দান করেন এবং (যাহাকে) ইচ্ছা স্বল্প পরিমাণে দেন। (আমরা ধনাঢ্যতাকে সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলাম—ইহা আমাদের ভ্রান্তি বৈ কিছুই ছিল না। আসলে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ধনাঢ্যতার উপর নির্ভরশীল নহে; বরং ইহা কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই হইয়া থাকে।) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হইলে তিনি আমাদিগকেও ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিতেন। (কেননা, আমরাও দুনিয়ার মহব্বতরূপ গোনাহে লিপ্ত ছিলাম।) ব্যাস জানা গেল যে, কাফেরেরা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না।' (কয়েক দিন মজা উড়াইলেও পরিণামে ক্ষতিই ভোগ করে।) আয়াতে হক তা'আলা দুনিয়াদারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত তাহারাও স্বীকার করিল—কাফেরেরা সফলকাম হইতে পারে না। পরিণামে কারূণের যে দশা হয়, তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে কি যে, কারূণ কামিয়াব ছিল? কিছুতেই নহে। হাঁ, সে ধন-দৌলত প্রাপ্ত হইয়া ছিল বলিতে পারে। অতএব, বুঝা গেল যে, ফালাহ্ কামিয়াবীকে বলা হয়—ধন-দৌলত প্রাপ্তিকে নয়।

॥ মালদারী ও কামিয়াবী ॥

'মালইয়াব' (মাল প্রাপ্ত) হইলেই কামিয়াব হওয়া জরূরী নহে। কিন্তু অদ্ভুত জবরদস্তি এই যে, আজকাল মালদারীকেই কামিয়াবী মনে করা হয়। অথচ মাল স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্যের একটি উপায় মাত্র। মাল বাদামের খোসার ন্যায় এবং উদ্দেশ্য বাদামের সারাংশের ন্যায়। অতএব, যে ব্যক্তি খোসাকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করিতে সারা জীবন বিনষ্ট করিয়া দেয়, সে যারপরনাই নির্বোধ। এই বাদাম দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্রও শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না। সে নিশ্চিত রূপেই উদ্দেশ্য অর্জনে বিফলমনোরথ হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সারাংশকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করে, তাহার কাছে একটি খোসা না থাকিলেও সে কামিয়াব। তাহার মস্তিষ্ক উহা দ্বারা অবশ্যই শক্তিশালী হইবে। আসল উদ্দেশ্য কি, এখন তাহাই বুঝুন। সকলেই জানে যে, শান্তি ও আরামের জন্যই মাল সঞ্চয় করা হয়। অতএব, শান্তি ও আরাম আসল বস্তু এবং ইহাই সারাংশ। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি কেহ মাল ছাড়াই শান্তি ও আরাম লাভ করিতে পারে, তবে সে কামিয়াব হইবে কি না? সে অবশ্যই কামিয়াব।

ইহা এমন—যেমন কাহারও নিকট শুধু বাদামের শাঁস আছে—খোসা নাই। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অগাধ ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও আরাম ও শান্তি না পায় তবে সে বিফল মনোরথ কি না? নিশ্চয়ই সে বিফল মনোরথ। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার নিকট শুধু বাদামের খোসা আছে—শাঁস মাত্রও নাই। এতএব, আমি জোরের সহিত দাবী করিয়া বলিতেছি যে, খোদার অনুগত বান্দার সমান দুনিয়ার আরাম-আয়েশ কেহ লাভ করিতে পারে না। সে এত বেশী আরাম উপভোগ করে যে, একজন বাদশাহ্‌ও তাহা পারে না। আপনি আমাকে এমন কোন দ্বীনদার ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন না, যে দুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত। অথচ আমি আপনাকে এমন হাজার হাজার দুনিয়াদার ব্যক্তির কথা বলিতে পারিব, যাহারা সর্বদাই অসংখ্য উৎকণ্ঠা ও অগণিত চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার নিকট দরিদ্রের চেয়ে ধনীরাই বেশী দয়ার পাত্র। কেননা, ধনীদের ন্যায় দরিদ্রদের এতবেশী চিন্তা নাই। আমার অধিকাংশ মৌলবী ভাই চাঁদার ব্যাপারে ধনীদের ঘাড়ে চাপ দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে বেশী আদায় করিতে চায়। কেননা, বাহ্যতঃ তাহারা দরিদ্রদের চেয়ে বেশী মালদার দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার খুব দয়া হয়। কারণ, তাহাদের নিকট মাল যেরূপ বেশী, তদ্রূপ চিন্তাও বেশী, খরচও বেশী। উদাহরণতঃ কাহারও মাসিক আমদানী পাঁচ শত টাকা হইলে তাহার খরচ মাসিক সাত শত টাকা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হওয়াই যাবতীয় মানসিক যাতনা ও পেরেশানীর

মূল। পক্ষান্তরে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মাসিক আয়-ব্যয় প্রায়ই সমান হইয়া থাকে। তাহারা যে পরিমাণ উপার্জন করে সেই পরিমাণ খায় পরে; বরং উহা হইতে মাঝে মাঝে কিছু বাঁচাইয়াও রাখে। এই কারণে দরিদ্র ব্যক্তি দশ পয়সা হইতে সহজেই এক পয়সা চাঁদা দিতে পারে; কিন্তু ধনী ব্যক্তি এক হাজার টাকা হইতেও এক টাকা দিতে পারে না। কেননা, সে এক হাজার হইতেও বেশী টাকার ঋণী। সে এক টাকা দিলেও তাহাতে তাহার ঋণ বৃদ্ধি পাইবে। যে ব্যক্তি এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, সে দরিদ্রদের চেয়ে ধনীদের প্রতি বেশী দয়া করিবে। বস্তুতঃ মানুষ তাহাদের বাহ্যিক আসবাবপত্র দেখিয়া তাহাদের ঘাড়েই বেশী চাপ দেয়। আমার মতে এই বেচারীদিগকে বেশী বিরক্ত করা উচিত নহে।

তাছাড়া দরিদ্র ব্যক্তির খরচ বাড়িয়া গেলে সে আমদানীও বাড়াইয়া দেয়। উদাহরণতঃ, এক ব্যক্তি আগে দুই আনা রোজ মজুরী করিত। কোন এক বৎসর জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় সে তাহার মজুরীও বাড়াইয়া দিল এবং এখন চারিআনা রোজ মজুরী করে। যাহারা মজুর গ্রহণ করে তাহারা মজুর যে পরিমাণ চায় বাধ্য হইয়া তাহাই দেয়। অতএব, দরিদ্রদের আমদানী তাহাদের ইচ্ছাধীন আর ধনীদের আমদানী তাহাদের ইচ্ছার বাহিরে। তাছাড়া, ধনীদের সম্পর্কও ব্যাপকতর হইয়া থাকে। দরিদ্রদের সম্পর্ক এত ব্যাপক হয় না। গরীবের অতিরিক্ত নিজ বাড়ী, সন্তান-সন্ততি এবং দুই চারিটি জন্তু জানোয়ারের চিন্তা থাকে। পক্ষান্তরে ধনীদের চিন্তার অন্ত নাই। বাড়ীর চিন্তা পৃথক, বন্ধু-বান্ধব ও সরকারী অফিসারদের তোয়াজ করার চিন্তা পৃথক, এরপর বিষয় সম্পত্তিরও চিন্তা আছে। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার জন্য চিকিৎসক আনার বন্দোবস্ত করিতে হয়। দরিদ্ররা প্রথমতঃ অসুস্থই হয় কম। আর কেহ হইলেও দুই চারি দিন বিছানায় গড়াগড়ি করিয়া আপনাআপনিই সুস্থ হইয়া উঠে। মোটকথা, ধনীরা অনেক সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। এই সম্পর্ক যত বেশী হয়, মর্মস্পর্শী যাতনাও ততই বেশী হয়।

॥ আওলাদের শাস্তি ॥

হক তা'আলা বলেন:

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُم

بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

'তাহাদের মাল-দৌলত ও আওলাদ যেন আপনাকে বিস্ময়ে না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলি দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।'

এখানে হক তা'আলা মাল ও আওলাদকে আযাবের হাতিয়ার আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকই চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মাল ও আওলাদের প্রাচুর্যতার ফলে চিন্তা ও মানসিক উৎকণ্ঠাও অনেক বাড়িয়া যায়। এই কষ্টই হইল পেরেশানীর স্বরূপ। ধনীরা অধিকাংশই ইহাতে পতিত। মালদার ব্যক্তির যদি আওলাদ না থাকে, তবে সে মালের ব্যাপারে চিন্তা করে যে, আমার পর এই মাল না জানি কাহার হাতে যাইয়া পৌঁছে। এই কারণে সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। এরপর নিজেরই সন্তান হইয়া গেলে সে পেরেশান হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট মাল ও আওলাদ উভয়টিই থাকিলে সে এক চিন্তা হইতে রেহাই পায় বটে; কিন্তু সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা তবুও তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। সন্তানের যথোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা কাহারও ক্ষমতার অধীন নহে। মাঝে মাঝে শত চেষ্টা করিলেও সন্তান অনুপযুক্তই থাকিয়া যায়। সন্তান উপযুক্ত হইলেও তাহার বিবাহের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। শত হয়রানীর পর বিবাহও হইয়া গেল, এখন তাহার সন্তানাদি হওয়ার চিন্তা দেখা দেয়। ছেলে নিঃসন্তান হইলে বিষয়-সম্পত্তি অন্যের হাতে চলিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। মোটকথা, আজীবন কেবল এই পেরেশানীই ঘিরিয়া রাখে।

আমি জনৈকা বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। সে তাহার সন্তান-সন্ততিকে যারপরনাই স্নেহ করিত। রাত্রিকালে সকলকে লইয়া নিজেরই পালঙ্কের উপর শয়ন করিত। সন্তান বেশী হইয়া গেলে পালঙ্কের পরিবর্তে মাটির বিছানায় তাহাদিগকে লইয়া শয়ন করিত। এরপরও বার বার উঠিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেখিয়া লইত যে, সকলেই জীবিত আছে কি না। কাহারও কোনরূপ অসুখ হইলে বৃদ্ধার সারারাত্রিও চক্ষু মুদিত হইত না। জিজ্ঞাসা করি, এমতাবস্থায় আওলাদ আযাবের হাতিয়ার নহে কি?

খোদার কসম, যাহার অন্তরে মাত্র একজনের মহব্বত আছে, সে-ই প্রকৃত শান্তিতে আছে। সেই একজন কে? তিনি হইলেন খোদা তা'আলা। অন্তরে এক মাত্র খোদার মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করার পর এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত :

یکے بین و یکے دان و یکے گوئے + یکے خواہ و یکے خوان و یکے جوئے
خلیل آسا در ملک یقین زن + نوائے لا احب الافلین زن

(একে বীনও একে দানও একে গুয়ে + একে খাহ ও একে খাঁ ও একে জুয়ে
খলীল আসা দর মুলকে ইয়াকীঁ যন + নাওয়ায়ে লা-উহিব্বুল আফেলীঁ যন)

'একজনকে দেখ, একজনকে জান, একজনকে বল, একজনকে চাও, একজনকে ডাক এবং একজনকে তালাশ কর;' ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র ন্যায় বিশ্বাসের দেশে চল এবং বল অস্তগামীদিগকে পছন্দ করি না"—তাই জনৈক খোদাতত্ত্বজ্ঞানী

বলেন :

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار
بگزارند وخم طرهٔ یارے گیرند

(মাছলেহাত দীদ মান আঁনাস্ত কেহ্ ইয়ারা নেহামাকার
বগুযারান্দ ও খম তুর্রায়ে ইয়ারে গীরান্দ)

অর্থাৎ, আমার মতে ইহাই মঙ্গল যে, প্রেমিকগণ সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া প্রেমাস্পদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া থাকিবে। আরও বলেন :

دلارامیکه داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

(দিলারামেকেহ্ দারী দিল দরও বন্দ + দিগার চশ্‌ম আয্‌ হামা আলম ফেরুবন্দ)

'তোমার প্রেমাস্পদের মধ্যেই অন্তরকে আবদ্ধ রাখ এবং বাকী সমস্ত দুনিয়া হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও।'

॥ চিন্তা পেরেশানীর কারণ ॥

এ স্থলে কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, প্রথমে আপনি বলিয়াছিলেন যে, পেরেশানীর মধ্যেও সওয়াব পাওয়া যায়, আর এখন পেরেশানীর নিন্দা করিতেছেন। ইহার কারণ কি? উত্তর এই যে, পেরেশানী দুই প্রকার। (১) অনিচ্ছাকৃত ও (২) ইচ্ছাকৃত।

আমি প্রথম প্রকার পেরেশানীর ফযীলত বর্ণনা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, যদি কাহাকেও খোদার তরফ হইতে চিন্তা ও পেরেশানীতে লিপ্ত করা হয়, তবে তাহার উচিত উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তখন চিন্তার কারণেই তাহার উন্নতি হইবে এবং সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। আমি দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানীর নিন্দা করিতেছি। স্বেচ্ছায় পেরেশানীর বোঝা মাথায় লওয়া আত্মন্ত কষ্টের কারণ বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বিষয়-আশয়ের সহিত সম্পর্ক রাখাই প্রকৃত পক্ষে কষ্টদায়ক। এই কারণে কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন যে, জাহান্নামের "সালাসীল ও আগলাল" (শিকল, গলাবন্ধ)-এর স্বরূপ হইল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়-আশয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে খোদা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়-আশয়ের সহিত যে-সব সম্পর্ক রাখে, ঐ গুলিই জাহান্নামে শিকল ও বেড়ির আকৃতি ধারণ করিবে। মানুষ এই সব সম্পর্কের কারণে দুনিয়াতেও পেরেশান হয় এবং আখেরাতেও ঐ গুলিকে শিকলের আকৃতিতে পরিধান করিতে হইবে। অতএব, এমন মালদারকে কামিয়াব বলা যায় কি, যে অগাধ ধন-দৌলত সত্ত্বেও মনের শান্তি হইতে বঞ্চিত? কখনই নহে। হাঁ, যদি ধন-দৌলতের প্রতি অন্তরের টান না থাকে, তবে উহা আযাবের হাতিয়ার হইবে না। এমতাবস্থায় ধনাঢ্যতা মোটেই ক্ষতিকর নহে।

মোটকথা, আরাম ও সুখ-শান্তি হইল আসল উদ্দেশ্য। ইহা দুনিয়াতেও দ্বীনদাররাই উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আখেরাতের সাফল্যও তাহাদের জন্য অবধারিত এবং দুনিয়ার সাফল্যও তাহাদের জন্যই। কেননা, দুনিয়াতে আত্মিক শান্তি একমাত্র তাহারাই ভোগ করে। আমি ইহাতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, আত্মিক শান্তির সাথে সাথে শারিরীক শান্তিও তাহারাই ভোগ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহারা অসুস্থ হয় না; বরং অর্থ এই যে, অসুস্থতা ও বিপদাপদে তাহারা আত্মিক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শারিরীক দিক দিয়াও শান্তিতে থাকে। তাহারা বিপদাপদে অত্যন্ত স্থৈর্য ও নীরবতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ এ সময়ে আত্মিক শান্তি দুরের কথা, শারিরীক শান্তিও হারাইয়া ফেলে। তাহাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক বিরাজ করিতে থাকে এবং কথাবার্তায় বিহ্বলতা ও অধৈর্য ফুটিয়া উঠে।

উদাহরণতঃ, প্লেগ দেখা দিলে দ্বীনদাররা পেরেশান হয় না এবং ভীতি বিহ্বলপূর্ণ কথাবার্তা বলে না। অদ্য কতজন মরিয়াছে এবং কাল কতজন মরিয়াছে—তাহারা এ সব গণনা করিয়া ফিরে না। মজলিসে বসিয়াও এ সম্বন্ধে আলোচনা করে না; বরং আপন কর্তব্য কর্মে মগ্ন থাকে। তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও ঘাবড়ায় না। প্লেগকে তাহারা পরওয়াও করে না। কারণ, তাহাদের রুচি হইল اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ 'নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমরা আপন খোদার নিকট পৌঁছিয়া যাইব।' অতএব, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে মে'রাজ মনে করে, সে প্লেগকে ভয় করিবে কেন? অধিকন্তু খোদাপ্রেমিকগণ ইহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকেন। সেমতে হাফেয (রহ্ঃ) বলেন:

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم + راحت جاں طلبم وز پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے + تا در میکدہ شاداں و غزل خواں بروم

(খুর্‌রম আঁ রোয কেহ্ কযীঁ মন্‌যিলে ভিরাঁ বেরওয়াম
রাহাতে জাঁ তলবাম ওযপায়ে জানাঁ বেরওয়াম
নযর করদাম কেহ্ গর আয়াদ বসায়ের ঈ গম রোযে
তাদর মায়কাদা শাদাঁ ও গযল খাঁ বেরওয়াম)

'ঐ দিন আনন্দিত হইব, যে দিন এই বিজন দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইব, প্রাণের শান্তি তলব করিব এবং প্রেমাস্পদের পিছনে পিছনে চলিব। মান্নত করিয়াছি যে, এই কষ্টের দিনগুলি শেষ হইলে আনন্দ করিতে করিতে ও গযল পড়িতে পড়িতে পান শালায় গমন করিব।'

তাঁহারা মৃত্যুকে এতই সুমিষ্ট মনে করেন যে, তজ্জন্য মান্নত পর্যন্ত করেন। ইহা হইল বড় দ্বীনদারদের অবস্থা। কিন্তু আপনি সাধারণ দ্বীনদারকেও দেখিবেন যে, সে প্লেগ দেখিয়া দুনিয়াদারদের ন্যায় পেরেশান হয় না।

আমি প্লেগ রোগে জনৈক হিন্দুকে মরিতে দেখিয়াছি। সে সকলের সহিত অবাধ মেলামেশা রাখিত। এই কারণে অসুস্থতার সময় তাহাকে দেখিবার জন্য হিন্দু মুসলমান সকলেই যাইত। আমি দেখিলাম যে, সে কেবল হায় হায় করিতেছে এবং ভীষণ পেরেশান অবস্থায় আছে। অথচ সে বিরাট ধনী ছিল, কিন্তু তখন ধন-দৌলত তাহার পেরেশানী মোটেই হ্রাস করিতে পারিল না।

আমি মুসলমানদিগকেও প্লেগ রোগে মরিতে দেখিয়াছি। তাহারা অত্যন্ত উৎফুল্লতার সহিত প্রাণ সমর্পণ করিত। একবার আমাদের এলাকায় খুব জোরেসোরে প্লেগ দেখা দিল। ইহাতে মাওলানা ফাতাহ্ মোহাম্মদ ছাহেব (রহ্ঃ)-এর মক্তবের বিদেশী ছাত্রগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। কারণ, এই প্লেগেই মাওলানার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। নূর আহ্মদ নামক জনৈক ১৮ বৎসর বয়স্ক তালেবে এল্মও বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আসবাবপত্র গুছাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতেই তাহার জ্বর আসিল এবং গলগণ্ড প্রকাশ পাইল। সকলেই খুব দুঃখিত হইলেন যে, আহা বেচারীর মনে দেশে যাওয়ার জন্য কতই না আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে মৃত্যুর প্রস্তুতি চলিতেছে। কেহ কেহ তাহাকে সান্ত্বনা স্বরূপ বলিতে লাগিল, নূর আহমদ, ঘাবড়াইও না। ইন্‌শা আল্লাহ্ তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে এবং আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে যাইবে। ইহাতে রুগ্ন নূর আহমদ বলিতে লাগিল, ব্যস, এখন আমার জন্য এরূপ দোআ করিবেন না। এখন খোদা তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই মনে চায়। দোআ করুন, যাহাতে ঈমানের সহিত মরিতে পারি। তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, বাড়ী যাওয়ার জন্য নূর আহ্মদের মোটেই আকাঙ্ক্ষা নাই। এর দুই এক দিনের মধ্যে তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার জানাযার মধ্যে আমি একটি নূর দেখিয়াছিলাম।

বন্ধুগণ, যাহারা খোদা তা'আলার প্রত্যেক হুকুমে রাযী তাহারা পেরেশান হইবে কেন? কম আহারে রাযী, ছেঁড়া বস্ত্রে সন্তুষ্ট, রোগে আনন্দিত—এমতাবস্থায় তাহাদের দুঃখ কিসের? দুনিয়াতে যাহা হইবার তাহাই হউক—তাহারা মোটেই পেরেশান হইবে না। কেননা, তাহারা সব কিছুকেই খোদার তরফ হইতে আগত মনে করে এবং هرچه از دوست میرسد نیکوست 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই ভাল।' আরও:

هرچه آں خسرو کند شیریں بود

(হরচেহ্ আঁ খসরু কুনাদ শিরীঁ বুয়াদ)

'বাদশাহ্ যে কাজই করেন, তাহাই মিষ্ট।'

হযরত বাহ্লূল দানা জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, আজকাল কিরূপে দিনাতিপাত করিতেছেন? উত্তর হইল, ঐ ব্যক্তির আনন্দের কথা কি জিজ্ঞাসা

করিতেছ—যাহার খাহেশের বিরুদ্ধে জগতে কোন কিছুই হয় না। জগতে যাহাকিছু হয়, সবই তাহার খাহেশ মোতাবেক হয়। বাহ্‌লূল বলিলেন, ইহা কিরূপে? উত্তর হইল-জগতে যাহা কিছু হয়, তাহা নিশ্চয়ই খোদা তা'আলার ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে। আমি আপন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ফানা করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখন যাহা কিছু হইতেছে, তাহা আমার খাহেশেরও অনুরূপ হইতেছে।

বলুন, যে ব্যক্তি নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খোদার আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তাহার চিন্তা কিসের? তাহার চেয়ে বেশী সুখ শান্তি আর কাহার হইবে? বন্ধুগণ, কোন খোদাপ্রেমিক যখন অসুস্থ হন, তখন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখুন। তিনি নিঃস্ব হইলেও তাহাকে মোটেই পেরেশান দেখিবেন না।

॥ ধনীদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ॥

এরপর কোন রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট যাইয়া দেখুন অসুস্থ অবস্থায় সে যারপরনাই পেরেশান রহিয়াছে। বাহ্যতঃ যদিও তাহার খেদমতগার ও শুশ্রূষাকারী প্রচুর রহিয়াছে তবুও শান্তিতে নহে—দারুণ কষ্টে রহিয়াছে। অসুস্থ অবস্থায় ধনী ও বড়লোকদের ভাগ্যে খুব কমই মনঃপুত খাদেম ও শুশ্রূষাকারী মিলে। অধিকতর ইহাই দেখা গিয়াছে যে, অসুখে-বিসুখে শারিরীক শান্তিও দ্বীনদারগণ ধনীদের চেয়ে বেশী লাভ করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি কোন বুযুর্গ অসুস্থ হইলে তাঁহাকে মনে প্রাণে খেদমত করার মত বহু আত্মোৎসর্গকারী খাদেম জুটিয়া যায়, কিন্তু ধনীদের বেলায় এরূপ খাদেম একজনও জুটে না। তাহাদের খেদমতগার শুধু ভাসা ভাসা অন্তরে খেদমত করিয়া থাকে। কিন্তু কোন বুযুর্গ অসুস্থ হইলে প্রত্যেক মুরীদ ও প্রত্যেক আলেম অন্তরের সহিত তাঁহার আরোগ্য লাভের জন্য দোআ করে। পক্ষান্তরে ধনীদের জন্য একজনও অন্তরের সহিত দোআ করে না।

জনৈক বিত্তশালী লোক অসুস্থ হইলেন। চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলে তাঁহার ওয়ারিসগণ উহা গোপন করিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য এই ঔষধ ব্যবহার করার পর তিনি আরোগ্য লাভ করিলে আবার সমস্ত মাল-দৌলত ও শাসন কার্য তাহার হাতেই থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল মালদারদের অবস্থা। ইহার বিপরীতে আমি চরখাওল নামক স্থানের জনৈক মজুর শ্রেণীর লোককে দেখিয়াছি। সে অসুস্থ হওয়ার পর তাহার সন্তানগণ ও পরিবারের লোকগণ অযীফা পাঠ করত তাহার আরোগ্যলাভের জন্য দোয়া করিত। তাহারা মনে প্রাণে কামনা করিত যে, খোদা করুন, সে না মরুক এবং সুস্থ হইয়া উঠুক।

বলুন, এরপরও কি কেহ বলিতে সাহস করিবে যে, ধনাঢ্যতা দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয়? কখনই নহে; বরং সত্য এই যে, জাগতিক সাফল্যও দ্বীনদারী দ্বারাই

লাভ হয়। ইহার একটি প্রকাশ্য প্রমাণ এই যে, দুনিয়াদার ব্যক্তিরা দুনিয়ার প্রয়োজনাদি হাছিলের জন্য দ্বীনদারদের দ্বারে উপস্থিত হয়। আপনি হাজার হাজার দুনিয়াদারকে বুযুর্গদের দ্বারে ধর্না দিতে দেখিবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াদারদের মতেও দুনিয়া শুধু দ্বীনদারদের নিকটই পাওয়া যায়। এই কারণেই তাহারা দুনিয়ার প্রয়োজনাদির কথা লইয়া দ্বীনদারদের খেদমতে উপস্থিত হয়। ইহার বিপরীতে আপনি কোন দ্বীনদার বুযুর্গকে দুনিয়ার প্রয়োজন লইয়া দুনিয়াদারদের নিকট যাইতে দেখিবেন না। অতএব, বুঝা গেল যে, দুনিয়াদারগণ পরমুখাপেক্ষী এবং দ্বীনদারগণ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে ; যদিও তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা। এরপর প্রত্যক্ষ ঘটনা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিতাবাদি পাঠেও জানা গিয়াছে যে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। অর্থাৎ, দুনিয়াদাররা দ্বীন-দারদের সর্বকালেই মুখাপেক্ষী হইয়াছে ; কিন্তু দ্বীনদারগণ তাহাদের মুখাপেক্ষী হন নাই।

گدا پادشاهست و نامش گدا

(গাদা বাদশাহাস্ত ও নামাশ গাদা)

‘ফকীর শুধু নামেই ফকীর নতুবা আসলে সে বাদশাহ।’

হাঁ, যদি এমন কোন দুনিয়াদার হয় যে, আল্লাহ্ তা’আলা তাহাকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি দান করিয়াছেন, যেমন কোন আল্লার ওলী বাদশাহ্ও ছিলেন, তবে সে ঐ সময়কার সোলায়মান (আঃ)। এরূপ ব্যক্তি দ্বীনদারদের মুখাপেক্ষী নাও হইতে পারে ; কিন্তু দ্বীনদারীর বদৌলতেই সে তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় নাই। শুধু দুনিয়াদার হইলে সে কখনও দ্বীনদারদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পারিত না। আমার বক্তব্যও এই বিষয়েই যে, কেহ শুধু একটি দৌলতের অধিকারী হইলে দ্বীন ও দুনিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল ? এ প্রসঙ্গে আমি বলিতেছি যে, দ্বীনদারগণ মাল-দৌলত ছাড়াই কামিয়াব এবং দুনিয়াদারগণ দ্বীনদার ব্যতীত কামিয়াব হইতে পারে না ; বরং সর্বদাই পেরেশান থাকিবে। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করা ব্যতীত দুনিয়ার শান্তিও লাভ হইতে পারে না।

॥ অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য ॥

কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ইউরোপবাসীরা দ্বীনদারী ব্যতিরেকেই শান্তিতে আছে। ইহা কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা শান্তিতে নহে। আপনি শুধু তাহাদের সাজসরঞ্জাম দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাহারা শান্তিতে আছে। অন্তরের শান্তিকেই আসলে শান্তি বলা হয়। খোদার কসম, বিধর্মীরা ইহা লাভ করিতে পারে না। এই উত্তরটির স্বরূপ সকলেই বুঝিতে সক্ষম নহে ;

বরং বিধর্মীদের মনের খবর যাহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারাই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি অন্য একটি উত্তর দিতেছি।

তাহা এই যে, ধরিয়া লইলাম তাহারা আরামে আছে; কিন্তু আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত তুলনা করিতে পারেন না। তাহারা দ্বীনদারী ব্যতিরেকেই দুনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারে; কিন্তু আপনি দ্বীন ব্যতীত কিছুতেই দুনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, আপনি হইলেন আনুগত্যের দাবীদার আর তাহারা দাবীদার নহে; বরং কুফরের পথ ধরিয়া খোদাদ্রোহী হইয়া গিয়াছে। অতএব, আপনার সহিত একজন আনুগত্যের দাবীদারের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। অর্থাৎ, কথায় কথায় পাক্‌ড়াও করা হইবে এবং শরীয়তের সীমার সামান্য বাহিরে পা বাড়াইলেই শাস্তি দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। বিদ্রোহী প্রতি দিন একশত বার আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহাকে আংশিকভাবে পাকৃড়াও করা হয় না। উদাহরণতঃ বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্ক সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করে এবং একজন তুর্কী নাগরিকও সুলতানের কোন হুকুম অমান্য করে। এমতাবস্থায় বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলির আংশিক বিরুদ্ধাচরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না; বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহের শাস্তি এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। বিদ্রোহের পর তাহারা কি কি আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে—এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইবে না। কেননা, বিদ্রোহ স্বয়ং এত বড় অন্যায় যে, ইহার সম্মুখে অন্যান্য অপরাধ অস্তিত্বহীন। পক্ষান্তরে কোন তুর্কী নাগরিক আইনের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করিতেই সে অনতিবিলম্বে শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কেননা, সে নিজেকে সুলতানের অনুগত বলিয়া যাহির করে। এই কারণে তাহাকে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পাক্‌ড়াও করা হইবে।

আলোচ্য বিষয়েও তদ্রূপ মনে করুন: সামান্য বিরুদ্ধাচরণের ফলেই মুসলমানকে শাস্তি দেওয়া হয়। কোন গোনাহ্ করিতেই কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দুনিয়ার শান্তি ছিনাইয়া লওয়া হয়। বাহ্যিক সাজসরঞ্জাম তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া না লইলেও অন্তরের শান্তি ছিনাইয়া লইতে মোটেই বিলম্ব করা হয় না। অথচ অন্তরের শান্তিই হইল সাফল্যের আসল স্বরূপ। এইরূপ ছিনাইয়া লওয়ার কারণ এই যে, মুসলমান আনুগত্যের দাবীদার, পক্ষান্তরে কাফেরদের আংশিক কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ করা হয় না। তাহাদিগকে বিদ্রোহের সাজা এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। এই সাজা দেওয়ার জন্য একটি মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি বলিতে পারেন যে, তবে আনুগত্যের দাবী না করিয়া বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাই তো শ্রেয়ঃ। ইহাতে কমপক্ষে প্রতিদিনকার পাক্‌ড়াও হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। বুঝিয়া লউন, অনুগত

ব্যক্তির সাজা এখনই হইয়া যাইবে। এই সাজা ভোগ করার পর সে অনন্তকাল শান্তিতে থাকিবে। উদাহরণতঃ, কোন তুর্কী চুরি কিংবা যিনা করিলে তখনই কিছু দিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখা হইবে। জেলের মেয়াদ শেষ হইলে সে আবার সরকারী বিভাগে চাকুরী লইতে পারে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহীকে কয়েকদিন কিংবা কয়েক বৎসর কিছু বলা না হইলেও যখন ধরা হইবে, তখন তাহার শাস্তি ফাঁসির চেয়ে কম হইবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে, তাহাকে দুনিয়াতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন ধরা হইবে, তখন অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করা ব্যতীত তাহার অন্য কোন শাস্তি হইবে না। ইহার পর আপনি স্বাধীন, এতদুভয়ের যে কোন পথ অবলম্বন করুন।

মোটকথা, দুই উপায়েই সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। হয় সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া, এমতাবস্থায় বিদ্রোহের সাজা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শান্তিতে থাকা যাইবে—না হয় সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া এমতাবস্থায় চিরকালের জন্য শান্তি লাভ হইবে। দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। কিন্তু অনুগত ও নাফরমান উভয়টি হইয়া দুনিয়ার শান্তি লাভ হইবে না। তবে আখেরাতে কিছু শাস্তি ভোগ করার পর শান্তি পাওয়া যাইবে। সারকথা এই যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—যাহা সাফল্যের বুনিয়াদ, পূর্ণ দ্বীনদারী ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।

এই বিষয়বস্তুটি বর্ণনা করার কারণ এই যে, আজকাল সকলেই সাফল্যকামী, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দুনিয়ার সাফল্য তলব করে। এজন্য আমি বলিয়া দিয়াছি যে, দুনিয়ার সাফল্যও ধর্মের অনুসরণ করিলে অর্জন করা যায়। ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত মুসলমান ইহা অর্জন করিতে পারিবে না। এক্ষণে মুসলমানগণই আমার সম্বোধনের লক্ষ্য। এই মাসআলাটি আয়াতের لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'যাহাতে তোমরা কামিয়াব হইতে পার' অংশ হইতে বুঝা গেল। এখানে لَعَلَّ শব্দটি সন্দেহের জন্য নয়; বরং আশান্বিত করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব আ'মল পালন করিয়া সাফল্যের জন্য আশাবাদী হও। ইহা হইতে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, ইহাতে কোনরূপ ওয়াদা দেওয়া হয় নাই। কাজেই সাফল্য লাভ নাও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহা বাদশাহসুলভ কালাম। বাদশাহ কাহাকেও আশা দিয়া নিরাশ করেন না। বাদশাহসুলভ কালামে আশাবাদী হওয়া হাজার হাজার মজবুত ওয়াদা হইতেও বেশী আশাব্যঞ্জক। সন্দেহ দূর করণার্থে হক তা'আলা কোন কোন স্থানে মজবুত ওয়াদাও করিয়াছেন। সে মতে একস্থানে বলেনঃ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'মোমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে হক তা'আলা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ حَقًّا عَلَيْنَا বলিলেন না কেন? কোন কোন স্থানে لَعَلَّكُمْ বলিলেন কেন?

ইহাতে একটি রহস্য আছে। আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায় ইহা বুঝিয়াছেন। তাহা এই যে, মজবুত ওয়াদার পর কোন কোন স্থানে لعلكم বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, আমি ওয়াদা করিয়া অপারগ হইয়া যাই নাই ; বরং এখনও প্রতিদান দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, আমাকে তাগিদ কর এবং ওয়াদা পালন করিতে বাধ্য মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বকিতে থাক। আমার শান এইরূপ : لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ 'খোদা তা'আলা যাহা করেন তজ্জন্য কাহারও কাছে জিজ্ঞাসিত হইবেন না, কিন্তু বান্দারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

ইহা স্বতন্ত্র কথা যে, আমি ওয়াদা করিলে তাহা অবশ্যই পালন করিব, কিন্তু তজ্জন্য বাধ্য নহি ; বরং ওয়াদা করার পরও আমি পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। কাজেই তোমরা لَعَلَّكُمْ-এর অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখ لَاَنَّ-এর জন্য গর্ব করিও না যদিও আমার নিকট لَعَلَّ শব্দটি لَاَنَّ শব্দটির ন্যায়ই মজবুত। একমাত্র আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি সম্যক বুঝিয়াছেন। এক্ষেত্রে মো'তাযেলা সম্প্রদায়ই বহু ধোকা খাইয়াছে। তাহাদের মতে কোন কোন বিষয় খোদার জন্যও ওয়াজেব। এ পর্যন্ত প্রথম ও শেষাংশ বর্ণিত হইল।

॥ সাফল্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ॥

এখন আমি আয়াতের মধ্যস্থলে উল্লেখিত আহ্‌কাম বর্ণনা করিব। এইসব আহ্‌কামের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে। এগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ। এইজন্য সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়া দিব। সম্পূর্ণ বিস্তারিত অবশ্য হইবে না, তবুও কিয়ৎপরিমাণে যে হইবে না, তাহা নহে। চারিটি বিষয়ের উপর সাফল্য নির্ভরশীল। (১) اِصْبِرُوْا 'ধৈর্য ধারণ কর' (২) وَصَابِرُوْا 'এবং মোকাবিলার সময় ধৈর্যশীল থাক' (৩) وَرَابِطُوْا 'এবং মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক' এবং (৪) وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'খোদাকে ভয় কর।'

আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, এই সব আহ্‌কামের সম্বন্ধ সমস্ত সূরার বরং পূর্ণ শরীয়তের এমন কি যাবতীয় জাগতিক মঙ্গালামঙ্গলের সহিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা বর্ণনা করিতে চাই। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আ'মল দুই প্রকার। (১) যে আ'মলের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং (২) যে আমলের সময় উপস্থিত হয় নাই। এখানে একটি নির্দেশ প্রথম প্রকারের সহিত এবং একটি নির্দেশ দ্বিতীয় প্রকারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের সহিত اصبروا নির্দেশটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, যে আ'মলের সময় উপস্থিত হইয়া পড়ে উহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং অটল থাক। অতএব, اصبروا অংশের মধ্যে হক তা'আলা উপস্থিত আ'মলসমূহে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ

দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক কাজ পাবন্দী ও দৃঢ়তার সহিত করাই দ্বীনদারীর অর্থ। আজকাল মানুষ জোশ ও আবেগের মাথায় অনেক কাজ শুরু করিয়া দেয়, কিন্তু পরে শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা হয় না। ইহা কামেল দ্বীনদারী নহে। এই কারণে যতটুকু কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা যায়, খোদা তা'আলা ততটুকু কাজ করিতেই বলিয়াছেন। সমস্ত ওয়াজেব, ফরয ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা কঠিন নহে। এরচেয়ে বেশী কাজ হইলে অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক শেষ পর্যন্ত কুলাইয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের উচিত এতটুকু কাজই হাতে লওয়া, যতটুকু স্থায়ীভাবে শেষ পর্যন্ত করিতে পারে। অতএব, اصبروا নির্দেশটির সম্বন্ধ হইল উপস্থিত কাজ-কর্মের সহিত।

উপস্থিত কাজ-কর্মও দুই প্রকার (১) যে-কাজের সম্বন্ধ শুধু নিজের সহিত এবং (২) অন্যের সহিতও যেকাজের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে صابروا নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্যের সহিত কাজ করার বেলায় ছবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। কিছু সংখ্যক লোক ব্যক্তিগত কাজ করিতে পারে। যেমন, নামায ইত্যাদি; কিন্তু অন্যের ব্যাপারে মোটেই সাহস প্রদর্শন করে না। কিছু সাহস দেখাইলেও তাহা অন্যের তরফ হইতে বাধা না আসা পর্যন্তই দেখাইতে পারে। কেহ বাধা দিলেই তাহারা সাহস হারাইয়া ফেলে। উদাহরণতঃ, শাদী-বিবাহের কু-প্রথার বেলায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের প্রতিবন্ধকতা এড়াইতে পারে না। পাত্রীপক্ষ ইচ্ছামত পাত্রপক্ষকে নাচাইয়া ছাড়ে। অতঃপর তাহারা ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তা বজায় রাখিতে পারে না। এ সম্বন্ধে صابروا নির্দেশে বলা হইয়াছে যে, অন্যের মোকাবিলার সময়ও অটল থাক। তদ্রূপ কখনও খোদার শত্রুগণ ধর্মের ব্যাপারে বাধাদান করিতে থাকিলে তাহাদের মোকাবিলায়ও অটল থাকিতে صابروا অংশে নির্দেশ রহিয়াছে।

মোটকথা, যেসব কাজ-কর্মে অন্যের মোকাবিলা করিতে হয় না, উহাদিগকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করার নির্দেশ اصبروا অংশে দেওয়া হইয়াছে আর যেগুলিতে অন্যের সহিত মোকাবিলা করিতে হয়, উহাতে অটল থাকার নির্দেশ صابروا অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি হইল উপস্থিত কাজকর্ম। এমন কিছু কাজকর্মও আছে যাহাদের এখনও সময় আসে নাই।

॥ رابطوا অংশের তফ্‌সীর ॥

উহাদের সম্বন্ধে رابطوا বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, এইসব কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এই অর্থ বুঝার কারণ এই যে, অভিধানে رباط শব্দের অর্থ শত্রুর মোকাবিলায় সীমান্তে ঘোড়া সন্নিবেশ

করা অর্থাৎ, ব্যূহ রচনা করা। ইহা জানা কথা যে, ব্যূহ রচনা পূর্ব হইতেই মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসাবে করা হয়। ইহা হইল رباط -এর আভিধানিক তফ্‌সীর।

ইহার অপর একটি তফ্‌সীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই— اِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, এক নামায পড়ার পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এ সম্বন্ধে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন : فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ 'ইহাই রিবাত—ইহাই রিবাত।' এই তফ্‌সীরে ও প্রথম তফ্‌সীরে কোনরূপ বিরোধ নাই; বরং এই হাদীসে হুযূর (দঃ) আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, রিবাত শুধু বাহ্যিক শত্রুর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে; বরং বাহ্যিক শত্রুর ন্যায় আত্মিক শত্রু অর্থাৎ, নফ্‌স ও শয়তানের মোকাবিলায়ও রিবাত হইয়া থাকে। উহা বাহ্যিক মুজাহাদার রিবাত এবং ইহা আত্মিক মুজাহাদার রিবাত। অন্য এক হাদীসে হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ -

অর্থাৎ, 'মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে আপন নফ্‌সের মোকাবিলায় মুজাহাদা করে এবং মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গোনাহ্ খাতা ত্যাগ করে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নফসের সহিত মুজাহাদা করাও এক প্রকার মুজাহাদা এবং ইহার জন্যও রিবাত আছে। বাহ্যিক শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য যেমন পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ নফ্‌স ও শয়তানের মোকাবিলায়ও ব্যূহ রচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ইহাও যথেষ্ট পরাক্রমশালী শত্রু। ব্যূহ রচনা ব্যতীত ইহাকে কাবু করা কঠিন। তাই কবি বলেন :

اے شہاں کشتیم ما خصمے بروں + ماند خصمے زو تبر در اندروں

(আয় শাহাঁ কুশ্‌তীম মা খছমে বেরুঁ + মানদ খছ্‌মে যু তবর দর আন্দরুঁ)

'হে বুযুর্গগণ। আমরা বাহ্যিক শত্রু হত্যা করিয়াছি; কিন্তু আভ্যন্তরীণ শত্রু অর্থাৎ, নফ্‌স রহিয়া গিয়াছে। ইহা বাহ্যিক শত্রু হইতেও ভয়ঙ্কর।' আরও বলেন :

کشتن ایں کار عقل و ہوش نیست + شیر باطن سخرۂ خرگوش نیست

(কুশ্‌তানে ঈ কারে আক্‌ল ও হুশ নীস্ত + শেরে বাতেন সাখ্‌রায়ে খরগোশ নীস্ত)

অর্থাৎ, 'এই আভ্যন্তরীণ শত্রুকে পদানত করা বুদ্ধি-বিবেকের কাজ নহে কেননা, আভ্যন্তরীণ সিংহ খরগোশের (বুদ্ধি-বিবেকের) ফাঁদে পড়ে না। অতএব, উহাকে পদানত করার জন্য হযরত (দঃ)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়। রিবাত অর্থাৎ নামাযের পর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ঐ শিক্ষারই একটি অংশ। নফসের পক্ষে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কেননা ইহাতে কোন আনন্দরস নাই। ব্যস, নামায পড়িয়া খালি খালি বসিয়া থাকা এবং অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

আজকাল কেহ কেহ প্রশ্ন করে যে, এইভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকায় লাভ কি? আমি বলি, ইহাতে দুইটি উপকার নিহিত আছে। প্রথমতঃ নফসকে এবাদতে জমানো হয়। দ্বিতীয় উপকারটি হযরত (দঃ) এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন। তাহা এই : اِنَّ الْعَبْدَ فِى الصَّلٰوةِ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ—বান্দা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে। অর্থাৎ, নামায পড়িলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেও সেই সওয়াবই পাওয়া যায়। যেহেতু সওয়াব জিনিসটি চোখে দেখা যায় না, তাই এইরূপ অপেক্ষা করা নফসের জন্য বোঝাস্বরূপ। এই কারণেই হুযূর (দঃ) ইহাকে রিবাত আখ্যা দিয়াছেন। ইহা রিবাতের দ্বিতীয় তফসীর। ইহা প্রথম তফসীরেরও সমর্থন করে। উভয় তফসীরেই একটি বিষয় সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাহা হইল অনাগত এবাদত ও কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা। সুতরাং رباط-এর মূল অর্থ হইল প্রস্তুতি বা তৈরী। এই কারণেই আমি رابطوا-এর তফসীরে বলিয়াছি : যেসব কাজের সময় উপস্থিত হয় নাই, উহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

অতএব, যেসব কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের বেলায় ছবর এবং যেসব কাজের সময় এখনও আসে নাই উহাদের বেলায় রিবাতের প্রয়োজন। ধর্মের সারমর্ম ইহাই। অর্থাৎ, যেসব কাজের সময় আগত, উহাদিগকে পাবন্দী ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করা এবং যেসব কাজের সময় অনাগত উহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কখনও নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে; বরং এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত :

اندریں راہ می تراش و می خراش + تا دم آخر دمے فارغ مباش
تا دم آخر دمے آخر بود + کہ عنایت باتو صاحب سر بود

(আন্দরীঁ রাহ্ মীতারাশ ও মীখারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ
তা দমে আখের দমে আখের বুয়াদ + কেহ্ এনায়েত বাতূ ছাহেব সর বুয়াদ)

অর্থাৎ, 'এই পথে খুব পরিশ্রম কর এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষান্ত হইও না। কেননা, শেষ পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, যখন খোদা তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী হইয়া যাইবে।'

ব্যস, দ্বীনদারী হইল মানুষের উপর সর্বদাই একটি ধোন চাপিয়া থাকা। কাজে লাগিয়া থাকা কিংবা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা।

॥ আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কের উপায় ॥

মুসলমানগণ! একজন অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায় যে অবস্থা দেখা দেয়, খোদার বেলায়ও কমপক্ষে সেইরূপ হওয়া উচিত। অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায়

আশেক তাহার ধ্যানেই সর্বদা মগ্ন থাকে। দুনিয়ার সমস্ত কাজকারবারও করে; কিন্তু তাহার কল্পনা কখনও মন হইতে উধাও হয় না। তাহার অবস্থা হয় এইরূপ ঃ

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

(চুঁ মীরাদ মুব্‌তলা মীরাদ চুঁ খীযাদ মুবতলা খীযাদ)

'মরিলেও তাহার খেয়ালে মগ্ন, জীবিত থাকিলেও তাহার ধ্যানে মত্ত।' জীবন্মৃত পতিতার আশেকের যে অবস্থা হয় খোদার তালেবেরও কমপক্ষে সেইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। পতিতার কল্পনা কখনও আশেকের অন্তর হইতে দূরিভূত হয় না।

عشق مولی کے کم از لیلی بود + گوی گشتن بہر او اولی بود

(এশকে মাওলা কায় কম আয লায়লা বুয়াদ + গু গাশ্‌তান বহ্‌রে উ আওলা বুয়াদ)

'খোদার এশ্‌ক লায়লীর এশ্‌ক হইতে কম কিসে? বরং তাহা অপেক্ষা আরও অগ্রগামী। কাজেই তাঁহার অনুগত হওয়া আরও বেশী উত্তম।'

বন্ধুগণ! খোদার মহব্বত কি সৃষ্টজীবের মহব্বত হইতেও কম হইয়া গেল? কম না হইয়া থাকিলে খোদার জন্য তদ্রূপ প্রযত্ন নাই কেন? খোদার কসম, যে সত্যিকার তালেব হইবে, তাহার অন্তরে সর্বদাই খোদাকে লাভ করার জন্য অদম্য প্রেরণা থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধেই কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

'তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।'

জনৈক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে যে, আমরা দুনিয়ার কাজ-কারবারও করিব, তৎসঙ্গে খোদা তা'আলাকেও স্মরণ রাখিব—ইহা কিরূপে হইতে পারে? আমি বলিলাম, যেমন খোদার কাজ করার সময় আপনার দুনিয়া স্মরণ থাকে, তদ্রূপ দুনিয়ার কাজ করার সময় খোদার স্মরণ হইতে পারে। এক কাজ করার সময় যদি অন্য কাজ স্মরণ না থাকে, তবে নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের সময় দুনিয়া স্মরণ থাকে কিরূপে। দুনিয়ার কাজ-কারবারের সঙ্গে খোদা স্মরণ থাকা আশ্চর্যজনক হইলে নামাযে দুনিয়া স্মরণ থাকাও আশ্চর্যজনক হইবে। ইহা আশ্চর্যজনক না হইলে উহা আশ্চর্যজনক হইবে কেন?

আসল কথা এই যে, যে জিনিস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, উহা সকল কাজের সময়ই স্মরণ থাকে। আমাদের অন্তরে দুনিয়া ঘর করিয়া বসিয়াছে। এই কারণে খোদার কাজের বেলায়ও ইহা স্মরণ থাকে। কোন দিন যদি খোদা আমাদের অন্তরে ঘর করিয়া লয়, তবে দুনিয়ার কাজের সময় তাঁহারও স্মরণ থাকিবে। প্লেগ রোগের বদৌলতে ইহার একটি নযীর পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা একটি হাদীসের অর্থও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ
نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ -

অর্থাৎ, 'সকাল হইলে তোমার অন্তরে যেন বিকালের চিন্তা না থাকে এবং বিকাল হইলে যেন সকালের চিন্তা না থাকে। তুমি নিজকে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর।' হুযুর (দঃ)-এর এই এরশাদ কিছু সংখ্যক লোকের বুঝে আসিত না। তাহারা বলিত যে, নিজকে এরূপ মনে করিলে তুনিয়ার সমস্ত কাজকারবার বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য। কেহই তুনিয়ার কোন কাজ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু প্লেগ এই সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিয়াছে। প্লেগের প্রাতুর্ভাব দেখা দেওয়ার সময় তুনিয়ার কোন কাজকারবার বন্ধ থাকে নাই। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে, কৃষক কৃষিকাজে ব্যস্ত রহিয়াছে, চাকুরীজীবি চাকুরীর কাজে লাগিয়া রহিয়াছে। রেল, তার, ডাক ও কারখানা পূর্বের ন্যায় চালু রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কেহই সকাল বেলায় বিকালের আশা করিত না এবং বিকাল বেলায় সকালের আশা করিত না। প্রত্যেকের মনেই মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজমান ছিল। কাজেই তখন সমস্ত কাজকর্মও চলিল এবং মৃত্যুর 'মোরাকাবা' (ধ্যান)-ও সামিল হইয়া গেল।

হুযূর (দঃ) ইহাই বলিয়াছেন যে, প্লেগ ও কলেরার প্রাতুর্ভাবের সময় তোমরা যেরূপ হইয়া যাও, বার মাস তদ্রূপই থাক। কিন্তু আজকাল অবস্থা এই যে, কোনরূপে প্লেগ বিদায় হইতেই মানুষ আবার নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। খোদাতা'আলা এখন যেন তাহাদিগকে মারিতেই পারিবেন না। প্লেগের প্রাতুর্ভাবের সময় যেমন সব কাজ-কর্মের সহিত মৃত্যুর কল্পনাও লাগিয়া থাকে এবং ইহাতে কোন কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ খোদাপ্রেমিকদের তুনিয়ার কাজকর্ম করার সময় খোদাও স্মরণ থাকে। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

'তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।'

তুনিয়ার কাজে তাঁহাদের কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا আয়াতে উল্লেখিত এইসব নির্দেশেরও সারমর্ম ইহাই যে, যে সময়ের যে কাজ, তাহা করিয়া যাও। যে কাজের সময় এখনও আসে নাই; উহার ধ্যানে থাক এবং পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাক। (আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের ধ্যানে থাকা এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাও আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে খোদার স্মরণ অন্তরে গাথিয়া যায়।)

॥ আনন্দ লক্ষ্য নহে ॥

'اصبروا' বলায় আরও একটি মাসআলা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, আসল লক্ষ্য হইল আহ্‌কামের পাবন্দী করা—আনন্দ লক্ষ্য নহে। অতএব, কেহ পাবন্দী সহকারে আহ্‌কাম পালন করিলে যদিও আনন্দ ও স্বাদ না পায় তবুও সে উদ্দেশ্যে সফলকাম। নিরানন্দ কাম্য না হইলে হক তা'আলা 'اصبروا' ধৈর্য ধারণ কর' বলিতেন না। অতএব, স্থানে স্থানে যত্ন সহকারে 'اصبروا' বলায় বুঝা যায় যে, আনন্দ উদ্দেশ্য নহে; বরং ছবর ও দৃঢ়তা উদ্দেশ্য। পরিতাপের বিষয়, আজকাল অনেক 'সালেক' (খোদার পথের পথিক) ব্যক্তি এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, হায়, আমরা এবাদতে আনন্দ পাই না। এই অবস্থাটিকে তাহারা এবাদতের ত্রুটি মনে করে। প্রকৃত পক্ষে ইহা নফ্‌সের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। নফ্‌স দুনিয়াতেও আনন্দ পাইতে চায়। অথচ এবাদত দ্বারা দুনিয়াতে আনন্দ লাভ কাম্য নহে; বরং ইহার ফলে আখেরাতে আনন্দ লাভ হইবে। কিন্তু চাওয়া ব্যতিরেকেই যদি কেহ আনন্দ পাইয়া ফেলে, তবে এই আনন্দও অনর্থক নহে; বরং ইহা খোদা তা'আলার একটি নেয়ামত। ইহাকে হেয় মনে করা সমীচীন নহে। কেননা, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুবই উপকারী। কাজেই এই দৌলত যাহার লাভ হয়, সে কষ্টের সওয়াবের কথা শুনিয়া আনন্দের অবসান যেন মনে না করে। পক্ষান্তরে ইহা কাহারও লাভ না হইলে সে যেন ইহার পিছনেও না পড়ে। মোটকথা, খোদা তা'আলা যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি তোমাদের জন্য যে অবস্থাকে মঙ্গলজনক মনে করেন, উহাই উত্তম :

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست
بعندلیب چه فرمودهٔ که نالاں ست

(বগুশে গোল চেহ্ সখোন গুফ্‌তায়ী কেহ খান্দাঁ আস্ত
বএন্দালীব চেহ্ ফরমুদায়ী কেহ নালাঁ আস্ত)

'ফুলের কানে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে কেবল হাস্য করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়াছ যে, সে কেবলই কাঁদে।'

উদাহরণতঃ, চিকিৎসক এক রোগীকে হাব্বে আয়ারেজ দেয় এবং এক রোগীকে খামীরা গাওযবান দেয়। এক্ষেত্রে কেহ প্রতিবাদ করে না যে, তাহাকে মিষ্ট ঔষধ এবং আমাকে তিক্ত ঔষধ কেন দিলেন? এব্যাপারে সকলেই জ্ঞানী হইয়া যায় এবং বলে যে, ভাই, তাহার জন্য ইহাই উপকারী এবং ঐ ব্যক্তির জন্য উহাই মুনাসিব। কিন্তু আত্মিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ চিকিৎসকের কার্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, অমুককে খোদা তা'আলা আনন্দিত ও উৎফুল্ল রাখিলেন, আর আমাকে কষ্ট ও সঙ্কোচ দিয়াছেন। জানি না, সে খোদার প্রিয় কেন?

বন্ধুগণ, কেহই প্রিয় নহে—সকলেই গোলাম। গোলামের প্রস্তাব দেওয়ার কোন অধিকার নাই। গোলামের অবস্থা গল্পে বর্ণিত এই গোলামের ন্যায় হওয়া উচিত। গল্পটি এইরূপ : কেহ একটি গোলাম ক্রয় করতঃ বাড়ী আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি ? গোলাম বলিল, এতদিন যে নাম ছিল, তাহা তো ছিলই আজ হইতে আপনি আমাকে যে নামে ডাকিবেন, তাহাই আমার নাম হইবে। মালিক জিজ্ঞাসা করিল, তোর খাদ্য কি ? গোলাম বলিল এতদিন যাহাই খাইতাম, কিন্তু আজ হইতে আপনি যাহা খাওয়াইবেন, আমি তাহাই খাইব। বন্ধুগণ, গোলামের রুচি এইরূপ হওয়া দরকার।

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو
دل شده مبتلاء تو هرچه کنی رضائے تو

(যিন্দা কুনী আতায়ে তু ওর বকুশী ফেদায়ে তু
দিল শোদাহ্ মুব্তালায়ে তু হরচেহ্ কুনী রেযায়ে তু)

'জীবিত রাখ তোমার অনুগ্রহ, আর মারিয়া ফেল তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ। আমার অন্তর তোমার এশ্কে বিভোর। যাহাই করিবে, তোমার মর্জিতেই আমি খুশী।' আর এই ধর্ম হওয়া উচিত :

خوشا وقت شوریدگان غمش + اگر ریش بینند وگر مرهمش
گدایان از بادشاهی نفور + بامیدش اندر گدائی صبور
دمادم شراب الم در کشند + وگر تلخ بینند دم در کشند

(খোশা ওয়াক্তে শোরীদগানে গমাশ + আগর রীশ বীনান্দ ওগার মরহমশ
গাদায়াঁ আয বাদশাহী নুফুর + বউম্মেদাশ আন্দর গাদায়ী ছবুর
দমাদম শরাবে আলম দর কাশান্দ + ওগার তল্‌খ বীনান্দ দম দর কাশান্দ)

'তাঁহার চিন্তায় মত্তদের সময় খুবই মোবারক—আঘাত পাউক বা নম্র ব্যবহার। ফকিরগণ বাদশাহীকে ঘৃণা করেন। তাঁহার আশায় তাঁহারা দারিদ্র্যের মধ্যেই ধৈর্য্য ধারণ করেন। তাঁহারা অহরহ কষ্টের শরাব পান করেন তিক্ত মনে হইলেও নিশ্চুপ থাকেন।'

মহব্বতের পথ এমনি বস্তু যে, ইহাতে তালেবের প্রস্তাব করার কোন অধিকার নাই। নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার নামই মহব্বত। কাজেই এরূপ রব কেন উঠে যে, হায়, এমন হইলে ভাল হইত, অমন হইলে ভাল হইত! বন্ধুগণ, আজকাল তো এবাদতে শুধু নিরানন্দ ও বিস্বাদই আছে। ইহাতেই আপনি ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছেন। বুযুর্গগণ এক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন আপনি উহাদের সম্মুখীন হইলে আসল স্বরূপই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত।

॥ বুযুর্গদের পরীক্ষা ॥

এই পথে বুযুর্গগণ এমন সব নির্মমতার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, উহাদের তুলনায় এই সামান্য নিরানন্দ কিছুই নহে। জনৈক বুযুর্গ তাহাজ্জুদের সময় অদৃশ্য জগত হইতে আওয়ায শুনিতে পাইলেন যে, যাহাই কর না কেন, আমার এখানে বিন্দুমাত্রও কবুল হইবে না। এই আওয়াযটি এত সশব্দে হয় যে, তাঁহার একজন খাদেমও তাহা শুনিতে পাইল। কিন্তু বুযুর্গ এমন আশেক ছিলেন যে, ইহাতে সামান্যও দমিয়া গেলেন না; বরং এরপরও ওযু করিয়া নামাযে মশ্‌গুল হইয়া গেলেন। পর দিবস আবার লোটা-বদনা লইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে উঠিলেন। খাদেম বলিল, হুযুর তিনি যখন কর্ণপাতই করেন না এবং মোটেই কবুল করেন না, তখন আপনিই কেন এত কষ্ট করিবেন? বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ুন। ইহা শুনিতেই বুযুর্গের মধ্যে হাল প্রকাশ পাইল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বৎস, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি; কিন্তু তাঁহার দরজা ত্যাগ করার পর আমি যাইতে পারি— এমন কোন দরজা আছে কি? ইহা জানা কথা, আমার যাওয়ার যোগ্য আর কোন দরজা নাই। কাজেই আমি এই দরজায়ই প্রাণ বিসর্জন করিব। তিনি কবুল করুন বা না করুন। এই উত্তরে হক তা'আলার রহমত উথলিয়া উঠিল। এরপর আওয়ায আসিল:

قبول ست گرچه هنر نيستت + كه جز ما پنا هے دگر نيستت

(কবুল আস্ত গারচেহ্ হুনর নিস্তাত + কেহ্ জুয মা পানাহে দিগার নীস্তাত)

'কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও তোমার আমল কবুল করিলাম। কেননা, আমাকে ছাড়া তোমার কোন আশ্রয় নাই।'

আজকাল কেহ এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইলে সে সবকিছু ছাড়িয়া ছুড়িয়া পৃথক হইয়া বসিবে। কেননা, আজকালকার মহব্বত পূর্ণ নহে।

তদ্রূপ অপর একজন বুযুর্গ যিক্‌রের সময় এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইতেন যে, যতই যিক্‌র কর না কেন, কাফের অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হইবে। বহু দিন পর্যন্ত এই আওয়ায আসিতে দেখিয়া এবং কিছুতেই ইহা বন্ধ হইতে না দেখিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি ঘাবড়াইয়া গেলেন; কিন্তু আপন কাজ ছাড়িলেন না। অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি আপন শায়খের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন, শায়খের জীবিত থাকাও একটি বড় নেয়ামত বৈ নহে। শায়খ বলিলেন, ইহা মহব্বতের গালি বৈ কিছু নহে। আশেককে রাগাইয়া রাগাইয়া বিরক্ত করা মাশুকদের একটি অভ্যাস। অতএব, ইহাতে মনে কষ্ট আনা উচিত নহে।

একবার হযরত শিব্‌লী (রঃ) মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, হে শিবলী! তোমার নাপাক পদযুগল কি আমার

পথ অতিক্রম করার যোগ্য ? ইহা শুনিয়া শিব্‌লী (রঃ) থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবার আওয়ায আসিল, হে শিবলী ! তুমি আমার দিকে আসা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে কিরূপে ধৈর্য ধরিতে পারিলে ? চলিতেও দেন না, থামিতেও দেন না, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হযরত শিবলী সজোরে চীৎকার করতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুগণ ! জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগকে এমন এমন যাঁতাকলে পিষ্ট করা হইলে আপনাদের কি অবস্থা হইত ? এখন তো শুধু যিক্‌রেই আনন্দ পান না। ইহাতে আপনারা ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই কষ্টের উপর যদি সওয়াবও না পাইতেন, তবে আপনি কি করিতে পারিতেন ? মহব্বতের তাকিদ অনুযায়ী সওয়াব ছাড়াই ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এখন সওয়াবও পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় নিরানন্দ ও দুঃখ প্রকাশ কেন ? যদি আনন্দই কাম্য হইত, তবে আপনি দুনিয়াতেই আসিতেন কেন ? জান্নাতেই আনন্দ ছিল। সেখান হইতে দুনিয়াতে আনন্দের উদ্দেশ্যে আসেন নাই ; বরং কষ্ট ও বিস্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। কবি চমৎকার বলিয়াছেন :

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا کچھ خیال
سوجگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا

"নাস্তির নিদ্রায় কি অপার শান্তিই না ছিল। সেখানে প্রেমিকার কেশগুচ্ছের মোটেই উপদ্রব ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির সোরগোল আমাকে জাগ্রত করিয়া কি বিপদেই না ফেলিয়া দিল।"

হকতা'আলা স্বয়ং বলেন : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ‘আমি মানুষকে কষ্টে লিপ্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।’ জনাব, আপনি কে ? এই কষ্ট হইতে মহান ব্যক্তিগণও রেহাই পান নাই।

সেমতে দোজাহানের সর্দার হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ)-এর উপর প্রথমবার ওহী নাযিল হইয়া উপর্যুপরি তিন বৎসর পর্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে। এই তিন বৎসর পর্যন্ত হুযূর (দঃ) ওহীর জন্য ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। মানসিক ক্লেশের আতিশয্যে তিনি মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর হইতে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিতেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হযরত জিব্রাইল (আঃ) আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। অতএব, হুযুর (দঃ)-কেই যখন তিন বৎসর পর্যন্ত কষ্টে ফেলিয়া রাখা হয়, তখন আমরা কি ছাই ! আমাদিগকে তিন শত বৎসর পর্যন্তও নিরানন্দে ফেলিয়া রাখিলে তাহা অন্যায় হইবে না।

দেখুন, কোন সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আপন ছেলেকে কোন চাকুরীর ব্যাপারে তিন বৎসর পর্যন্ত আশাবাদী করিয়া রাখে, আর আমরা তিন দিনের মধ্যেই সেই চাকুরী লাভ করিতে চাই, তবে তাহা নিরেট বোকামি হইবে না কি ?

অতএব, যাহারা যিক্‌র আরম্ভ করার পরই নিরানন্দ ও সঙ্কোচভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাদের কমপক্ষে তিন বৎসর পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা উচিত। আরও বেশীদিন ছবর করাই ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকাল মানুষ ততদিনও ছবর করে না—যতদিন ওহী বন্ধ থাকার কারণে হুযূর (দঃ) কষ্টে অতিবাহিত করেন।

মোটকথা, প্রথমতঃ আনন্দ কাম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহব্বতের তাকিদ এই যে, আনন্দ তলব না করা উচিত। তৃতীয়তঃ, আনন্দ কাম্য হইলেও কমপক্ষে কিছুদিন পর্যন্ত বিস্বাদ সহ্য করা উচিত। চতুর্থতঃ, ইহাতে সওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া ইহাতে আত্মিক মঙ্গলও নিহিত আছে। কোন কোন দীক্ষা তালেবকে বাহ্যতঃ ব্যর্থ মনোরথ রাখার উপরই নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ, আপনি দেখিয়া থাকিবেন যে, অকাল প্রসবে কোন কোন মহিলাকে ডাক্তার সাত আট দিন পর্যন্ত অনাহারে রাখে। সে সময় মহিলাদের খুব ক্ষুধা লাগে এবং খাদ্যের জন্য জেদও করে, কিন্তু তখন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করাই খাঁটি প্রতিপালন। তখন তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া মহব্বত কি না, তাহা আপনি নিজেই বুঝিয়া লউন। খাদ্য না দেওয়াই মহব্বত এবং ইহাতেই মঙ্গল। আত্মিক ব্যাপারেও তদ্রূপ মনে করিয়া লউন যে, মাঝে মাঝে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়াই মহব্বত :

آن کس که توانگرت نمی گرداند + او مصلحت تو از تو بهتر داند

(আঁ কাস কেহ্ তাওয়াঙ্গারাত নামী গারদানাদ
উ মছলেহাতে তু আযতু বেহ্তর দানাদ)

"যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই, তিনি তোমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে তোমা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাত।" আফ্‌সোস ! আল্লাহ্ তা'আলা কি চিকিৎসকেরও সমকক্ষ নহেন ? চিকিৎসক অনাহারে রাখিয়া কষ্ট দিলে ইহাকে দয়ার্দ্রতা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে।

॥ আ'মলের প্রকারভেদ ॥

মোটকথা, اِصْبِرُوْا ও صَابِرُوْا নির্দেশদ্বয়ের সম্বন্ধ হইল ঐ সমস্ত আ'মলের সহিত, যেগুলির সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং رَابِطُوْا নির্দেশের সম্পর্ক হইল অনাগত আ'মলসমূহের সহিত। এখন জানা দরকার যে, আ'মল দুই প্রকার। (১) বাহ্যিক ও (২) আত্মিক। আমি পূর্বে যে সব আ'মল বর্ণনা করিয়াছি, সেগুলি বাহ্যিক আ'মলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার আমল ছিল এমন—যাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে

ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক প্রকার নিজের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকার অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর এক প্রকার আমল ছিল, যাহাদের সময় এখনও আসেই নাই। এই সবগুলি প্রকারের আহ্‌কাম اِصْبِرُوْا - وَصَابِرُوْا এবং وَرَابِطُوْا নির্দেশসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ণ শরীয়তের সহিত এইসব আহ্‌কামের সম্পর্ক। কেননা শরীয়তের কোন আমলই উপরোক্ত বিভাগের বহির্ভূত নহে। আরও জানা গিয়াছে যে, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও এইসব আহ্‌কামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেননা, দুনিয়ার কাজও দুই প্রকার। (১) যে কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে দৃঢ়তা ও স্থিরতার প্রয়োজন। (২) যে-কাজের সময় এখনও আসে নাই। ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

এখন এক প্রকার অর্থাৎ আত্মিক আমলের আলোচনা বাকী রহিল। এ সম্বন্ধে হক তা'আলা বলেন : وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'খোদাকে ভয় করিতে থাক।' ইহা হইতেছে সমস্ত আত্মিক আমলের মূল। ইহা খুব বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন, কিন্তু সময় মোটেই নাই। তাছাউফ তথা সূফীবাদের কিতাবাদিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। এক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হাছিল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, আপনি যদি স্বভাবগত ভাবে দুনিয়ার সাফল্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন, তবে ইহার উপায় এই যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করুন এবং আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশসমূহ যথাযথ পালন করুন। কেননা, হক তা'আলা এই সব নির্দেশ পালনের উপরই সাফল্যের বুনিয়াদ রাখিয়াছেন। আমার এই উদ্দেশ্যটি হাছিলের জন্য এতটুকু বক্তৃতাই যথেষ্ট। হাঁ, اِتَّقُوا اللّٰهَ নির্দেশটি সকলের পিছনে উল্লেখ করার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, বাহ্যিক আমল তখনই মকবূল হইবে এবং সাফল্য তখনই হাছিল হইবে যখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া (পরহেযগারী)-ও হয়।

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই বর্ণনা শুনিয়া আপনি হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সাফল্যের সন্ধানে মানুষ কেমন উল্টা পথে যাইতেছে। সাফল্য অর্জনের আসল উপায়টির প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। তাহাদের অবস্থা নিম্নোক্ত কবিতার হুবহু অনুরূপ :

ترسم نرسی بکعبه اے اعرابی
کیں ره که تو میروی به کفرستان ست

(তরসাম নারসী বকা'বা আয় এ'রাবী
কেঈ রাহ্‌ কেহ্‌ তু মীরভী বকুফ্‌রেস্তানাস্ত)

"হে গ্রাম্য ব্যক্তি, ভয় হয় যে, তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, যে পথে চলিতেছ, তাহা কুফরেস্তানের (কুফরের দেশের) দিকে গিয়াছে।'

কবিতার আসল শব্দ হইল ترکستان কিন্তু আমি তদস্থলে کفرستان এই জন্য বলিলাম যে, আজকাল মানুষ কাফেরদের উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়াই সাফল্য অর্জন করিতে চায়। ইহার পরিণামে সাফল্যের পরিবর্তে কুফরের নৈকট্য লাভ হইবে। সত্যিকার দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, দ্বীনদারীই সাফল্যের একমাত্র উপায়। যদি কাহারও মধ্যে দ্বীনদারীই না থাকে তবে খোদার কসম, সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব লাভ করিয়াও সে প্রকৃত সাফল্য অর্থাৎ, আরাম ও শান্তি অর্জন করিতে পারিবে না।

এখন দোআ করুন যেন হক তা'আলা আমাদিগকে আ'মলের তৌফীক দান করেন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

والحمد لله رب العالمين ٥

মুক্তির পথ

নাজাতের পন্থা সম্বন্ধে এই ওয়াযটি ১৩৩০ হিজরীর ২২ জমাদিউস্ সানী তারিখে জামে মসজিদে কেরানায় (জিঃ মুযাফ্ফর নগর) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় তিন হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিল। ওয়াযটি সোয়া তিন ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। মৌলবী সাঈদ আহ্মদ ছাহেব থানবী এই ওয়ায লিপিবদ্ধ করেন। হযরত মাওলানা (রঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ওয়ায করেন।

•

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানদের দুনিয়া দ্বীনের সহিত একসঙ্গে সংশোধিত হয়। অর্থাৎ, তাহাদের দ্বীনে উন্নতি হইলে দুনিয়াতেও উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনে ত্রুটি দেখা দিলে দুনিয়াও বিগ্ড়াইয়া যায়।

•

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

আয়াতের অর্থঃ কিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম, তবে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।

॥ কাহিনীর উদ্দেশ্য ॥

ইহা সূরায়ে মুল্‌কের একখানি আয়াত। ইহাতে হক তা'আলা কাফেরদের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহাদের একটি উক্তি যাহা তাহারা ক্বিয়ামতের দিন বলিবে। কিন্তু অতীত কিংবা ভবিষ্যতের যে কোন কাহিনীই বর্ণনা করা হউক না কেন, উহার উদ্দেশ্য কাহিনী নহে ; বরং কাহিনীর উদ্দেশ্য হইল উদাহরণের ভঙ্গিতে উপদেশ দান অথবা কোন বিষয়ে সতর্ক করা। এসম্পর্কে এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ❋

অর্থাৎ, 'আমি ক্বোরআন শরীফে যেসব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, উহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য "ইব্‌রত" (তুলনামূলক উপদেশ) নিহিত আছে। কাহিনী উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য যে তুলনামূলক উপদেশ দান, মোটামুটিভাবে এই আয়াতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইব্‌রতের সারমর্ম হইল তুলনা করা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় কাজ করার দরুন তাহাদের অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থা তুলনা করা এবং এইরূপ মনে করা যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় কাজকর্ম করিলে আমাদিগকেও তাহাদের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত আয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হক তা'আলা ইহা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—যাহাতে আমরা চিন্তা ও পরখ করিতে পারি যে, যে কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না ? আমাদের অবস্থা তাহাদের অনুরূপ কি না। আমাদের অবস্থাও তাহাদের ন্যায় হইলে উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি ? উপায় জানা হইলে আমরা উহাকে বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব। ইহাই হইল উদ্ধৃত আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। আয়াতের তরজমার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনি ইহা জানিতে পারিবেন এবং পরবর্তী বর্ণনার মাধ্যমে এসম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন।

আয়াতের তরজমা এইরূপ—ক্বিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না। ইহাতে বুঝা গেল যে, কাফেরেরা আপন দুরবস্থা দেখিয়া বলিবে, আমরা মারাত্মক ভুল করিয়াছি। দুনিয়াতে কাজের মত কাজ একটিও করি নাই। এই কাজের মত কাজকে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণিত কাহিনীতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। (১) শ্রবণ করা এবং (২) বুঝা। কারণ, দুই উপায়ে ন্যায়ের উপর আমল করা যায়। কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া এবং নিজে বুঝিয়া। কাফেরেরা ন্যায় ও সত্যের কথা দুনিয়াতে শুনে নাই এবং নিজেরা বুঝেও নাই। এই কারণে তাহারা

ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ ও আক্ষেপ করিবে। ইহাতে আপনারা আয়াতের সংক্ষিপ্তসার বুঝিতে পারিয়াছেন।

॥ কাফেরদের আক্ষেপ ॥

এই কাহিনী বর্ণনা করার পরে খোদা তা'আলা ইহাতে স্বীয় অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই এবং ইহাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেন নাই ; বরং পরবর্তী فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ 'অতএব, তাহারা আপন অপরাধ স্বীকার করিল' আয়াতে ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহাতে শ্রবণ না করা এবং হৃদয়ঙ্গম না করাকে তাহাদের অপরাধ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়টি সত্য। এই দুইটি বিষয়ের অভাবের কারণেই তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কাহিনীটি বর্ণনা করার পর যদি হক তা'আলা কোনকিছু না-ও বলিতেন, তবুও উহার সত্যতা আপনা-আপনি বুঝা যাইত। কেননা, ইহার স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে, কোন বিষয় বর্ণনা করার পর যদি বর্ণনাকারী সে সম্বন্ধে অসম্মতিসূচক মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকে, তবে উহাতে বর্ণনাকারীর স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ফেকাহ্ শাস্ত্রের নীতিবিশারদগণও ইহাকে একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নীতিটি বাদ দিয়াও কাফেরদের উপরোক্ত উক্তির সত্যতার আরও একটি দলীল আছে। তাহা এই যে, ইহা ক্বিয়ামত দিবসের উক্তি। ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত বিষয় আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই কারণে কেহ সেদিন মিথ্যা বলিবে না। তবে কোন কোন আয়াত যেমন—وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আল্লাহ্র কসম, হে প্রভু, আমরা দুনিয়াতে মুশ্‌রিক ছিলাম না।' দ্বারা সন্দেহ জাগিতে পারে যে, কাফেরেরা ক্বিয়ামতের দিনও মিথ্যা বলিবে। অপর একটি আয়াত দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া যায়। যেমন—اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ 'দেখ, তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা বলিয়াছে।' এই সন্দেহের উত্তর এই যে, কাফেরেরা অপর একটি কারণে এইরূপ মিথ্যা বলিবে। অর্থাৎ, উপকার লাভের আশায় মিথ্যা বলিবে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আয়াতের উক্তির ব্যাপারে কোনরূপ উপকারের আশা নাই; বরং এই উক্তি তাহাদের জন্য নিরেট ক্ষতিকর। কেননা, ইহাতে অপরাধের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

মোটকথা, ক্বিয়ামতে সবকিছুর স্বরূপ আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ার আসল তাকিদ অনুযায়ী সেখানে যাহাকিছু বলা হইবে, নির্ভুল বলা হইবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও কেহ কেহ উপকার লাভের আশায় ইহার বিপরীত করিবে। অতএব, যে স্থলে এই উপকারের কারণটি বিদ্যমান থাকিবে, সেখানেই মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকিবে এবং যেস্থলে এই কারণটি থাকিবে না, সেখানে আসল তাকিদ অনুযায়ী উক্তিকে

সত্যই মনে করা হইবে। অতএব, কাফেরদের উপরোক্ত উক্তি একেবারে নির্ভুল সত্য। এরপর খোদা তা'আলাও যখন ইহার সমর্থন করিয়াছেন, তখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই খোদা তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝

'কাফেরেরা আপন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অতএব, জাহান্নামীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত।' যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন আমি আসল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করিতেছি। খোদা চাহেন তো এই আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া দিব। কেননা, এই বিষয়টি এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। ইহার প্রয়োজন এত ব্যাপক যে, মুসলমানের পক্ষে সর্বক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ধরনের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করা খুবই জরুরী। ইহার প্রয়োজনের ন্যায় ইহার উপকারিতাও অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া এই বিষয়বস্তুটি খুবই সহজ। অতএব, এই তিনটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

॥ রোগ ও উহার চিকিৎসা ॥

রোগ যত কঠিন হয়, উহার চিকিৎসাও ততই কঠিন হইয়া থাকে। ইহাই বিবেক-সম্মত রীতি। দৃষ্টান্ততঃ কোন ব্যক্তি কিংবা কোন দল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে অথবা কোন শহরে মারাত্মক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িলে জ্ঞানিগণ তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অতএব, বুঝা গেল যে, ইহা, সর্ববাদিসম্মত রীতি এবং জ্ঞানিগণও এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করার শক্তি সামর্থ্য না থাকিলে চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হইতে হয়। সে মতে মাঝে মাঝে চিকিৎসকগণ রোগীকে বলিয়া থাকেন যে, তোমার রোগটি ধনীসুলভ। মনে করুন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি উন্মাদ হইয়া গেলে এবং চিকিৎসক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রোগমুক্ত করিতে না পারিলে চিকিৎসককে অতিষ্ঠ হইয়া এই কথা বলিতে হইবে যে, ভাই তোমার রোগটি ধনীসুলভ। অথচ তুমি দুই-চারি পয়সার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে চাও ইহা সম্ভবপর নহে। এই রোগের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। তোমার সেরূপ শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? কাজেই তুমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। অতএব, যুক্তিসঙ্গতরূপেই প্রত্যেক কঠিন রোগের চিকিৎসাও কঠিন হইয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে নিরাশও হইতে হয়। কিন্তু ঈমানী চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোন স্তর নাই, যেখানে পৌঁছিয়া রোগীকে চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়া নিরাশ করিয়া দেওয়া হয়; বরং এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রত্যেক রোগেরই অত্যন্ত সহজ

চিকিৎসা বিদ্যমান আছে। খোদা চাহেন তো আমি ইহা প্রমাণসহ বর্ণনা করিব। শরীয়ত কঠিন হইতে কঠিনতর রোগেও অত্যন্ত সহজ ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে খোদা তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহের নিদর্শন।

॥ ধর্ম সহজ ॥

ইহা দ্বারা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সঠিক অর্থও ফুটিয়া উঠিবে। يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে সহজ কাজ দিতে চান এবং কঠিন কাজ দিতে চান না।' এবং مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, 'খোদা তা'আলা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন জটিলতা চাপাইয়া দেন নাই।'

এখানে প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি আলোচনার অবতারণা করিতেছি। কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, ধর্মে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই; অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, অধিকাংশ দ্বীনদার ব্যক্তি শরীয়তের উপর আমল করার ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে যাহারা শরীয়তের গণ্ডী হইতে মুক্ত তাহারা যথেষ্ট সুবিধাদি ভোগ করে। তাহারা যাহা মনে চায়, তাহাই করিয়া ফেলে। কোন কার্যক্রমের বেলায় তাহারা জটিলতার সম্মুখীন হয় না। অতএব, বুঝা গেল যে, ধর্মের নির্দেশ পালন করিলেই অসুবিধা দেখা দেয় এবং স্বাধীন থাকিলে সুবিধা ভোগ করা যায়। কেননা, দ্বীনদারগণ পদে পদে হারামের চিন্তায় মশগুল থাকে এবং যখনই তাহাদিগকে কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারা উত্তরে শুধু হারামই বলে। ফলে তাহাদের পেরেশানী ও অসুবিধার অন্ত থাকে না।

উদাহরণস্বরূপ এখন আমের মওসুম আসিতেছে। যাহারা স্বাধীন তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইবে। মওসুমের শুরুতেই তাহারা আম গাছ বিক্রয় করিয়া দিবে—যদিও গাছে তখন কেবলমাত্র মুকুলই থাকে। তাহারা এই ধরণের গাছের দামও ভাল পাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা দ্বীনদার তাহাদের চিন্তা থাকিবে যে, মুকুল বিক্রয় করা হারাম। কাজেই ফল আসিলে এবং উহা বড় হইলেই বিক্রয় করা উচিত। ইহার ফলস্বরূপ আম গাছের দেখাশুনার জন্য কম পক্ষে ৫ পাঁচ টাকা মাসিক বেতনের চাকর রাখিতে হইবে। নতুবা নিজেই দেখাশুনা করিতে হইবে। এরপর তুফানে যে সকল আম পড়িয়া যাইবে তাহাতে মালিকেরই ক্ষতি হইবে এবং শেষ পর্যন্ত আমের দাম কম উঠিবে। এইভাবে অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রেও শরীয়তের উপর আমল করিলে কোন কোন ব্যবসা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে হারাম হইয়া

যায়। আবার কোন কোন লেনদেন সুদের কারণে হারাম হয়। মোটকথা, শরীয়তের উপর আমল করিলে সকল দিক দিয়াই অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কোনটিই যখন অসুবিধামুক্ত নহে, তখন স্বয়ং কোরআনের প্রতিই সন্দেহ জন্মে। نعوذ با لله من ذلك অর্থাৎ 'আল্লাহ্ আমাদিগকে এহেন ধারণা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।' অবশ্য কিছু সংখ্যক লোকের মনে এই সন্দেহ জাগিতে পারে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ইহার উত্তর দিয়াছি। এখনও ঐ একই উত্তর দিতে চাই। তবে বক্তব্য ভালরূপে ফুটাইয়া তোলার জন্য প্রথমে একটি উদাহরণ বর্ণনা করিতেছি।

মনে করুন, এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া ব্যবস্থাপত্রের জন্য জনৈক চিকিৎসকের নিকট গমন করিল। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে রোগী এমন স্থানে বসবাস করে যে, সেখানে কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। চিকিৎসক রোগীকে পথ্যও বলিয়া দিলেন, কিন্তু হায়, রোগীর গ্রামে শুধু নিষিদ্ধ জিনিসগুলিই পাওয়া যায়। রোগীকে যে সব জিনিস খাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—উহাদের একটিও সেখানে পাওয়া যায় না। অতএব, রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থা ও পথ্যতালিকা দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রই অসুবিধায় পূর্ণ। ইহাতে এমন এমন ঔষধ বলা হয়, যাহা পাওয়া যায় না এবং এমন এমন পথ্য দেওয়া হয়, যাহা সারা গ্রামে কখনও বিক্রয়ার্থে আসে না। খাওয়ার জিনিস যেমন বেগুন, আলু, মহিষের গোশ্‌ত ইত্যাদি সমস্তই এই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এতদ সঙ্গে রোগী মূর্খতাবশতঃ চিকিৎসককেও মন্দ বলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করি, এমতাবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই রোগীকে কি উত্তর দিবে? দোষারোপের উত্তরে তাহারা সকলে এই কথাই বলিবে যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা নাই। তবে এই ব্যক্তির গ্রামেই যত অসুবিধা রহিয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্র যদি মাত্র দুই-চারিটি জিনিসের অনুমতি দিয়া অবশিষ্ট সকল জিনিসই নিষিদ্ধ করিয়া দিত, তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া বুঝা যাইত। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশটি জিনিসের অনুমতি দেয় এবং মাত্র চারিটি জিনিস নিষিদ্ধ করে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটেই সঙ্কীর্ণতা নাই; বরং ঐ ব্যক্তির গ্রামেই সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে। কেননা, উহাতে বাছিয়া বাছিয়া কেবল ক্ষতিকর জিনিসই বিক্রয়ার্থে আমদানী হয়। এরূপাবস্থায় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বাজে বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল না করা রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে না; বরং এক্ষেত্রে চিকিৎসার খাতিরে গ্রামের অবস্থার সংশোধন করা, ব্যবসাক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করা এবং ব্যবসায়ীদিগকে উপাদেয় জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য করাই কর্তব্য।

এই উদাহরণটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন চিন্তা ও ইনছাফের দৃষ্টিতে দেখুন, অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা শরীয়তে রহিয়াছে, না আপনাদের কাজ-কারবারে?

শরীয়ত যদি মাত্র দুই-চারিটি ব্যবসা ও আদান-প্রদানকে জায়েয বলিয়া অবশিষ্ট সবগুলিকে হারাম বলিত, তবে শরীয়ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া দোষারোপ করা যাইত। অথচ শরীয়ত মাত্র দুই চারিটি ব্যবসা ও লেনদেনকে হারাম বলিয়া অবশিষ্ট সবগুলিকে জায়েয বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এমতাবস্থায় শরীয়তকে কিছুতেই সঙ্কীর্ণ বলা যায় না। কিন্তু আপনাদের কারবারী লোকগণ দুর্ভাগ্য বশতঃ শুধু হারাম ব্যবসাগুলিকেই অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে শরীয়তের দোষ কি? এই অবস্থার প্রতিকার এই যে, আপনারা সকলেই একমত হইয়া সংশোধনের পথে পা বাড়ান এবং শরীয়তের নির্দেশমত ব্যবসা শুদ্ধপথে পরিচালিত করুন। এক্ষেত্রে শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া উহার উপর আমল ত্যাগ করতঃ লাগামহীনরূপে স্বাধীন হইয়া যাওয়া কিছুতেই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না। অতএব বুঝা গেল যে, শরীয়তের বিরুদ্ধে আপনাদের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থার বিরুদ্ধেই আপত্তি। মাওলানা রূমী বলেন:

حمله بر خود می کنی اے ساده مرد + همچو آں شیرے که بر خود حمله کرد

(হাম্‌লা বর খোদ মীকুনী আয় সাদা মর্‌দ
হমচু আঁ শেরে কেহ্‌ বর খোদ হামলা কর্‌দ)

"অর্থাৎ, এক সিংহ নিজের উপরই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিল। হে সরল প্রাণ ব্যক্তি, তুমিও তাহার ন্যায় নিজের উপর হামলা করিতেছ।'

কথিত আছে, জনৈক নিগ্রো পথ চলার সময় পথিমধ্যে একটি আয়না পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা হাতে লইল। "পূর্বে কখনও সে আয়না দেখে নাই।" সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই আপন কুৎসিত ও কদাকার চেহারা উহাতে প্রতিফলিত হইতে দেখিল। কিন্তু সে আয়নার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, এমন কুৎসিত ছিলে বলিয়াই তো তোকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের অবস্থাও হুবহু এইরূপ। আমরা নিজ ত্রুটি শরীয়তের গায়ে লেপিয়া দেই।

বন্ধুগণ, কোন কারবারের দশটি উপায়ের মধ্য হইতে যদি নয়টিকে হারাম এবং মাত্র একটিকে হালাল বলা হইত, তবে নিঃসন্দেহে আপনারা শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ বলিতে পারিতেন। কিন্তু শরীয়ত এমন বলে না; বরং সে দশটির মধ্য হইতে আটটিকে হালাল এবং মাত্র দুইটিকে হারাম বলে। এমতাবস্থায় শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ কিরূপে বলা যায়? এক্ষেত্রে আমরাই অপরাধী। কেননা, আমরা হালাল উপায়গুলি ত্যাগ করিয়া কেবল দুইটি হারাম উপায়কেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। যদি আপনি শরীয়তের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত কাজকারবার করিতেন এবং এরপরও কোন জায়েয উপায় খুঁজিয়া না পাইতেন, তবে অবশ্যই শরীয়তকে দোষ দিতে পারিতেন। কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, আমরা আপন প্রবৃত্তি ও লালসার অধীন হইয়া কাজকারবার নির্ধারিত করি, এরপর এগুলিকে জায়েয বলার জন্য শরীয়তকে চাপ দেই। শরীয়ত

যেন আমাদের মুখাপেক্ষী ও চাকর আর কি। আমরা যাহাই করিব, সে উহাকে জায়েয করিয়া দিবে।

ইহা হুবহু এই গল্পের ন্যায় হইবে। কথিত আছে, জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাজে ও আবলতাবল কথা বলার অভ্যাস ছিল। সে অধিকাংশ সময় এমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলিত, যাহা শুনিয়া শ্রোতাগণ হাসি সংবরণ করিতে পারিত না। অবশেষে সে একজন কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাকে বলিল, আমি যখনই কোন কথা বলিব, তুমি শ্রোতাদের সম্মুখে উহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিবে। সেমতে একবার এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন একটি মজলিসে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আমি একবার শিকারে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি হরিণ দেখিয়া গুলী ছোড়ায় গুলীটি হরিণের ক্ষুর ভাঙ্গিয়া মস্তকভেদ করিয়া চলিয়া গেল।" কোথায় ক্ষুর আর কোথায় মস্তক? এই অসংলগ্ন উক্তি শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল। কিন্তু কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বলিয়া দিল, "হুযূর যথার্থই এরশাদ ফরমাইয়াছেন। আসলে হরিণটি তখন ক্ষুর দ্বারা মস্তক চুলকাইতেছিল।"

আমাদের প্রবৃত্তিপূজারী ও দুনিয়াপ্রেমিক ভাইগণও চান যে, তাহাদের মুখ হইতে যে কোন কথাই বাহির হউক না কেন, উক্ত কর্মচারীর ন্যায় শরীয়ত উহাকে জায়েযই করিয়া দেউক। শরীয়ত যেন আপনার বাঁদী। বন্ধুগণ, আপনারা স্বয়ং শরীয়তের দাস হইয়া যান। এরপর দেখুন, শরীয়তে কত সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। বর্তমানকালে দ্বীনদার লোকগণ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন, উহার বড় কারণ হইল বদদ্বীন লোকগণ। কেননা, দ্বীনদার ব্যক্তিদের অন্যের সহিতই কাজকারবার করিতে হয়। আর এই অন্য লোকগণ একেবারেই স্বাধীন। তাহারা আপন কাজ-কারবার বিগড়াইয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি পরহেযগারী অবলম্বন করিলে তাহাকে অবশ্যই অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু এই অসুবিধাটি অন্যান্যদের কাজ-কারবারের সঙ্কীর্ণতার কারণে দেখা দিবে। শরীয়তের সঙ্কীর্ণতার কারণে নহে।

॥ সংশোধনের উপায় ॥

অতএব, আপনারা দুই উপায়ে নিজ অবস্থার সংশোধনে যত্নবান হউন। প্রথমতঃ, পাক শরীয়তের প্রতি দোষারোপ ত্যাগ করুন। দ্বিতীয়তঃ, না-জায়েযকে জায়েয বলিয়া বা করিয়া দিবে—এরূপ অন্যায় আশা আলেমদের প্রতি পোষণ করা হইতে বিরত হউন। বন্ধুগণ, শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল কানুন বৈ কিছুই নহে। কাহারও খেয়ালখুশী মত কানুন কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। হাঁ, কানুন রচয়িতা স্বয়ং পরিবর্তন করিয়া দিলে তাহা ভিন্ন কথা। জনগণের মধ্য হইতে যদি কেহই কানুনের উপর আমল না করে, তাহাতেও কানুন পরিবর্তিত হইতে পারে না। খোদার

কানুনের বেলায় এই কথা আরও বেশী জোর দিয়া বলা যায়। কেননা, বান্দার আনুগত্যের উপর খোদার শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে।

কেহ বলিতে পারে যে, ওহী নাযিল হওয়ার সময়ই আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যতম কানুন নির্ধারিত করিলেই হইত। কেননা শরীয়তে সকল যমানার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহার উত্তর এই যে, কানুন রচনা করার সময় জনগণের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—ব্যক্তিগত উপকারের প্রতি খেয়াল রাখা যায় না।

উদাহরণতঃ সরকারের কানূন এই যে, কেহ লাইসেন্স ব্যতীত গুলি অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া কোন বোকা ব্যক্তি বলিতে লাগিল, সরকারের আইন বড় সঙ্কীর্ণ। আমার ইচ্ছা হয় অবাধে গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় করিব। কিন্তু কানুন লাইসেন্সের শর্ত আরোপ করে। এই বোকা ব্যক্তির উত্তরে জ্ঞানিগণ ইহাই বলিবেন যে, জনগণের ব্যাপক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী আইন রচিত হয়—ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন ব্যক্তিকে বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দিলে জননিরাপত্তা ব্যাহত হইবে, যাহার মনে যাহা চাহিবে, তাহাই করিবে এবং রোজই দেশে বিপুল পরিমাণে খুন খারাবী হইবে। অতএব, জননিরাপত্তার খাতিরে ব্যাপক অনুমতির ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সমীচীন, যদিও ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তবে যদি কাহারও চালচলন সন্তোষজনক হয় অপব্যবহারে আশঙ্কা না থাকে এবং সে লাইসেন্সও লইয়া লয়, তবে তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হইবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, জনগণের ব্যাপক মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কানুন নির্ধারিত করা হয়।

এখন শরীয়তের বিরুদ্ধে যাহারা আপত্তি উত্থাপন করে, তাহারা চিন্তা করিয়া দেখুক, শরীয়তের কোন কানূনে জনগণের ব্যাপক মঙ্গল পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না। হাঁ, যে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ দেখিলে জনগণের স্বার্থ ব্যাহত হয়, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি দেখিয়াই তাহারা শরীয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার প্রয়াস পায়। দৃষ্টান্ততঃ আমের মওসুম আগত প্রায় দেখিয়া এখন বাগানের মালিকদের মনে ইসলামের প্রতি কু-ধারণা জন্মিয়াছে। তাহারা ভাবে যে, শরীয়ত যথেষ্ট সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছে। এই কু-ধারণার কারণ এই যে, শরীয়তের কানূন পালন করিলে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা অনেকাংশে হ্রাস পায়। অথচ শরীয়ত জনগণের ব্যাপক মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কানুন রচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে জনগণের মঙ্গল এই যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব নাই তাহা বিক্রয় করিলে ভবিষ্যতে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গাছে ফল না

আসিলে তাহার টাকা অনর্থক নষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে গাছে ফল আসার পর বিক্রয় করিলে সাধারণ লোক এই ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিয়া যায়—যদিও এক পক্ষ ফলের মূল্য সামান্য কম পায়।

এরপর সর্বনাশের কথা এই যে, সঙ্কীর্ণতার ধারণা করিয়া কেহ কেহ এই আইনকে শরীয়তের আইন বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, এগুলি মৌলবীদের মনগড়া মাসআলা। অথচ ইহা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছুই নহে। জ্ঞানের স্বল্পতা ও মূর্খতার প্রতুলতাই এইরূপ অপবাদের কারণ। যে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর হাদীস কিংবা হাদীসের অনুবাদ পাঠ করিয়াছে, সে জানে যে, এগুলি হুযূর (দঃ)-এরই বর্ণিত আহ্কাম। কিছু সংখ্যক লোক এগুলি শরীয়তের আইন বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলে যে, আমরা দুনিয়াদার লোক। শরীয়তের নির্দেশ পালন করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আমি তাহাদিগকে বলিতেছি যে, খোদা তা'আলার নির্দেশ যদি পালন করিতে না পার, তবে খোদার দেওয়া রিযিকও পরিত্যাগ কর। শরীয়ত পালন করিবে শুধু মৌলবীরা অথচ খোদার দেওয়া রিযিক তোমরাও পানাহার করিবে—এ কেমন কথা?

মোটকথা, শরীয়তের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করার কারণ এই যে, মানুষ আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ করিয়া যখন উহাকে পরিত্যক্ত দেখিতে পায়, তখনই শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ মনে করিয়া বসে। অথচ শরীয়ত অথবা অন্য যে কোন কানূন কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং করিতে পারে না। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে এক সূতায় গ্রথিত করা সম্ভবপর নহে; বরং প্রত্যেক কানূন জনগণের ব্যাপক স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকে। এদিক দিয়া খোদার ফযলে শরীয়তের কানূন জনগণের ব্যাপক স্বার্থের বিরোধী নহে।

উদাহরণতঃ এই আমের ব্যাপারেই আপনি বলেন যে, ফল আসার পূর্বেই গাছ বিক্রয়ের অনুমতি না দেওয়া স্বার্থের পরিপন্থী। কেননা, প্রায়ই ঝড়-তুফানের কারণে সমস্ত মুকুল কিংবা ছোট ছোট আম্র ঝরিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে মালিকের ক্ষতি হয়। জিজ্ঞাসা করি, এই ক্ষতিটি ব্যাপক, না ব্যক্তিবিশেষের? সকলেই জানে যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। কেননা, কোন স্থানের লোকসংখ্যা দশ হাজার হইলে তাহাদের মধ্যে বড় জোর এক শতজন বাগানের মালিক হইবে। অবশিষ্ট নয় হাজার নয় শত জনের আমের বাগান থাকিবে না। সুতরাং এই আইন রচনা করিয়া শরীয়ত একশত জনের বিশেষ স্বার্থের মোকাবিলায় নয় হাজার নয়শত জনের স্বার্থকে অধিকার দিয়াছে এবং উহা সংরক্ষণের দায়িত্ব লইয়াছে। কেননা, অস্তিত্বহীন আম বিক্রয়ের ফলে এই ওবশিষ্ট লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

কেহ বলিতে পারে যে, সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও এই অবশিষ্ট লোকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরূরী ছিল না। কেননা, তাহারা স্বেচ্ছায় ফলহীন গাছ ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা স্বয়ং ক্ষতি স্বীকার করে। এমতাবস্থায় তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কথা ঐ ব্যক্তিই বলিতে পারে—আপন পেট ও লালসার জাহান্নাম ভর্তি করাই যাহার একমাত্র কাম্য এবং দুনিয়ার কাহারও প্রতি যাহার বিন্দুমাত্রও মহব্বত নাই।

মনে করুন, কোন অবুঝ শিশুকে আগুনে পড়িতে দেখিয়া তাহার পিতা দৌড়িয়া আসিল এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পিতার এই কাজ দেখিয়া অপর একজন বলিতে লাগিল, আপনি অনর্থক কষ্ট করিয়াছেন। এভাবে দৌড়িয়া আসার কি প্রয়োজন ছিল? সে স্বেচ্ছায় আগুনে পড়িতে ছিল। সুতরাং বাধা দিতে গেলেন কেন? জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানিগণ এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ফতোয়া দিবেন? তাহাকে চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় বলিবেন না কি? রাসূলে খোদা (দঃ) ও খোদা তা'আ'লা পিতা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী দয়ালু। আমরা ক্ষতি স্বীকার করি—তাঁহারা ইহা কিরূপে সহ্য করিতে পারেন?

মোটকথা, ধর্মে সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া যে ধারণা ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইয়া গেল। উপরোক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হইল যে, ধর্মের কাজ যারপরনাই সহজ ও সরল। তবে মানব-বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ মাঝে মাঝে কঠিন হইয়া থাকে। যেমন, পূর্ববর্ণিত বিষয়টিই ধরুন। রোগ যতই কঠিন হয়, মানব-বুদ্ধি উহার জন্য ততই কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলে। কিন্তু শরীয়ত কঠিন রোগের বেলায় সহজ চিকিৎসা প্রদান করে। অতএব, ইসলামের শিক্ষা ও বিবেকের অভিমতের মধ্যে কত তফাৎ।

॥ মুসলমানদের রোগ ॥

এখন দেখা দরকার যে, মুসলমানদের মধ্যে কি রোগ রহিয়াছে—যাহার চিকিৎসা উপরোক্ত আয়াতে বাতলানো হইয়াছে। এপ্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মুসলমানদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কারণ এই নয় যে, অন্যান্য জাতির মধ্যে রোগ নাই। আসলে অন্যান্য জাতির মধ্যে এমন এমন রোগ রহিয়াছে, যাহা খোদার ফযলে মুসলমানদের মধ্যে নাই। তবে এক্ষেত্রে শুধু মুসলমানদের কথা বলার কারণ এই যে, আমরা অন্যান্য জাতির অবস্থাদি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যাক, রোগ আবিষ্কার করার পর উহার কারণও আবিষ্কার করা দরকার। রোগ সম্বন্ধে বলা হয় যে:

تن همه داغ داغ شد پنبه كجا كجا نهم

(তন্ হামা দাগ দাগ শোদ পোম্বা কুজা কুজা নেহাম)

'সমস্ত দেহই ক্ষতবিক্ষত ; তুলা কোথায় কোথায় রাখিব ?' আমাদের জাতির কোন অঙ্গই অক্ষত নহে। কেননা, আমাদিগকে দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। একটি দুনিয়া ও অপরটি দ্বীন। ইহাদের প্রত্যেকটির বিভিন্ন অঙ্গ আছে। সে মতে দ্বীনের সাথে সাথে দুনিয়ার ক্ষতসমূহেরও একটি দীর্ঘ তালিকা বর্ণনা করা উচিত ছিল। বিশেষ করিয়া এই যুগে ইহার প্রয়োজন ছিল। কেননা. আজকালকার তথাকথিত রিফর্মার বা সংস্কারকদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, দুনিয়ার সংশোধন (অর্থাৎ, আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ) না হইলে দ্বীনের সংশোধন হইতে পারে না। আফসোস, এই সংস্কারগণ রোগ নিরাময়ের যতই চেষ্টা করিয়াছেন, উহা ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, :

هرچه کردند از علاج واز دوا + رنج افزون گشت وحاجت ناروا

(হরচেহ্ করদান্দ আয এলাজ ও আয দাওয়া
রঞ্জ আফযূঁ গাশ্‌ত ও হাজত না রাওয়া)

অর্থাৎ, "তাহারা যতই চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে, পীড়া ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রয়োজন অসঙ্গত হইয়াছে।"

জনৈকা বাঁদীর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী মসনভী শরীফে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাহ্যদর্শী চিকিৎসকগণ যতই চিকিৎসা করিল, রোগ কেবল বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে আত্মিক রোগের চিকিৎসক আগমন করিল এবং অবস্থা দেখিয়া বলিল :

گفت هر داروکه ایشاں کرده اند + آں عمارت نیست ویراں کرده اند
بے خبر بودن از حالت دروں + استعیذ الله مما یفترون

(গোফ্‌ত হর দারু কেহ্ ইশাঁ করদাআন্দ + আঁ এমারত নীস্ত ভিরাঁ করদাআন্দ
বে খবর বুদান আয হালত দরূঁ + আস্তায়ীযুল্লাহা মিম্মা ইয়াফ্‌তুরূন)

অর্থাৎ, 'তাহারা যত ঔষধই প্রয়োগ করিয়াছে তাহাতে উপকারের পরিবর্তে কেবল অপকারই হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আসল অবস্থা এইরূপ :

دید از زاریش کو زار دلست + تن خوش است اما گرفتار دلست
عاشقی پیداست از زاری دل + نیست بیماری چو بیماری دل

(দীদ আয যারীয়াশ কো যারে দিলাস্ত + তন খুশ আস্ত আম্মা গেরেফতারে দিলাস্ত
আশেকী পয়দাস্ত আয যারীয়ে দিল + নীস্ত বিমারী চুঁ বিমারীয়ে দিল)

অর্থাৎ, 'সে অন্তরের বিনয় দ্বারা দেখিল যে, দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু অন্তর রোগাক্রান্ত। অন্তরের বিনয় হইতে আশেকী সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের রোগের ন্যায় কঠিন কোন রোগ নাই।'

অর্থাৎ 'রোগ ছিল অন্তরে আর চিকিৎসা হইতেছিল শরীরের। এমতাবস্থায় রোগ বৃদ্ধি পাওয়াই অনিবার্য ছিল। আজকালকার নেতাদের অবস্থাও তথৈবচ। তাহারা টাকা-পয়সার অভাবকেই বড় রোগ মনে করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মতে প্রচুর টাকা-পয়সা থাকিলে এটাও হইত ওটাও হইত, দ্বীনেরও যথেষ্ট উন্নতি হইত। বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করি, যেখানে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা আছে, সেখানে দ্বীনের নুর বর্ষিত হইতেছে কি? টাকা-পয়সার অভাবই যদি ধর্মীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইত, তবে বিত্তশালী লোকদের মধ্যে দ্বীনদারী বেশী থাকা উচিত ছিল; কেননা, তাহাদের কাছে টাকা-পয়সার কোন অভাব নাই। আজকাল চাক্ষুষ দেখারই পূজা করা হয়। সেমতে আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন, দ্বীনদারী ধনীদের মধ্যে বেশী আছে, না গরীবদের মধ্যে? আর ইহার উপায় এই যে, কোনরূপ বাছাই না করিয়া কয়েকজন গরীব ব্যক্তি ও কয়েকজন ধনী ব্যক্তিকে লইয়া তাহাদের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখুন, কে বেশী দ্বীনদার? এ সম্বন্ধে স্বয়ং খোদা তা'আলা বলেন :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۙ أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

"নিশ্চয়ই মানুষ (সীমা) অতিক্রম করে। কারণ, সে নিজেকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ধনাঢ্য দেখিতে পায়।"

অতএব, আমাদের একথা বলার অধিকার আছে যে, জাগতিক উন্নতি ধর্মের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও আয়াতের বিষয়বস্তু ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাসত্ত্বেও আমরা আপন ভাইদের খাতিরে বলিতেছি যে, টাকা-পয়সা স্বয়ং ক্ষতিকরও নহে এবং উপকারীও নহে। যদি আমাদের ভাইদের কাছে এই প্রকার কোন প্রমাণ থাকিত তাহারা কিছুতেই আমাদের খাতিরে উহা স্বীকার করিত না; কিন্তু আমরা করিতেছি এবং টাকা-পয়সা ধর্মের পথে প্রতিবন্ধক—এই দাবীটি প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি। কিন্তু টাকা-পয়সা ধর্মীয় উন্নতির পথে সহায়ক বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। অতএব, বুঝা গেল যে, ধর্মীয় উন্নতির পথে যে জিনিসটি সহায়ক তাহা প্রকৃত পক্ষে অন্যকিছু।

॥ সুস্থ অন্তরের বৈশিষ্ট্য ॥

উহা হইল সুস্থ অন্তর। অর্থাৎ, অন্তর সুস্থ হইলে টাকা-পয়সা থাকা না থাকা কোনটিই ক্ষতিকর নহে। পক্ষান্তরে অন্তর সুস্থ না হইলে টাকা-পয়সা না থাকা কম ক্ষতিকর এবং থাকা বেশী ক্ষতিকর হইয়া যায়।

টাকা-পয়সা এবং সুস্থ অন্তরকে তলোয়ার ও হাতের সহিত তুলনা করা যায়। তলোয়ার কাটে; কিন্তু যখন শক্তিশালী হাতে থাকে, তখনই কাটিতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি হাত না থাকে কিংবা হাত থাকিলেও হাতে শক্তি না থাকে, তবে একা তলোয়ার কোন কাজে আসে না। এমতাবস্থায় মাঝে মাঝে নিজের শরীরেই আঘাত লাগিয়া যায়। তেমনি সুস্থ অন্তর না থাকিলে শুধু টাকা-পয়সা কোন উপকার করিতে পারে না। সুস্থ অন্তরই হইল আসল বস্তু। সুস্থ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে সে নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র। এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধেই হাদীসে বলা হইয়াছে : نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ 'নেক ব্যক্তির হাতে হালাল মাল থাকা যারপরনাই শোভনীয় ব্যাপার।' মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন :

مال اگر بہر دیں باشی حمول + نعم مال صالح گفت آں رسول

(মাল আগর বহ্‌রে দীঁ বাশী হুমুল + নে'মা মালেছালেহ্ গোফ্‌ত আঁ রাসূল)

অর্থাৎ, 'তুমি যদি ধর্মের খাতিরে মালের অধিকারী হও, তবে রাসূল (দঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী তাহা উৎকৃষ্টতর মাল বটে।' তিনি আরও বলেন ঃ

آب در کشتی ہلاک کشتی است + آب اندر زیر کشتی پشتی است

(আব দর কাশ্‌তী হালাকে কাশ্‌তী আস্ত+আবে আন্দর যেরে কাশ্‌তী পস্‌তী আস্ত)

অর্থাৎ, 'নৌকার ভিতরে পানি ঢুকিয়া গেলে তাহাতে নৌকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু নৌকার নীচে পানি থাকা নৌকার সহায়ক। তেমনি ধন-দৌলত অন্তরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে অন্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর অন্তরের বাহিরে থাকিলে তদ্দ্বারা অন্তর উপকৃত হয়। সুস্থ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে ইহা হইতে পারে। মোটকথা, টাকা-পয়সা থাকা না থাকা উভয়টিই সমান। সুতরাং ধর্মীয় উন্নতি দুনিয়ার উন্নতির উপর নির্ভরশীল—এই দাবীটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

মাওলানা (রঃ) বলেন :

زر و نقرہ چیست تا مفتوں شوی + چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

(যর ও নোক্‌রা চীস্ত তা মফতূঁ শভী + চীস্ত ছূরত তা চুনীঁ মজনূঁ শভী)

অর্থাৎ, 'স্বর্ণ-রৌপ্য কি বস্তু যে, তুমি উহার জন্য উতালা হইবে। মুখাকৃতিই কি জিনিস যে, তুমি তজ্জন্য এত উন্মাদ হইয়া পড়িবে?'

বন্ধুগণ, আমাদের বুযুর্গদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। তাঁহাদের কাছে কোথায় এত বেশী টাকা-পয়সা ছিল? কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহারা কত দ্বীনদার ছিলেন। মোটকথা, দরকারী জিনিসের মধ্যে একটি ছিল দুনিয়া। অনেকেই এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু বলার অর্থ হইল মানুষের কল্পিত কু-সংস্কারে সাহায্য করা। তৃতীয়তঃ, আমরা তালেবে এলম বৈ কিছুই নহি। ইহা আমাদের কাজও নহে। ইহা আপনি নিজেই করুন। তবে মৌলবী ছাহেবদের কাছে হালাল হারাম জিজ্ঞাসা করিয়া করুন। আজকাল আপনারা এমন

বহু পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ নাজায়েয। উদাহরণতঃ বিবাহ ফণ্ড, মৃত্যু ফণ্ড ইত্যাদি। এগুলি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

॥ শরীয়তের আহ্‌কাম জিজ্ঞাসা করা ॥

আফসোস, মানুষ উন্নতির উপায় চিন্তা করিয়া নিজে নিজেই উহার উপর আমল করিতে থাকে। উহা যে শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয হইতে পারে—এরূপ কল্পনাও তাহাদের মনে জাগে না। বন্ধুগণ, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন; কিন্তু খোদাকে ভয় করিয়া হালাল-হারাম মৌলবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। ইহা মোটেই লজ্জার বিষয় নহে। আপনারা অনেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। উদাহরণতঃ ব্যবসা করিতে চাহিলে আইনজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উহার অনুমতি লাভের পথ জানিয়া লন। জিজ্ঞাসা করি, শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা ঝামেলা ও মাথা ব্যথার কারণ হইলে সরকারী আইন জিজ্ঞাসা করা মাথা ব্যথার কারণ হয় না কেন? শরীয়তের আইন মান্য করিলে যে স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, তাহা সরকারী আইন মান্য করিলেও বিনষ্ট হয়। স্বাধীনতা লক্ষ্য হইলে কোন আইনই মান্য না করা এবং দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করার মধ্যেই বড় স্বাধীনতা নিহিত আছে। কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে স্বাধীনতা বলিবে কি? মনে করুন কতিপয় বোকা একত্রিত হইয়া দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিল। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল যে, ইহা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। জিজ্ঞাসা করি, এই আইনটি তাহাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া ইহা মান্য করা তাহাদের জন্য জরুরী হইবে না কি? নিশ্চয়ই হইবে। ইহাতে বুঝা গেল যে, গভর্ণমেন্টের দেশে বাস করিতে হইলে তাহার আইন মান্য করাও নেহায়েৎ জরুরী। এই নীতি অনুযায়ী খোদার আদেশ পালন না করিলে খোদার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য কোন রাজত্ব খোঁজ করিয়া লও। আর যদি খোদার রাজত্বেই থাকিতে চাও, তবে সরকারের আইন মান্য করা এবং খোদার আইন মান্য না করা আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মোটকথা, দুনিয়ার কাজ-কর্ম আপনারাই করুন, কিন্তু আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। আলেমরা দুনিয়ার কাজে আপনাদের সাহায্য করিবে এবং কলা-কৌশল বলিয়া দিবে—তাহাদের প্রতি এরূপ আশা পোষণ করিবেন না। ইহা আলেমদের কাজ নহে—আপনাদের কাজ। আলেমদের প্রতি এরূপ আশা রাখা জুতা সেলাইয়ের কাজে হাকীম আবদুল মজীদের নিকট মুচির সাহায্য চাওয়ার ন্যায় হইবে।

উদাহরণতঃ জনৈক যক্ষ্মা রোগী হাকীম আবদুল মজীদের নিকট গমন করিল। হাকীম সাহেব ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলে সে উহা লইয়া দাওয়াখানা হইতে বাহির

হইলে জনৈক মুচির সহিত দেখা হইল। মুচি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? রোগী বলিল, হাকীম সাহেবের নিকট গিয়াছিলাম। ইহাতে মুচি বলিতে লাগিল, হাকীম আবদুল মজীদও বেশ অভিজ্ঞ লোক। সে এই ব্যবস্থাপত্রে জুতা সেলাই করার কথাটিও লিখিয়া দিতে পারিল না। মনে হয়, সে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় এই মুচিকে সকলেই বোকা ঠাওরাইবে এবং বলিবে যে, জুতা সেলাই করার কৌশল বর্ণনা করা অথবা ইহা চালু করার কাজে সাহায্য করা হাকীম আবদুল মজিদের কাজ নহে। হাকীম আবদুল মজীদের কাজ হইল রোগের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করা।

আলেমদিগকেও হাকীম আবদুল মজীদ মনে করা উচিত। তাহাদের কাজ হইল আত্মার রোগসমূহের জন্য ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা—দুনিয়ার কাজে প্রস্তাব পেশ করা নহে। জুতা সেলাই করাইতে না বলার অপরাধ হাকীম সাহেবের বিরুদ্ধে শুদ্ধ হইলে আলেমদের বিরুদ্ধেও শুদ্ধ হইবে। তবে জুতা সেলাই করায় পরিধানকারীর পায়ে যদি যখম না হয় এবং পা পচিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়, তবে জুতা সেলাই করিতে নিষেধ না করা হাকীম সাহেবের কর্তব্য। অন্যথায় জুতা সেলাই করিতে অবশ্যই নিষেধ করিতে হইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পরিহিত অবস্থায়ই জুতা সেলাই করাইল। ফলে মুচির সুই তাহার পায়ের চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইল। এমতাবস্থায় হাকীম সাহেব জানিতে পারিলে তাঁহাকে অবশ্যই নিষেধ করিতে হইবে। তদ্রূপ দুনিয়ার যেসব কাজে মানুষের অন্তরে কু-ধর্মের ক্ষত দেখা না দেয়, তাহা করিতে নিষেধ না করা এবং অন্তরে ক্ষত দেখা দিলে তাহা হইতে মানুষকে বিরত রাখা আলেমদের অবশ্য কর্তব্য। যখমের ভয়ে হাকীম সাহেব যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন উহাকে দয়া মনে করা হইলে অন্তরের ক্ষতের ভয়ে আলেমগণ কর্তৃক দুনিয়ার কাজ হইতে বিরত রাখাও দয়া বলিয়া গণ্য হইবে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ পার্থক্য প্রমাণ করিতে চাহিলে আমি তাহাকে দশ বৎসর সময় দিতে রাযী আছি।

সারকথা এই যে, জুতা সেলাই করার কৌশল বর্ণনা করা অথবা এই কাজে সাহায্য করা যখন হাকীম সাহেবের জন্য জরূরী নহে, তখন আত্মিক রোগের চিকিৎসক আলেমদেরও এ সম্পর্কে এইরূপ বলার পূর্ণ অধিকার আছে যে :

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئیم
چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گوئیم

(না শবাম না শব পরস্তাম কেহ হাদীসে খাব গোইয়ীম
চু গোলামে আফ্‌তা বাম হামা যে আফ্‌তাব গোইয়ীম

অর্থাৎ, 'রাত্রিও নহি এবং রাত্রি-পূজারীও নহি যে, স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিব। আমি সূর্যের গোলাম, কাজেই সূর্যের আলোতে দেখিয়া সবকিছু বলিব।'

দুনিয়া স্বপ্নের ন্যায়। যাহারা রাত্রি পূজারী, তাহারাই এ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবে। আমরা ধর্মীয় সূর্যের গোলামী করি। আমাদের কাছে ঐ সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করুন। আমরা এছাড়া অন্যকিছু বর্ণনা করিব না এবং অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিব যে :

ما هرچه خوانده ایم فراموش کرده ایم
الا حدیث یار که تکرار می کنیم

(মা হরচেহ্ খান্দায়ীম ফরামূশ করদায়েম + ইল্লা হাদীছে ইয়ারকেহ্ তকরার মীকুনীম)

অর্থাৎ, 'আমরা যাহাকিছু পড়িয়াছিলাম, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। তবে প্রেমাস্পদের কথা বারবার আবৃত্তি করার কারণে ভুলি নাই।'

হাঁ, আলেমগণ যদি নিষেধ না করেন, তবে উহা তাহাদের অনুগ্রহ হইবে। আপনাদের সন্দেহ ও আপত্তির জওয়াব প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইল। এখন আমি এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আলেমগণ দুনিয়াও শিক্ষা দেন।

॥ দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক ॥

ইহার কারণ এই যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— মুসলমানদের দুনিয়া দ্বীনের সহিত এক সঙ্গে সংশোধিত হয়। অর্থাৎ, তাহাদের দ্বীনে উন্নতি হইলে দুনিয়াতেও উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনে ত্রুটি দেখা দিলে দুনিয়াও বিগ্‌ড়াইয়া যায়। আমরা যখন দ্বীন শিখাইতে যাইয়া লেন-দেন, সামাজিকতা, চরিত্র ইত্যাদি সংশোধিত করি, তখন যেন আমরা দুনিয়ার উন্নতির উপায়ও বলিয়া দেই। হাঁ, আমাদের বর্ণিত উপায় ও অন্যান্যদের বর্ণিত উপায়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তাহা এই যে, অন্যান্যদের বর্ণিত উপায়ের মধ্যে পেরেশানী ও হতবুদ্ধিতা বেশী থাকে। উহাদের অবস্থা এই যে, چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد 'মৃত্যুর সময়ও পেরেশানীতে জড়িত এবং জীবন ধারণের সময়ও হতবুদ্ধিতায় সমাবৃত থাকে।'

খোদার কসম, কিছু সংখ্যক লোককে বাহ্যতঃ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা খুবই সুখে-স্বাচ্ছন্দে আছে, কিন্তু তাহাদের ভিতরের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে জানা যাইবে যে, তাহারাই সবচাইতে বেশী অসুখী। সকল প্রকার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার লক্ষ্য তাহারাই।

এ প্রসঙ্গে একটি রসাত্মক গল্প মনে পড়িল। আমার উস্তাদ (রঃ) বলিতেন, জনৈক ব্যক্তি খাজা খিযিরের সাক্ষাৎ লাভের দোআ করায় এক দিন খাজা খিযিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি বলিল, হুযূর আমার জন্য দোআ করুন, যেন আমি বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারি এবং আমার যেন কোনরূপ চিন্তা না থাকে। খাজা খিযির বলিলেন, তুমি দুনিয়াদারী তথা বিপুল ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত

হইতে পারিবে না। কিন্তু লোকটি তবুও পীড়াপীড়ি করিল। তিনি বলিলেন, তবে তুমি এমন কোন লোক তালাশ কর, যে তোমার মতে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং পরম সুখী। আমি দোআ করিব—যাতে তুমিও তাহার ন্যায় হইয়া যাও। খাজা খিযির এজন্য লোকটিকে তিন দিনের সময় দিলেন। সে ঐ প্রকার লোক খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু হায়, যাহাকেই দেখিল, সেই কোন না কোন পেরেশানীতে জড়িত আছে। অনেক খোঁজাখুজির পর জনৈক জওহারীর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল জওহারী অনেক চাকর-নওকরের মালিক ছিল। তাহার সন্তান-সন্ততিও ছিল। বাহ্যতঃ তাহাকে নিশ্চিন্ত ও পরম সুখী মনে হইত। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার ন্যায় হওয়ার জন্যই দোআ করাইব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এই চিন্তাও ঢুকিল যে, কে জানে, জওহারীও আসলে কোন বিপদে পতিত আছে কি না। এরূপ হইলে দোআ করাইয়া আমিও বিপদে জড়াইয়া পড়িব। কাজেই আগে ভিতরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়াই সমীচীন। এইরূপ ভাবিয়া সে জওহারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং আপন সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইল।

জওহারী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, খোদার কসম, তুমি কখনও আমার ন্যায় হওয়ার জন্য দোআ করাইও না। আমি একটি বিপদে জড়িত আছি—খোদা না করুন, তুমিও উহাতে জড়িত হইয়া পড়। ঘটনা এই যে, একবার আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থা হইয়া পড়ে; তাহার অবস্থা একেবারে মরনোম্মুখ হইয়া পড়িল। তাহাকে মরিতে দেখিয়া আমি কান্না রোধ করিতে পারিলাম না। তখন স্ত্রী বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি মারা গেলে তুমি অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া লইবে। আমি বলিলাম, না, আমি আর কখনও বিবাহ করিব না। সে বলিল, সকলেই এরূপ বলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই এই ওয়াদা রক্ষা করে না। আমি স্ত্রীর ভালবাসার হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত ছিলাম এবং তাহার মরনোম্মুখ অবস্থা দেখিয়া অন্তর খুবই দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল। এই কারণে স্ত্রীকে বিশ্বাস করাইবার জন্য ক্ষুর লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার লিঙ্গ কাটিয়া ফেলিলাম। অতঃপর তাহাকে বলিলাম, এখন তো তুই নিশ্চিন্ত হইয়াছিস্। ঘটনাক্রমে ইহার পর স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া গেল। তখন আমি একেবারে বেকার হইয়া পড়িয়াছি। ফলে সে আমার চাকরদের সহিত ভাব করিয়া লইল। এক্ষণে তুমি যেসব ছেলেপেলে দেখিতেছ তাহারা সকলেই আমার চাকরদের কৃপায়। আমি স্বচক্ষে এই কু-কর্ম দেখিয়াও দুর্ণামের ভয়ে কিছু বলিতে পারি না। তাই তুমি আমার ন্যায় হওয়ার দোআ কখনও করাইও না।

অবশেষে ঐ ব্যক্তির বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দুনিয়াতে কেহই সুখে-শান্তিতে নাই। তৃতীয় দিন হযরত খিযিরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, বল তোমার কি মত? সে বলিল, হুযুর দোআ করুন, যেন খোদা তা'আলা আমাকে আপন মহব্বত

ও পূর্ণ দ্বীনদারী দান করেন। হযরত খিযির সেইরূপ দোআ করিলে লোকটি কামেল দ্বীনদার হইয়া গেল।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াদারদের মধ্যে কেহই সুখে-শান্তিতে নাই। ভিতরের অবস্থা প্রত্যেকেরই পেরেশানীতে পূর্ণ। কেননা, দুনিয়ার অবস্থা হইল এইরূপ لَا يَنْتَهِى أَرَبٌ إِلَّا إِلَى أَرَبٍ অর্থাৎ, 'এক আশা পূরণ না হইতেই অন্য আশা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।' খোদার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মনোবৃত্তি কাহারও নাই। প্রত্যেক কাজের বেলায়ই আশা করা হয় যে, ইহাও সম্পন্ন হউক এবং উহাও সম্পন্ন হউক। অথচ সকল আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন। ফলে পরিণামে পেরেশানীই ভোগ করিতে হয়। বাহ্যতঃ মাল-দৌলত সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সবকিছু থাকিলেও স্বয়ং এগুলিই কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই কোরআন বলে : فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ অর্থাৎ, 'বাহ্যতঃ তাহাদের নিকট অজস্র মাল-দৌলত আছে বটে, কিন্তু এগুলি তাহাদের জন্য শাস্তি বৈ কিছুই নহে।'

আমি কানপুরে জনৈকা ধনী ঘরের গৃহিনীকে দেখিয়াছি, তাহার বেশ কিছু সংখ্যক সন্তানাদি ছিল। ইহাদের প্রতি তাহার মহব্বতের অন্ত ছিল না। এই সন্তানদের মহব্বতের কারণে সে কোন দিন চৌকিতে শয়ন করিতে পারে নাই। কেননা, এক চৌকিতে সব সন্তানের সঙ্কুলান হইত না। অথচ সে সকলকে নিজের সঙ্গে শয়ন করাইত। তদুপরি রাত্রিতে উঠিয়া হাতড়াইয়া দেখিয়া লইত যে, সকলেই ঠিক আছে কি না। সারা রাত্রিই বেচারীকে এইরূপ বিপদের ভিতর দিয়া কাটাইতে হইত। ঘটনাক্রমে একবার তাহার একটি সন্তান মারা গেল। ইহাতে সে এত ব্যথা অনুভব করিল যে, সন্তানের কাফন-দাফনেও শরীক হইল না এবং কানপুর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

তেমনি মাল-দৌলতও মানুষের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, ঘটনাচক্র মানুষের ইচ্ছাধীন নহে, অথচ মানুষ আশা করে অনেক বেশী। ফলে সর্বদাই বিপদ ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনদার ব্যক্তি কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় না। কেননা, সে খোদা তা'আলাকে ভালবাসে। আর এই ভালবাসার অবস্থা এই যে, هرچه آں خسرو کند شیریں بود 'প্রেমাস্পদ যাহা করে, তাহা মিষ্টই হইয়া থাকে।'

হযরত গাওসে আযম (রঃ)-এর একটি ঘটনা বলিতেছি। একবার কেহ তাঁহাকে একটি মূল্যবান কাঁচের আয়না উপহার দিল। তিনি উহা খাদেমের হাতে দিয়া বলিলেন, আমি যখনই চাহিব, তখনই ইহা আমাকে দিবে। এক দিন ঘটনাক্রমে আয়নাটি খাদেমের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। খাদেম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল : از قضا آئینۂ چینی شکست।

'খোদা তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী কাঁচের আয়না ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ উৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন : خوب شد اسباب خود بینی شکست 'চমৎকার হইয়াছে, গর্বের সামগ্রী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' মাল কি জিনিস, সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতেও তাঁহারা মোটেই পেরেশান হয় না। তবে মানসিক কষ্টের কথা ভিন্ন। ইহা দেখার বস্তু নহে। পয়গাম্বরগণেরও এরূপ কষ্ট হইয়াছে। মোটকথা, দ্বীনের সহিত দুনিয়া একত্রিত হইলে সেই দুনিয়াও সুস্বাদু হইবে। এমন কি, একা দ্বীন থাকিলে এবং দুনিয়া না থাকিলেও দ্বীনদারদের জীবন মধুময় হইয়া থাকে। কেননা, পবিত্র কোরআনে ওয়াদা রহিয়াছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج

'পুরুষ ও নারীদের মধ্য হইতে যে মো'মিন অবস্থায় নেক আ'মল সম্পাদন করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে পবিত্র জীবন দান করিব।' অতএব, বুযুর্গগণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়ও অপার আনন্দ অনুভব করেন।

হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তাঁহার মুর্শিদ তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিলেন। তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। ঘটনাক্রমে তখন বাড়ীর সকলেই খাদ্যাভাবে উপবাস করিতেছিলেন। পীর ছাহেবের আগমনে বাড়ীর লোকজন কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেমতে ধার-কর্জ লওয়ার জন্য পরিচারিকাকে মহল্লায় পাঠানো হইল। পরিচারিকা দুই তিন জনের নিকট যাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বারবার আসা-যাওয়া করিতে দেখিয়া পীর ছাহেবের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, অদ্য বাড়ীতে উপবাস চলিতেছে। তিনি খুব দুঃখিত হইলেন। অতঃপর পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন ইহা দ্বারা খাদ্যশস্য কিনিয়া আন। খাদ্যশস্য কিনিয়া আনা হইলে তিনি একটি তাবিজ লিখিয়া উহাতে রাখিলেন এবং বলিলেন, এই খাদ্যশস্য তাবিজসহ একটি পাত্রে রাখিয়া দাও এবং উহা হইতে কিছু কিছু করিয়া বাহির করতঃ ব্যয় করিতে থাক। পীর ছাহেবের এই নির্দেশ পালিত হইল। ফলে খাদ্যশস্যে যারপরনাই বরকত হইল। কিছুদিন পর শাহ্ আবুল মাআলী (রঃ) বাড়ীতে আসিয়া পরপর কয়েক বেলা স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারিলেন। এক দিন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি, আজকাল যে মোটেই উপবাস হইতেছে না। অতঃপর তাঁহাকে পীর ছাহেব প্রদত্ত তাবিজের কথা জানানো হইল। এখানে শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) এর আদব ও খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি এক দিকে তাওয়াক্কুলের আদবও হাতছাড়া করিলেন না এবং আপর দিকে পীরের আদবও পুরা-পুরি বজায় রাখিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ঐ খাদ্যশস্যের পাত্রটি আমার কাছে

আন ; পাত্রটি আনা হইলে তিনি উহার মধ্য হইতে তাবিজটি উঠাইয়া আপন মাথায় বাঁধিলেন এবং বলিলেন, হুযুরের তাবিজের জন্য আমার মাথাই উপযুক্ত স্থান। এরপর খাদ্যশস্যকে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সেমতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইলে তখন হইতেই তাঁহার পরিবারে আবার উপবাস আরম্ভ হইয়া গেল। আসলে তাঁহাদের উপবাস ছিল ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কেননা, তাঁহারা ইহাকে সুন্নত মনে করিতেন।

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস (রঃ) একাধারে তিন দিনও উপবাসে কাটাইয়া দিতেন। বিবি ছাহেবা ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া আরয করিতেন, হযরত, আর সহ্য করিতে পারি না। তিনি বলিতেন, আর সামান্য ধৈর্য ধর। জান্নাতে আমাদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহার বিবি ছাহেবাও অত্যধিক নেক ছিলেন। তিনি হাসিমুখে উপবাস সহ্য করিয়া যাইতেন।

বন্ধুগণ, এইসব ঘটনা শুনিয়া আপনাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে আপনাদের বিস্ময় প্রকাশ করা আর সহবাসের আনন্দের কথা শুনিয়া পুরুষত্বহীন ব্যক্তির বিস্ময় প্রকাশ করা একই পর্যায়ভুক্ত। কেননা, সামান্য অনুভূতি থাকিলেই প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে, খোদার মহব্বতে কি অবস্থা হয়। যে কোন মহব্বতেই এইরূপ অবস্থা হয় :

چوں در چشم شاهد نیاید زرت + زر و خاک یکساں نماید برت

(চুঁ দর চশমে শাহেদ নায়ায়াদ যরাত + যর ও খাক একসাঁ নুমায়াদ বরাত)

অর্থাৎ, তোমার স্বর্ণ যদি মা'শুকের দৃষ্টিতে পছন্দ না হয়, তবে এরূপ স্বর্ণ ও মাটি তোমার নিকট সমান বলিয়া মনে হইবে।'

দেখুন, আপনি যদি প্রেমাস্পদকে এক হাজার টাকা দেন, আর সে উহাতে লাথি মারিয়া দেয়, তবে আপনার দৃষ্টিতেও এই এক হাজার টাকার কোন মূল্য থাকে না। অপ্রকৃত মহব্বতের যখন এই অবস্থা, তখন প্রকৃত মহব্বতের কি অবস্থা হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই কবি বলেন :

ترا عشق همچو خودے زآب وگل + ربايد همه صبر وآرام دل

عجب داری از سالکان طریق + که باشند در بحر معنی غریق

(তুরা এশ্‌কে হামচু খুদে যেআব ও গেল + রুবায়েদ হামা ছবর ও আরামে দিল

আজবদারী আয সালেকানে তরীক + কেহ্ বাশান্দ দর বহ্‌রে মা'না গরীক)

অর্থাৎ, 'তোমার এশ্‌ক তোমার ন্যায় পানি ও মাটি (অর্থাৎ অস্থায়ী)। ইহা তোমার সমস্ত ধৈর্য ও আরাম বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সালেক ব্যক্তিগণ খোদাতত্ত্বের সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন বলিয়া তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ।'

দেখুন, প্রেমাস্পদ যদি আশেককে কাছে বসার অনুমতি দেয়, ইতিমধ্যে খাওয়ার সময় উপস্থিত হয় এবং সে তাহাকে বলে যে, ক্ষুধা লাগিলে যাইয়া খাও, তবে আশেক

খাওয়ার জন্য উঠিয়া যাওয়া পছন্দ করিবে কি ? কখনই নহে। মহব্বতের এই অবস্থা হইলে উপরোক্ত বুযুর্গের উপবাসে বিস্ময়ের কি আছে ? তাঁহারা প্রকৃত প্রেমাস্পদ হক তা'আলার সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। মাওলানা রূমী বলেন :

گفت معشوقے بعاشق کای فتا + تو بہ غربت دیدۂ بس شہرہا
پس کدامی شہر از انہا خوشتر ست + گفت آں شہرے کہ دروے دلبر ست

(গুফ্‌ত মা'শুকে বআশেক কায়ফাতা + তু ব-গুরবত দিদায়ী বস শহরহা
পস কুদামি শহর আয আঁহা খুশতরাস্ত + গুফ্‌ত আঁ শহরে কেহ্ দরওয়ে দিলবরআস্ত)

অর্থাৎ, 'জনৈক মা'শুক আশেককে বলিল, হে যুবক, তুমি মুসাফির অবস্থায় অনেক শহর দেখিয়াছ। বল তো, কোন্ শহরটি বেশী সুন্দর ? আশেক বলিল, যে শহরে মা'শুক অবস্থান করে। এরপর মাওলানা আরও বলেন :

ہر کجا دلبر بود خرم نشیں + فوق گردوں ست نے قعر زمیں
ہر کجا یوسف رخے باشد چو ماہ + جنت ست آں گرچہ باشد قعر چاہ

(হরকুজা দিলবর বুয়াদ খুররম নেশি + ফাওকে গিরদূঁ আস্ত নায় কা'রে যমীন
হরকুজা ইউসুফ রুখে বাশাদ চুঁ মাহ + জান্নাতাস্ত আঁ গরচে বাশাদ কা'রে চাহ্)

অর্থাৎ, 'যেখানে মা'শুক আছে, সেখানেই আনন্দচিত্তে বসিয়া পড়। উহা আসমান হইতেও উচ্চ, যমিনের গর্ত নহে। যেখানেই চন্দ্রের ন্যায় ইউসুফের মুখমণ্ডল থাকে উহাই জান্নাত— যদিও তাহা কূপের গর্ত হয়।'

প্রেমাস্পদ কূপের ভিতরে থাকিলে কূপও জান্নাত। অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভেই এই অবস্থা হইলে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভে কি হইবে।

মোটকথা, দুনিয়াদারেরা আপনাদিগকে স্বাদহীন দুনিয়া শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে আমরা স্বাদযুক্ত দুনিয়া শিক্ষা দেই। ইহা হইল দ্বীনসহ দুনিয়া। এই দুনিয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তবে নিয়ম মাফিক উত্তর প্রথমেই বলিয়াছি। অর্থাৎ, দুনিয়া সম্বন্ধে বলা আমাদের দায়িত্ব নহে।

॥ দ্বীনের অঙ্গ ॥

দুনিয়া সম্বন্ধে এপর্যন্ত বলা হইল। এখন দ্বীন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। দ্বীনের পাঁচটি অঙ্গ আছে। (১) আকায়েদ, (২) দীয়ানাত তথা এবাদত, (৩) পারস্পরিক মুয়ামালা, (৪) সামাজিকতা ও (৫) চরিত্র।

ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গের দিক দিয়াই আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আকায়েদের ক্ষেত্রে তৌহীদ ও রেসালত সম্বন্ধে যে সব গোলমাল আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। কোথাও অনুমানভিত্তিক দর্শনের

দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়, আবার কোথাও ভণ্ড সূফীবাদের কারণে নানা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ওলীআল্লাহ্‌দিগকে নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং নবীগণকে আল্লাহ্ হইতে শ্রেষ্ঠ বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শরীয়ত হইতে যত বেশী দূরে, তাহাকে তত বেশী খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করা হয়। ইহার ফলস্বরূপ ফাসেক ব্যক্তিরা ওলীআল্লাহ্ বলিয়া গণ্য হইতেছে। দ্বিতীয় অঙ্গ হইল এবাদত। এক্ষেত্রেও আপনারা জানেন যে, কয়জনেই বা রোযা রাখে, কয়জনেই বা যাকাত দেয় এবং কয়জনেই বা হজ্জ করে। তৃতীয় অঙ্গ হইল পারস্পরিক মোয়ামালা বা লেন-দেন। মানুষ ইহাকে শরীয়তের বিষয়বস্তু বলিয়াই মনে করে না। তাহাদের মতে অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, সুদ ইত্যাদি হারাম নহে। যেকোন উপায়ে বিস্তর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করাই হইল তাহাদের লক্ষ্য। ব্যস, খাদ্যে ঘিয়ের পরিমাণ বেশী হওয়া চাই। কাহারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা তাহাদের কাছে কিছুই নহে। সুদসহ ঋণের ডিক্রি করাইয়াও তাহারা দুঃখ করে না। চতুর্থ অঙ্গ হইল সামাজিকতা। ইহার দুর্গতিও সকলের জানা আছে। বিবাহ শাদী ও শোকানুষ্ঠানাদিতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা হয়। কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা নাই এবং ফতোয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। বিবি ছাহেবা যাহা বলিয়া দেয়, চক্ষু মুদিয়া তাহাই করা হয়। যেন বিবি ছাহেবাই শরীয়তের মুফ্‌তী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—যে জাতির নেতা হইবে মহিলা, সেই জাতি কখনও মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে না।

॥ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ॥

আজকাল আমাদের বেশভূষা দেখিয়া আমরা মুসলমান, না কাফের কিছুই বুঝা যায় না। দাড়ি একেবারে সাফ—মাথায় জঙ্গলী লোকের ন্যায় লম্বা চুল। বন্ধুগণ, আজকাল জাতি জাতি বলিয়া সর্বত্রই চীৎকার শুনা যায়। 'জাতি' শব্দটির বেজায় পূজা করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরও পরওয়া করেন না। আপনাদের পক্ষে দাড়ি রাখা ফরয না হইলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য মনে করিয়া হইলেও ইহা রাখা দরকার। জাতীয় বৈশিষ্ট্যও তো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমান হিন্দুর বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং হিন্দু মুসলমানের—ইহা কত বড় দুঃখের কথা!

একবার আমার ভাইয়ের নিকট দুইজন পদস্থ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমানের আকৃতিতে হিন্দু এবং অপরজন ছিল হিন্দুর আকৃতিতে মুসলমান। মুসলমান ব্যক্তির জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে পান পাঠানো হইল। চাকর তাহাদের কাহাকেও চিনিত না। এই জন্য সে হিন্দুর সম্মুখে পান পেশ করিল। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই হাসিতে থাকে। ইহা দেখিয়া চাকর বুঝিয়া ফেলিল যে, যাহার মুখে দাড়ি নাই—সে-ই মুসলমান।

ভাইগণ, যদিও গোনাহ্ হিসাবে সকল গোনাহ্ই মন্দ; কিন্তু কোন কোন গোনাহ্র ক্ষেত্রে মানুষ আপন অপারগতা ও অজুহাত বর্ণনা করিতে পারে—যদিও তাহা কাল্পনিক হয়। উদাহরণতঃ সুদ লওয়ার ব্যাপারে অনেক অজুহাত বর্ণনা করা হয়। যদিও সেগুলি কাল্পনিক, তবুও সেগুলি অজুহাত বটে। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডানোর ন্যায় অশোভনীয় কার্যের কি অজুহাত আছে? ইহার জন্য কোন্ কাজটি অসমাপ্ত থাকে? যদি কেউ বলে যে, দাড়ি মুণ্ডাইলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তবে আমি বলিব যে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। একই বয়সের দুই জন ব্যক্তি—এক জন দাড়ি মুণ্ডানো ও অপরজন দাড়িবিশিষ্ট—উপস্থিত করুন। এরপর তুলনা করিয়া দেখুন, কাহার মুখমণ্ডল হইতে সৌন্দর্য এবং কাহার মুখমণ্ডল হইতে কদর্য বর্ষিত হয়। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একদল ফেরেশ্‌তা সর্বদাই এইরূপ তস্‌বীহ পাঠ করে:

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحٰى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ

'আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি পুরুষদিগকে দাড়ি দ্বারা এবং নারীদিগকে কেশগুচ্ছ দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছেন।'

ইহাতে বুঝা যায় যে, দাড়ি পুরুষদের জন্য সৌন্দর্যবর্ধক। এই সৌন্দর্যের প্রয়োজন না হইলে মহিলাদের মাথাও মুণ্ডাইয়া দেওয়া উচিত। মোটকথা, সৌন্দর্য দাড়ি মুণ্ডাইবার কারণ হইতে পারে না।

কলিকাতায় জনৈক কাফের মাওলানা শহীদ দেহ্‌লভী (রহঃ)কে বলিয়াছিল, চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, দাড়ি রাখা একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। কেননা, ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হইলে মায়ের গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণের সময়ও থাকিত। মাওলানা শহীদ (রহঃ) বলিলেন, ইহাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণ হইলে দাঁতও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই আপন মুখের সমস্ত দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেল। কেননা, জন্মগ্রহণের সময় ইহা ছিল না।

মোটকথা, দাড়ি মুণ্ডানো একটি অনর্থক কাজ। এক্ষণে আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে দাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি না। তবে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও রোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে দাড়ির কথা আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণ, খোদার কসম মাঝে মাঝে দাড়ির আলোচনা করিতে যাইয়া কোন কোন ব্যক্তির অপছন্দের কথা ভাবিয়া লজ্জা অনুভব করি, কিন্তু মুণ্ডনকারীরা এতটুকুও লজ্জা অনুভব করে না। সর্বনাশের কথা এই যে, আজকাল কেহ কেহ দাড়ি মুণ্ডানোকে হালালও মনে করে। এ সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করিলে তাহারা বলে য, দাড়ি মুণ্ডানো হারাম বলিয়া কোরআনে কোন প্রমাণ নাই।

॥ শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তি ॥

এই প্রশ্নটি আজকাল খুব ব্যাপকাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে কোন বিষয় সম্মুখে আসুক, প্রত্যেকেই কোরআন হইতে উহার প্রমাণ দিতে বলে। আমি এই প্রশ্নের একটি চূড়ান্ত উত্তর দিতেছি। উত্তরটি কোন রসাত্মক গল্পের ন্যায় হইবে না; বরং চিন্তার খোরাক যোগাইবে। এজন্য প্রথমে একটি শরীয়তের নীতি ও একটি সামাজিক নীতি বর্ণনা করিতেছি।

সামাজিক নীতি এই যে, মনে করুন, এক ব্যক্তি এক হাজার টাকা দাবী করিয়া আদালতে মোকদ্দমা পেশ করিল। দাবীর প্রমাণ স্বরূপ সে এমন দুই জন সাক্ষীও উপস্থিত করিল, তাহাদের কোন ত্রুটি অথবা দোষ বাহির করিতে বিবাদী সক্ষম নহে। এমতাবস্থায় নিশ্চিতভাবেই বিবাদীর বিপক্ষে মোকাদ্দমার ডিক্রি হইয়া যাইবে। এরপর এই সাক্ষীদিগকে প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার বিবাদীর থাকিবে না। বিবাদী এই কথা বলিতে পারিবে না যে, যতক্ষণ স্বয়ং জজ ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া সাক্ষ্য না দেয়, ততক্ষণ আমি এই দাবী স্বীকার করিব না। বিবাদী এইরূপ বলিলে আদালত ইহার উত্তরে বলিবে যে, দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য যে কোন সাক্ষীই যথেষ্ট—বিশিষ্ট সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুতরাং হয় এই সাক্ষীদ্বয়ের দোষ-ত্রুটি বাহির কর, না হয় দাবী স্বীকার করিয়া লও। এই নীতিটিকে সামাজিক ও শরীয়তভিত্তিক উভয়টি বলা চলে।

শরীয়তের নীতি এই যে, শরীয়তের প্রমাণ চারিটি ((১) কোরআন, (২) হাদীস, সুতরাং কেহ هذا حكم شرعى (ইহা শরীয়তের হুকুম) বলিয়া দাবী করিলে ইহার অর্থ এই যে, ইহা শরীয়তে চারি প্রমাণের মধ্য হইতে কোন একটি দ্বারা প্রমাণিত আছে। এই দাবীটিও এক হাজার টাকা দাবী করার অনুরূপ। সুতরাং ঐ ব্যক্তির ন্যায় এই ব্যক্তিরও চারিটি প্রমাণের মধ্য হইতে যে কোন একটি দ্বারা প্রমাণিত করার অধিকার আছে। ইচ্ছা হইলে এই দাবীর স্বপক্ষে কোন হাদীস পড়িয়া দিতে পারে কিংবা ইমাম আবু হানীফা (রাহ্)-এর উক্তি পেশ করিতে পারে।

এই দুইটি নীতি জানার পর এখন পূর্বোল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর শুনুন। দাড়ি কাটানো অথবা মুণ্ডানো যে হারাম, তাহার প্রমাণ হাদীসে রহিয়াছে। হাদীসও শরীয়তের অন্যতম প্রমাণ। যদিও কোরআন হাদীস অপেক্ষা বড় প্রমাণ। তবুও কোরআন হইতে প্রমাণ চাওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষ্যের উপর দাবীর স্বীকৃতি নির্ভরশীল রাখার ন্যায়। তবে সম্ভব হইলে হাদীসে দোষ-ত্রুটি বাহির করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। হাদীসে দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে সক্ষম না হইলে দাবীর স্বীকৃতিতে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ থাকে না।

আমি উত্তর দাতা মৌলবীদিগকেও বলিতে চাই যে, কোনরূপ বাধ্য বাধকতা সহ প্রশ্ন করা হইলে আপনারা তদনুরূপ উত্তর দানের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবেন না। প্রশ্নকারীদের সম্মুখে এহেন বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকেই মৌলবীদিগকে চরিত্রহীন বলিয়া অভিহিত করে। অথচ মৌলবীরা এত চরিত্রবান যে, তাহাদের বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করার দরুন আপনারা চরিত্রের সীমা ডিঙ্গাইয়া গিয়াছেন। মোটকথা, দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার প্রমাণ কোরআনে তালাশ করা এবং হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা মারাত্মক ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। উত্তর-দাতা মৌলবী ছাহেবদিগকেও বলিতেছি—আপনারা কোরআন হইতেই ইহার প্রমাণ দিতে চাহিতেছেন। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, দাড়ি মুণ্ডানো যে হারাম তাহার প্রমাণ কোরআনে দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তবে এভাবে কয়টি মসআলার প্রমাণ কোরআনে দেখাইতে পারিবেন ? উদাহরণতঃ মাগরিবের তিন রাকাত, বিতরের নামায ওয়াজেব কি না এবং উহা তিন রাকাতবিশিষ্ট কি না এগুলি কোরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন ?

॥ আমাদের চারিত্রিক অবস্থা ॥

দ্বীনের পঞ্চম অঙ্গ হইল চরিত্র। এ সম্বন্ধে সকলেই জানেন যে, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির কবল হইতে আমাদের আলেম এবং ছাত্র সমাজও অল্পই বাঁচিয়া থাকেন। অধিকাংশ দ্বীনদার লোককে দাড়ি রাখা, গোড়ালির উপরে পায়জামা পরিধান করা এবং শরীয়ত সম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ব্যাপারে যত্নবান দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের চারিত্রিক দুরবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, শরীয়তের বাতাসও তাহাদের গায়ে লাগে নাই। ফলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل + واندروں قہر خدائے عزوجل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید + وز درونت ننگ میدارد یزید

(আযবেরূঁ চুঁ গোরে কাফের পুর হুলাল + ওআন্দরূঁ কহ্‌রে খোদায়ে আয্‌যা ও জাল্ল
আযবেরূঁ তা'না যানী বর বায়েযীদ + ওযদরুনাত নঙ্গ মীদারাদ এয়াযীদ)

'বাহ্যিক অবস্থা কাফেরের সমাধির ন্যায় সুসজ্জিত, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ খোদার গযবে পূর্ণ। বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা তুমি বায়েযীদের প্রতিও বিদ্রূপ কর, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া এযীদও তোমাকে দেখিয়া লজ্জাবোধ করে।'

অনেক লোক আমাদের দরবেশ সুলভ বেশভুষা দেখিয়া ধোকায় পড়িয়া যায়। আর মনে করে যে, বোধ হয় তাহারা খোদা তা'আলার বিশেষ মক্‌বুল বান্দা। অথচ আমাদের মধ্যে দ্বীনের এই বিরাট অঙ্গ চরিত্রের নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের সমস্ত চালচলন লৌকিকাতয় পূর্ণ এবং যাবতীয় কাজ-কর্ম কৃত্রিমতা

প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের অন্তর্নিহিত এইসব রোগের চিকিৎসা নেহায়েৎ জরূরী। ইহাদের ফলস্বরূপ আমাদের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আমি ইহাদের চিকিৎসা বর্ণনা করিতেছি।

॥ চিকিৎসার প্রকারভেদ ॥

প্রত্যেক রোগেরই দুই প্রকারে চিকিৎসা করা যায়। একটি সামগ্রিক চিকিৎসা অপরটি আংশিক চিকিৎসা। প্রত্যেকটি পীড়া ও প্রত্যেকটি রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা করাকে আংশিক চিকিৎসা বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত রোগের মূল কারণটি এমনভাবে উপড়াইয়া ফেলা হয় যে, ইহাতে প্রত্যেকটি রোগ আপনাআপনি দুর হইয়া যায়, তবে উহাকে সামগ্রিক চিকিৎসা নামে অভিহিত করা হয়। শরীয়তে এই উভয় প্রকার চিকিৎসাই বিদ্যমান আছে। তবে আংশিক চিকিৎসাটি কঠিন বলিয়া আজকালকার মানুষের মধ্যে উহার প্রতি উৎসাহ নাই। কিন্তু আগেকার যুগের মানুষ এই চিকিৎসাই অবলম্বন করিত। তাহারা রিয়া, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, গর্ব, শক্রতা ইত্যাদি রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা করিত। চিকিৎসকের জন্য এই পদ্ধতিটিই সহজ—যদিও রোগীর পক্ষে কঠিন।

উদাহরণতঃ কেহ আপাদমস্তক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইলে যদি তাহাকে একটিমাত্র ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং উহাতেই সে যাবতীয় রোগের কবল হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে তাহার জন্য ইহাই সহজ ও সরল পথ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে এই পদ্ধতিটি খুবই সুকঠিন। ইসলামী শরীয়তকে শত ধন্যবাদ, সে এমন চিকিৎসাও বলিয়া দিয়াছে যে, একটিমাত্র চিকিৎসা দ্বারাই যাবতীয় রোগের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আসল রোগ থাকে একটি এবং অবশিষ্ট সবগুলি রোগই উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, জনৈক ব্যক্তি চিকিৎসককে বলিল, তাহার নিদ্রা আসে না। চিকিৎসক বলিল, বার্ধক্যের কারণে। রোগী বলিল, আমার মাথাব্যথাও থাকে। চিকিৎসক বলিল, ইহাও বার্ধক্যের কারণে। এইভাবে রোগী আরও অনেকগুলি রোগের কথা জানাইল। চিকিৎসক সবগুলির উত্তরে বলিল যে, বার্ধক্যের কারণেই এগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষেত্রে আসল রোগ হইল বার্ধক্য। অবশিষ্ট সবগুলি ইহা হইতেই উদ্ভুত ছিল।

আরও একটি দৃষ্টান্ত বুঝুন। মনে করুন, রাত্রিকালে আপনি বাতি নিভাইয়া দিলেন। তখন ইঁদুর, গন্ধমূষিক, টিকটিকি ইত্যাদি অনিষ্টকর প্রাণী দলে দলে বাহির হইতে লাগিল। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ অনেকগুলি অনিষ্টকর প্রাণীর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে তাড়ানো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই সবগুলির বাহির

হইয়া আসার কারণ মাত্র একটি এবং তাহা হইল অন্ধকার। ইহা দূর করিয়া দিলে সকল অনিষ্টকর প্রাণীই আপনাআপনি দূর হইয়া যাইবে। আমাদের পাক শরীয়তের মধ্যেও এইরূপ গুণ রহিয়াছে। সে রোগতালিকার মধ্য হইতে একটি মৌলিক রোগ বাছাই করিয়া উহার চিকিৎসা বলিয়া দেয়।

॥ মৌলিক রোগ ॥

আমাদের আসল রোগ দুইটি। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে এই দুইটি রোগই একসঙ্গে পাওয়া যায়। আবার মাঝে মাঝে একটি পাওয়া যায়—অপরটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুইটি হইতে একটিও পাওয়া যাইবে না—এরূপ কখনও হয় না। আমি এই বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করিব। কারণ এক দিকে আমাদের অবস্থা সংশোধিত করা খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অপর দিকে আমরা মনে করি যে, আমাদের অবস্থার সংশোধন সম্ভবপর নহে। অথচ এরূপ মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি। বন্ধুগণ, দ্বীন এরূপ সঙ্কীর্ণ হইলে কোরআন শরীফে ইহা বলা হইত না :

لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية -

'আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছি।'

তাছাড়া মুসলমানদিগকে দুনিয়াতে খেলাফত ও রাজত্ব দান করা হইত না। অতএব, অবস্থা সংশোধনের জন্য দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা জরুরী—এরূপ মনে করা নিরেট ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে।

আসল রোগগুলির মধ্যে একটি হইল শিক্ষার অভাব। দ্বীনি শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। অপরটি হইল বুযুর্গদের সংসর্গের অভাব। আমার এই কথায় জ্ঞানী লোকগণ এই বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তৎসঙ্গে ইহা দ্বারা একটি বড় সন্দেহও মোচন হইয়া গিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোকের ব্যাপক ধারণা এই যে, দ্বীনি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দানের পিছনে আলেমদের উদ্দেশ্য হইল পূর্ণরূপে মৌলবী বানানো। তাহাদের মতে ইহা ছাড়া উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমার উপরোক্ত বাক্য সংযোজনের ধারা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, আলেমদের মতে পূর্ণরূপে মৌলবী হওয়া জরুরী নহে; বরং পুরাপুরি মৌলবী হওয়া অথবা বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করা—এই দুইটি হইতে একটি জরুরী।

এই বিষয়টি আরও সামান্য বিস্তারিতভাবে বুঝা দরকার। দ্বীনি শিক্ষা লাভ করা দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু দ্বীনি শিক্ষা লাভ করা। এতটুকু শিক্ষা লাভ করা সকলের পক্ষেই জরুরী। (২) যতটুকু শিক্ষা লাভ

করিলে পরিভাষায় আলেম বলা হয়, ততটুকু শিক্ষা লাভ করা। ইহা সকলের জন্যই জরূরী নহে। উদাহরণতঃ সরকারী আইন প্রয়োজন অনুযায়ী জানা সকল প্রজার পক্ষেই জরূরী। কিন্তু আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লওয়া সকলের জন্য জরূরী নহে। কোন সরকার সকলের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক করিলে উহাকে অবশ্যই সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে। তদ্রূপ সকলেই পারিভাষিক আলেম হইতে পারে না। আমি এ এসম্বন্ধে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, সকলকে পারিভাষিক আলেম বানানো জরূরীও নহে। এখন আপনার কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। আমার এই উক্তির কারণ এই যে, সকলেই মৌলবী হইয়া মৌলবীসুলভ কাজে মশ্‌গুল হইয়া পড়িলে জীবিকা উপার্জনের কাজকারবার একেবারে অচল হইয়া যাইবে। অথচ এইসব কাজকারবার চালু রাখা স্বয়ং শরীয়তের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

॥ আলেমদের উদ্দেশ্য ॥

এখন আমি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, সকলকে মৌলবী বানানো জায়েযও নহে। ইহাতে হয়তো অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারে। তাই বলিতেছি যে, এখানে মৌলবী হওয়ার অর্থ অনুসৃত হওয়া (অর্থাৎ, যাহাকে অপরাপর লোকেরা অনুসরণ করিয়া চলে।) অনুসৃত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। তন্মধ্যে প্রধান শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাশীল হইতে হইবে, প্রবৃত্তির অনুসারী হইলে চলিবে না। তাহাকে লোভ ও লালসামুক্ত হইতে হইবে। লোভের বশবর্তী হইয়া মাসআলা পরিবর্তন করিয়া দেয়—এরূপ হইলে চলিবে না। এই দোষটিই বনি ইস্রাইলের আলেমদের মধ্যে ছিল। ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধেই কবি বলেন ঃ

بے ادب را علم وفن آموختن + دادن تیغ است دست راہزن

(বে আদব রা এল্‌মও ফন আমুখতান + দাদন তেগ আস্ত দস্তে রাহেযান)

'বে-আদবকে এল্‌ম ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দস্যুর হাতে তলোয়ার উঠাইয়া দেওয়ারই নামান্তর।'

ইহা চাক্ষুষ ঘটনা যে, বহু মানবপ্রকৃতি লোভের বশবর্তী রহিয়াছে। এমতাবস্থায় মনে করুন, কোন লোভী ও প্রবৃত্তি পুজারী ব্যক্তিকে অনুসৃত বানাইয়া দিলে সে কি করিবে? ইহা জানা কথা যে, সে জাতির সংশোধনের পরিবর্তে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে। সে মনগড়া মাসআলা লিখিবে। আমি জনৈক ব্যক্তির ফতোয়া পাঠ করিয়াছি। সে এক হাজার টাকা লইয়া শ্বাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিল।

কথিত আছে, একবার দিল্লীর জনৈক বাদশাহর মনে রেশমী বস্ত্র পরিধান করার সখ জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে বেতনভোগী মৌলবীরা ইহা হালাল বলিয়া ফতোয়া লিখিয়া

দিল। তাহারা ইহা হালাল হওয়ার বহু কারণও লিখিয়া দিল। বাদশাহ বলিলেন, যদি মোল্লাজীও ইহাতে দস্তখত করিয়া দেয়, তবে আমি পরিব। সে মতে মোল্লাজীর নিকট ফতোয়া চাহিয়া পাঠানো হইল। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি দিল্লীতে আসিয়া এই প্রশ্নের জবাব দিব এবং প্রকাশ্য জামে মসজিদে দাঁড়াইয়া উত্তর দিব। সে মতে তিনি দিল্লী আগমন করিলেন এবং জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইলেন। প্রশ্ন ও উত্তর ব্যক্ত করিয়া শুনাইবার পর তিনি হারামকে হালাল জ্ঞান করার কারণে ধমকি স্বরূপ বলিলেন : مفتی و مستفتی هر دو کافر اند অর্থাৎ, 'ফতোয়াদাতা ও ফতোয়াপ্রার্থী উভয়ই কাফের।' বাদশাহ ইহা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং মোল্লাজীকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করিলেন। বাদশাহর জনৈক পুত্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দৌড়িয়া মোল্লাজীর নিকট আগমন করিল এবং বলিল, আপনাকে হত্যা করার মতলব আঁটা হইতেছে। মোল্লাজী ইহা শুনিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, আমি এত কি অন্যায় করিলাম ? আমার জন্য ওযূর পানি আন। আমি অস্ত্র পরিধান করিয়া লই। কেনেনা, হাদীসে বলা হইয়াছে : الوضوء سلاح المؤمنين "ওযূ মোমিনের হাতিয়ার।" প্রকৃতপক্ষে এহেন বুযুর্গদিগকে সঙ্গীহীন মনে করা উচিত নহে। হাফেয (রঃ) বলেন :

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات + با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

(বসতাজরেবা করদীম দরী˚ দায়রে মুকাফাত
বাতুরদে কাশাঁ হরকেহ্ দর উফ্‌তাদ বর উফ্‌তাদ)

'এই দান-প্রতিদানের দুনিয়াতে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি যে, যে কেহ বুযুর্গদের সহিত শত্রুতা করে, সে-ই ধ্বংস হইয়া যায়।

হাদীসে বলা হইয়াছে : مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

'যে, ব্যক্তি আমার ওলীর সহিত শত্রুতা রাখে, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।'

শাহ্‌যাদা মোল্লাজীর দুর্দমনীয় প্রতাপ লক্ষ করিয়া তাড়াতাড়ি পিতার নিকট গমন করিয়া বলিল, আপনি সর্বনাশ করিতেছেন। মোল্লাজী আপনার মোকাবিলা করার জন্য ওযূ করতঃ ওযূরূপ হাতিয়ার দুরুস্ত করিতেছেন এবং সজ্জিত হইতেছেন। বাদশাহ্ ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, এখন কি করা যায় ? আমি তো নির্দেশ জারী করিয়া ফেলিয়াছি। শাহ্‌যাদা বলিল, সকলের সম্মুখে আমার হাতে মোল্লাজীর জন্য একটি মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দিন। সেমতে এরূপ করা হইলে মোল্লাজীর রোষ দমিত হইল।

এই শ্রেণীর লোক অবশ্য অনুসৃত হওয়ার যোগ্য। অতীতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কম ছিল না। ইহার বিপরীতে লোভী ব্যক্তিদের দ্বারা অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

এমনি এক বুযুর্গ প্রবরের ঘটনা বলিতেছি। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হইয়াছিল। জনৈকা মহিলা স্বামী থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন পুরুষকে ভালবাসিত। সে ঐ বুযুর্গ প্রবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি স্বামীর সহিত বসবাস করিতে চাই না। অথচ সে আমাকে তালাকও দেয় না। এমতাবস্থায় আমি কি করিব ? বুযুর্গ প্রবর বলিলেন, তুই কাফের হইয়া যা। (নাউযুবিল্লাহ্) ইহাতে আপনাআপনি বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বলুন, এরূপ লোক অনুসৃত হইয়া গেলে জাতির কি দশা হইবে ? যেসব শিক্ষক এই জাতীয় লোকদিগকে পড়ায়, তাহারা যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে পূর্বেই বুঝিতে পারে যে, ইহারা ভবিষ্যতে এরূপ হইবে, তবে তাহাদিগকেও সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা তাহারা খোদার দরবারে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। এই কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ লোক বাছাই করিয়া পড়াইতেন। তাঁহারা যে-কোন বাজে লোককে অনুসৃত হওয়ার সীমা পর্যন্ত এল্‌মে দ্বীন শিখাইতেন না।

এই আলোচনা শুনিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তিরা হয়তো আনন্দিত হইয়া বলিবে, আমরা পূর্বেই বলিতাম যে, তাঁতি, কলুদিগকে পড়ানো উচিত নহে। এখন তাহাই প্রমাণিত হইয়া গেল। এরূপ লোকদের জানা উচিত যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নীচজাত ও উচ্চজাতের ভিত্তিতে লোক বাছাই করিতেন না ; বরং তাঁহারা যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক বাছাই করিতেন ; অর্থাৎ যাহার মধ্যে সদগুণাবলীর লক্ষণ দেখিতেন, তাহাকে এল্‌মে দ্বীন পুরাপুরি শিখাইতেন। পক্ষান্তরে যাহার মধ্যে অসদগুণাবলীর লক্ষণ দেখিতেন, তাহাকে দরকার পরিমাণ এলমে দ্বীন শিখানোর পর অন্য কাজে যোগদান করার পরামর্শ দিতেন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাধারণ পরিবারের এবং শেষোক্ত ব্যক্তি কোন উচ্চ পরিবারের হইলেও সেদিকে লক্ষ্য করিতেন না। তাঁতি ও কলুদের উপস্থিতি আপনার জন্য এতই লজ্জাকর হইলে আপনি তাহাদের জান্নাতেও প্রবেশ করিবেন না ; বরং ফেরাউন ও হামানের সহিত চলিয়া যাইবেন। কেননা, তাহারা দুনিয়াতে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

বন্ধুগণ, জাতের উচ্চতা ও নীচতা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার। পক্ষান্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ; অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারের জন্য কাহারও সম্মান বাড়ে বা কমে না ; বরং সম্মান ও অসম্মান উভয়টিই একান্তভাবে ইচ্ছাকৃত কাজের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই ক্বিয়ামতের দিন উচ্চজাতসমূহকে কোন মূল্য দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন : فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ 'সেই দিন মানুষের মধ্যে জাতের কোন ভেদাভেদ থাকিবে না এবং তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করা হইবে না।'

তাছাড়া উচ্চ জাতের লোকগণ নিজেরাও পড়িবে না এবং নীচ জাতের লোকদিগকেও পড়িতে দিবে না—যুলুম বৈ কিছুই নহে। খোদায়ী ধর্মের প্রচার ও

প্রসার অবশ্যই হইবে। এজন্য প্রত্যেক যুগেই গায়েব হইতে ইহার ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। যতদিন পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোকগণ এল্‌মে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী ছিল, ততদিন খোদাতা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে বড় বড় মনীষী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের দ্বারা ধর্ম প্রচারের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে তাহারা এলমে দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, সেদিন হইতে খোদাতা'আলাও এই দৌলত অন্যান্য জাতের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। মোটকথা, জাতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

আমি মাদ্রাসাসমূহের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা যেন আইনের কোঠা পূর্ণ করা ও কার্যক্রম দেখাইবার উদ্দেশ্যে বদস্বভাব লোকদিগকে মাদ্রাসায় ভর্তি না করেন। ছাত্রদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতার পরওয়া করা উচিত নহে। অবস্থা দৃষ্টে যে ব্যক্তিকে অনুস্থত হওয়ার অযোগ্য মনে করা হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার।

কানপুরে অবস্থান কালে একবার আমি এমন আটজন ছাত্রকে মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম—তাহাদের শিক্ষা প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল। ইহাতে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিলে মাদ্রাসার কীর্তিকল্প অনেক হ্রাস পাইবে এবং এবৎসর জনগণকে দেখাইবার মত কোন কীর্তিকল্প বাকী থাকিবে না। আমি বলিলাম, কার্যক্রম দেখাইবার প্রতি আপনাদের লক্ষ্যের অভাব দেখিতেছি না; কিন্তু ইহারা যে ধর্মীয় ব্যাপারে অনুস্থত হইতে চলিয়াছে, সেদিকে আপনাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। যেক্ষেত্রে মানুষ তাহাদের অনুসরণ করিবে, সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের অবস্থাই যদি এরূপ হয়, তবে গোম্‌রাহ করা ছাড়া তাহারা আর কি করিতে পারিবে? ইহাতে কর্তৃপক্ষ ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

মোটকথা, আপনারা এরূপ আশঙ্কাই করিবেন না যে, আমরা সকলকেই মৌলবী বানাইবার ফন্দি আঁটিতেছি। কেননা, আমরা অনেককেই মৌলবী বানানো জায়েযও মনে করি না। এরূপ লোকদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে:

زیاں میکند مرد تفسیر داں + که علم و ادب می فروشد بناں

(যিয়াঁ মীকুনাদ মর্‌দে তফসীর দাঁ + কেহ্ এল্‌ম ও আদব মীফরুশাদ বনাঁ)

অর্থাৎ, 'অনেক তফসীরবিদ ব্যক্তি সর্বনাশ করিতেছে, যে রুটির পরিবর্তে এল্‌ম ও জ্ঞানকে বিক্রয় করিতেছে।'

এইসব লোভীদের কারণেই আজকাল আলেম সম্প্রদায় লাঞ্ছিত ও অপমাণিত। খোদার কসম, আজ যদি সত্যপন্থী আলেমদের ন্যায় গোটা আলেম সমাজ হাত গুটাইয়া লইতেন, তবে এই বড় বড় অহঙ্কারীরাও তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক নত করিতে

বাধ্য হইত। কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে কোনকিছু পেশ করিলেও তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা আলেমদের পক্ষে উত্তম কাজ। বন্ধুগণ, আলেমদের অস্তিত্ব আসলে খুবই প্রিয় বস্তু ছিল। তাহারা কাহারও বাড়ীতে চলিয়া গেলে সেদিন তথায় ঈদ হওয়া উচিত ছিল। অথচ আজকাল এরূপ দিন ঈদের পরিবর্তে ওয়ীদ অর্থাৎ সর্বনাশের দিন হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, এই লোভীদের বদৌলতে আজকাল প্রত্যেক আলেমের মুখ দেখিয়াই ধারণা জন্মে যে, হয়ত সে কিছু চাহিতে আসিয়াছে। ভাইগণ, অপরের ধন-দৌলত হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখা ও স্বাধীন মনোভাবের ব্যাপারে আলেমদের ধর্ম এরূপ হওয়া উচিত ঃ

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی
بے زر وگنج بصد حشمت قاروں باشی
در راہ منزل لیلی کہ خطر ہاست بجاں
شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

(আয় দিল আঁা বেহ্ কেহ্ খারাব আয মায় গুল গুঁবাশী
বে-যর ও গঞ্জ বাছদ হাশ্‌মতে কারুঁ বাশী
দর রাহে মন্‌যিলে লায়লা কে খতরহাস্ত বজাঁ
শর্তে আওয়াল কদম আঁনাস্ত কেহ্ মজনুঁ বাশী।

'হে মন! রঙ্গীন শরাব দ্বারা মাতাল হইয়া থাকাই তোমার জন্য উত্তম। তুমি ধন-দৌলত ছাড়াই কারুন হইতেও অধিক উচ্চ শানে অবস্থান কর। লায়লাকে লাভ করার গন্তব্য পথে প্রাণের অনেক ভয় আছে। এই পথে গমনের জন্য মজনূ হওয়া প্রথম শর্ত।

অর্থাৎ, ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উভয়টিকে আগুন লাগাইয়া ছারখার করিয়া দাও। যদি তোমরা ধনীদের দ্বারে ধর্না দেওয়া ত্যাগ কর, তবে তাহারা স্বয়ং তোমাদের দ্বারে আসিয়া মাথা ঝুকাইবে।

॥ সৎসংসর্গের প্রয়োজনীয়তা ॥

অতএব, লোভী লোকদের বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা পূর্ণ শিক্ষাকে ব্যাপক করিতে চাই না, তবে প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা অবশ্যই ব্যাপক হওয়া দরকার। পূর্ণ শিক্ষার একটি বিকল্প পন্থাও রহিয়াছে। তাহা হইল খোদা-প্রেমিক বুযুর্গদের সংসর্গ। ইহাও পূর্ণ শিক্ষার ন্যায় উপকারী ; বরং পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার পরও ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। বহু সংখ্যক ছাহাবী (রাঃ) মোটেই লেখা-পড়া জানিতেন না। তাসত্ত্বেও হুযূর (দঃ) তাঁহাদিগকে লইয়া গর্ববোধ করিতেন এবং বলিতেন, نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ 'আমরা নিরক্ষরের দল। আমরা লেখা-পড়া ও

হিসাব-কিতাব জানি না।' তবে ছাহাবীগণ হুযূর (দঃ)-এর সঙ্গ ও সাহচর্যে থাকিতেন। ইহাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পর্যন্ত ধর্মীয় দিক দিয়া সংসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

এখন আমি সামাজিক রীতি-নীতির দিক দিয়া সংসর্গের আবশ্যকতা ও সংসর্গ ব্যতীত পূর্ণ শিক্ষা লাভের অপকারিতা বর্ণনা করিব। সকলেই জানেন যে, সমস্ত মানুষের জীবনপদ্ধতি পূর্ণরূপে সরল এবং সামাজিকতা পূর্ণরূপে লৌকিকতা বর্জিত হইলেই—সংবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণরূপে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত অর্জিত হইতে পারে। কৃত্রিমতা ও ছলচাতুরী দ্বারা পূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা সম্ভব নহে। ইহাও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যে, পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার পর কোন বুযুর্গের দীক্ষা গ্রহণ না করিলে ছলচাতুরী ও প্রতারণার প্রবৃত্তি হইতে রেহাই পাওয়া যায় না। তেমনি কোন ব্যক্তি যদি মূর্খ হয় এবং দীক্ষা গ্রহণেও বিরত থাকে, তবে তাহার মধ্যেও এই ছলচাতুরীর প্রবৃত্তি দেখা দেয়। অথচ সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

সারকথা এই যে, সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জরুরী। ইহা সরলতা ব্যতীত পূর্ণরূপে শান্তির সহিত অর্জিত হইতে পারে না। আর বুযুর্গের দীক্ষা ব্যতীত সরলতা লাভ করা যায় না। প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম হাছেল না করিলে দীক্ষা গ্রহণও সম্ভবপর নহে। অতএব, দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম শিক্ষা করা জরুরী। সরলতার জন্য দীক্ষা গ্রহণ জরুরী এবং সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবন জরুরী। কাজেই সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম শিক্ষা করা জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল। তবে দীক্ষা ব্যতীত এল্‌ম চাতুরী সৃষ্টি করে এবং চাতুরী সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। এই কারণে দীক্ষা ব্যতীত পূর্ণ শিক্ষা ক্ষতিকর হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা অর্জন করিতে পারে না। এই কারণে প্রত্যেককেই পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া উপকারী তো নয়ই—বরং ক্ষতিকর।

ইহাতে অশিক্ষিত লোকরা এই ভাবিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে যে, আমাদের নিরক্ষরতাও এক পর্যায়ে বাঞ্ছিত হইয়া গেল। অতএব, লেখাপড়া না করিয়া আমরা ভালই করিয়াছি। তাহাদের এইরূপ আনন্দিত হওয়া সমীচীন নহে। কারণ, তাহাদের নিরক্ষরতা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা লেখাপড়া হইতে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সংসর্গ হইতেও বঞ্চিত। কাজেই এমন নিরক্ষরতা কিছুতেই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ণ শিক্ষার সাথে সাথে সংসর্গও লাভ করিতে হইবে। নতুবা শুধু সংসর্গ লাভ করিলেও চলিবে। কেননা, শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নহে; কিন্তু শুধু সংসর্গ যথেষ্ট। ইহার জন্য অবশ্য একটি শর্ত আছে। তাহা এই যে, যাহার

সংসর্গে বসিবে, তাহাকে শুধু পার্থিব কেচ্ছা-কাহিনীতেই আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না ; বরং অন্তরের সমস্ত রোগ কমবেশী না করিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। এরপর তিনি যেসব চিকিৎসা বলেন, তাহা পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে। আমি এমন কোন পূর্ণ আলেম দেখি নাই – যে বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করা ব্যতীতই হেদায়তের দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এমন বহু মূর্খ লোক দেখিয়াছি—যাহারা এল্ম বলিতে ش (শীন) ও ق (কাফ) ভালরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না ; অথচ দিব্যি দ্বীনের খেদমত করিয়া যাইতেছে। অতএব, শুধু এল্ম শয়তান ও বালআম বাউরার এল্মের ন্যায়।

॥ শিক্ষা ও দীক্ষার উপায় ॥

তবুও সকলের কেন্দ্র হিসাবে একটি দল থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সকলেই পূর্ণ আলেম না হইয়া কিছু সংখ্যক লোককে পূর্ণ আলেম হইতে হইবে। ফলে সকলেই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানিয়া লইতে পারিবে। সারকথা এই যে, প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে একদল আলেম থাকা জরুরী। দ্বিতীয়তঃ, আমল করার জন্য যতটুকু এল্ম থাকা দরকার, প্রত্যেককেই সেই পরিমাণ এল্ম হাছিল করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেককেই কোন খোদা প্রেমিক বুযুর্গের সংসর্গ লাভ করিতে হইবে।

এখন আমি ইহাদের প্রত্যেকটির উপায় বলিতেছি। প্রথমোক্ত বিষয়ের উপায় এই যে, মুসলমানদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক মেধাবী ও ধীর স্বভাব বালক বাছাই করিতে হইবে। এরপর প্রত্যেক শহরে একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উহাতে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। উদাহরণতঃ এই বস্তীতেই একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উহাতে শরহে বেকায়া ও নূরুল আনওয়ার পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হউক। এরপর পাঠ সমাপ্ত করার জন্য তাহাদিগকে কোন বড় মাদ্রাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। এই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। বিশেষ করিরা এক্ষেত্রে ধনীদের দায়িত্ব বেশী। কেননা, খোদা তা'আলা তাহাদিগকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছেন। প্রত্যেক শহরে যেসব ছোট ছোট মাদ্রাসা স্থাপিত হইবে, উহাদিগকে কোন বড় মাদ্রাসার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে—যাহাতে তথাকার সনদ (সার্টিফিকেট) তাহাদের জ্ঞানবত্তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে পারে। এই মাদ্রাসাটি ছোট ছোট মাদ্রাসার জন্য 'দারুল উলূম' (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ন্যায় হইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিলে এইসব আলেমের ফতওয়া ও শিক্ষা পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবে। যাহারা ওয়ায করিতে আসে তাহাদের সম্বন্ধেও জানিয়া লওয়া ভাল যে, তাহারা কোন মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত কি না। কেননা, আজকালকার ওয়ায়েযদের দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী হয়।

আমি দেওবন্দে জনৈক ওয়ায়েযকে ওয়ায করিতে শুনিয়াছি। প্রথমে সে এই আয়াতখানি পাঠ করে—ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ‘ইহা তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জান।’ এরপর সে আয়াতের এইরূপ অনুবাদ করিল—তালা লাগাইয়া জুমুআর নামাযে যাওয়া তোমাদের জন্য উত্তম। تَعْلَمُوْنَ হইতে এই অনিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ, تا لا مو ند (তালা বন্ধ কর)। তখন মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মাওলানা রফীউদ্দীন ছাহেব জীবিত ছিলেন। তিনি ওয়ায়েয ছাহেবকে খুব তিরস্কার করিলেন।

অপর একজন ওয়ায়েয কানপুরের মাদ্রাসা ‘জামেউল উলূমে’ ওয়ায করিয়াছিল; সে এই আয়াতটি পাঠ করিল—وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ‘যে ব্যক্তি খোদার সম্মুখে (অপরাধীর ন্যায়) দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে, তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে।’ অতঃপর ইহার এইরূপ তরজমা করিল—জান্নাতে একটি সিংহাসন থাকিবে। উহার এক একটি পায়া এক এক হাজার ক্রোশ দীর্ঘ হইবে। মজার ব্যাপার এই যে, সে ক্রোশের ব্যাখ্যাও পেশ করিল। অর্থাৎ, বড় ক্রোশ (দুই মাইলের)। আমি আরও কতিপয় ওয়ায়েয দেখিয়াছি; তাহারা ওয়ায করিয়া বেড়ায়। অথচ বড়দের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহারা শরাবও পান করে।

আজকাল অনুসৃত হওয়া এত সহজ ব্যাপার যে, যাহার মনে চায়, সে-ই অনুসৃত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, মানুষ কোন বড় স্থান ও কেন্দ্রীয় দলের সহিত সংযুক্ত নহে। ফলে সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই কোন একটি বড় স্থান ও কেন্দ্রীয় দলের সহিত সকলেরই সংযুক্ত হওয়া খুবই জরূরী। তাহারা যে কোন কাজ করিতে চায়, ঐ দলের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীত আলেমদের দল গঠিত হইতে পারে না। এই কারণে ইহার প্রচেষ্টা চালানো নেহায়েৎ জরূরী। এই কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে মৌলবীদের হাতে ন্যস্ত করিবেন না। কেননা, ইহাতে কতক কাজ এমনও আছে, যাহা মৌলবীরা করিতে পারিবে না—তাহাদের জন্য ইহা সমীচীনও নহে।

উদাহণতঃ, মাদ্রাসা কায়েম করার জন্য চাঁদা আদায় করার প্রয়োজন হইবে। অথচ চাঁদা আদায়ের কাজে অংশ গ্রহণ করা আলেমদের জন্য সমীচীন নহে। ইহাতে একটি বড় অনিষ্ট আছে। সাধারণ লোক তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করে যে, আমাদের ছেলেদিগকে মাদ্রাসায় পড়াইলে তাহারাও ভিক্ষার কাজ করিবে। অতএব, মৌলবীরা শুধু পড়াইবার কাজে মশ্‌গুল থাকিবে আর ধনীরা চাঁদা আদায় করিবে। কারণ, নিজেরা খাইয়া ফেলিবে বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। তাছাড়া মৌলবীরা যখন লেখাপড়ার কাজ করে, তখন উপার্জনের কাজটিও তাহাদের

ঘাড়ে কেন চাপানো হইবে ? আজকাল জনসাধারণ মৌলবীদিগকে ভাঁড়ের হাতী মনে করে।

কথিত আছে, বাদশাহ্ আকবর খুশী হইয়া জনৈক ভাঁড়কে একটি হাতী দিয়াছিলেন। হাতী লওয়ার পর ভাঁড়ের চিন্তা হইল যে, আমি দরিদ্র লোক ; এই হাতীকে খাওয়াইব কোথা হইতে ? ইহাকে খোরাক দিতে আমার সথাসর্বস্ব নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় সে জানিতে পারিল যে, আজ বাদশাহ্র সওয়ারী অমুক সময়ে অমুক স্থান দিয়া যাইবে। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সে হাতীর গলায় একটি ঢোল বাঁধিয়া বাদশাহ্র গমনের পথের দিকে ছাড়িয়া দিল। বাদশাহ্র সওয়ারী আগমন করিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গলায় ঢোল বাঁধা অবস্থায় একটি হাতী এদিকেই আসিতেছে। ভালরূপে দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা শাহী সওয়ারী হাতী। বাদশাহ্ উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হাতীটি এইভাবে ঘুরাফিরা করিতেছে কেন ? উত্তর হইল, হুযুর হাতীটি ভাঁড়কে দিয়াছিলেন। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ ভাঁড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাতীটি এইভাবে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন ? ভাঁড় বলিল, হুযূর আপনি আমাকে হাতী দিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু ইহার পানাহারের জন্য আমার কাছে কি আছে ? অবশেষে মনে করিলাম যে, আমার যা পেশা, তাহা হাতীটিকেও শিখাইয়া দেই। এই জন্য তাহার গলায় ঢোল বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি যে, যাও—ভিক্ষা কর আর খাও। এই রসাত্মক উত্তর আকবরের খুবই পছন্দ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরস্কার স্বরূপ ভাঁড়কে একটি গ্রাম দান করিয়া দিলেন।

মানুষ মৌলবীদের উপরও তেমনি সব বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, মাদ্রাসায়ও পড়াও এবং ভিক্ষা করিয়াও খাও। বন্ধুগণ, তাহাদের এত ঠেকা আছে ? খোদা তা'আলা তাঁহাদিগকে এলমের দৌলত দান করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা ভিক্ষা করিবে কোন্ দুঃখে ? আমি মৌলবীদিগকেও বলিতেছি—আপনারা পুরাপুরি খোদা তা'আলার উপর ভরসা করুন। মৌলবীদের ভিক্ষা করায় একটি বড় অনিষ্ট আছে। তাহা এই যে, মানুষ তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলিবে—তাহারা অন্যকে দান করিতে বলে ; কিন্তু নিজে কখনও দান করে না। (১) যে প্রস্তাবক নিজে দান করে না, তাহার প্রস্তাবে নানা সন্দেহ মাথাচাড়া

---

(১) আসলে এই আপত্তি একেবারেই অবান্তর। কারণ, প্রথমতঃ চাঁদা দেওয়ার মত আর্থিক পুঁজিই মৌলবীদের নাই। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজি না থাকা সত্ত্বেও তাহারা চাঁদা হিসাবে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া থাকে। এধরণের বহু নযীর বিদ্যমান আছে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ,হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী ছাহেবকেই ধরুন। তিনি কানপুর মাদ্রাসায় অবস্থান কালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু মাদ্রাসার আয়ের*

সূচী-পত্র

দিয়া উঠে। পক্ষান্তরে ধনী ব্যক্তিরা অন্যের নিকট পঞ্চাশ টাকা চাহিলে নিজেও কমপক্ষে বিশ টাকা দান করিবে। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার অবকাশ থাকে না। এই হইল কাজ করার পদ্ধতি। এইভাবে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া নেহায়েত জরুরী। বিশেষতঃ এই শহরে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া দরকার। কারণ, ধর্মের প্রতি এই শহরের অধিবাসীদের আগ্রহ খুবই কম। তাহারা নিরেট দুনিয়ার কাজ-কর্মেই ডুবিয়া আছে। আলেমদের সংসর্গ কম থাকাও ইহার একটি বড় কারণ। আলেমদের সংসর্গ লাভ করার উপায় এই যে, স্বয়ং আলেমদিগকে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের ফায়েয হাছিল কর। আলেমগণ সূর্যের ন্যায়। সূর্য উদিত হইতেই অর্ধেক ভূ-পৃষ্ঠ আলোকিত হইয়া যায় এবং অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যায়। তবে দ্বীনদার আলেম হওয়া শর্ত। তোমাদের অনুসারী হইয়া গেলে চলিবে না। তাহার মধ্যে এইরূপ গুণ থাকা দরকার— لَا يَخَافُوْنَ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ 'তাহারা খোদা তা'আলার কাজে কোন বিদ্রূপকারীর বিদ্রূপকে ভয় করে না।'

এই আলেমের জন্য মাসিক কমপক্ষে ২০।২৫ টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আজকাল মানুষ এক দিকে আলেম খুব বড় চায়, কিন্তু অপরদিকে মাসিক দশ-বার টাকার বেশী দিতে চায় না।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি একজন আলেম চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল। পত্রে প্রার্থিত আলেমের জন্য বহু শর্ত লিখিত ছিল কিন্তু বেতন মাত্র দশ টাকা লিখা ছিল। ইহাতে মাওলানা বলিলেন,

---

• স্বল্পতা দেখিয়া সম্পূর্ণ বেতন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মাদ্রাসা মাযাহেরুল উলূম সাহারান পুরের প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা খলীল আহ্‌মদ ছাহেব মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন পাইতেন। একবার মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করার জন্য খুবই চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মাওলানা ছাহেব পরিষ্কার অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, আমার জন্য এই চল্লিশ টাকাই যথেষ্ট। তৃতীয়তঃ, দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মৌলবী মাহ্‌মুদ হাসান ছাহেব মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাইতেন। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আরও বেশী বেতন দিতে চাহিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন না। চতুর্থতঃ সাহারান পুর মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মাওলানা মৌলবী এনায়েত ইলাহী ছাহেবের বেতন পনর টাকা। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এরচেয়ে বেশী বেতন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। আমার মনে হয়, স্বেচ্ছায় আপন উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা নিজের সম্পূর্ণ বেতন বেতন বিভাগের হাতে সমর্পণ করার ন্যায় এহেন আত্মত্যাগ আজকাল দুনিয়াদারদের মধ্যে কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই সাহায্য কোন কোন দিক দিয়া প্রচলিত চাঁদা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান সন্দেহ নাই। এ ধরণের বহু উদাহরণ আলেমদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। —সাঈদ

—আরে ভাল মানুষের দল, প্রতি গুণ পিছে অন্ততঃ এক টাকা তো রাখা উচিত ছিল।

বন্ধুগণ খোদার শোক্‌র যে, তিনি আপনাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় একজন মৌলবীর জন্য মাসে দশ-পনর টাকার ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এদিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই সবকিছু হইতে পারে। এ পর্যন্ত আলেমদের স্থায়িত্বের উপায় বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ আমল করার উপায় এই যে, মাদ্রাসার আলেমদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল, হালাল-হারাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করিতে হইবে। মাদ্রাসার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন আলেমকে ওয়ায করার জন্য কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া লন। সে মহল্লায় মহল্লায় যাইয়া ওয়াযের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি উৎসাহ দান, খোদার গযব হইতে ভীতি প্রদর্শন এবং শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করিবে। আপনারা এই উপায়ে কাজ করিয়া দেখুন। খোদা চাহে তো এক বৎসরের মধ্যেই অবস্থা অনেকটা সংশোধিত হইয়া যাইবে।

তাছাড়া আরও একটি কাজ করিতে পারেন। প্রত্যেক মহল্লার লোকদিগকে সপ্তাহে একবার একস্থানে একত্রিত করিয়া এক ব্যক্তি মাসআলার কিতাব লইয়া তাহাদিগকে মাসআলা-মাসায়েল শুনাইয়া দেন। যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারা মাসআলার কিতাবাদি কিনিয়া কাছে রাখিবে এবং প্রত্যহ পড়িবে। কোন বিষয় সন্দেহ থাকিলে তাহা আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে। মোটকথা, সারাজীবনই এরূপ করিতে হইবে। মহিলাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা কিতাব কিনিয়া দৈনন্দিন পাঠ হিসাবে পড়িয়া লইবে। আর যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা শিক্ষিতদের নিকট হইতে শুনিয়া লইবে।

॥ সৎসংসর্গের উপকারিতা ॥

তৃতীয় জিনিস হইল সৎসংসর্গ। ইহা ব্যতীত উচ্চশিক্ষা ও নিম্নশিক্ষা কোনটিই যথেষ্ট নহে। এই কারণেই আলেম ও ছাত্র সকলের পক্ষেই ইহার জন্য সচেষ্ট হওয়া জরুরী। আগেকার যুগে সকল লোকাই সৎ ছিল। বলাবাহুল্য সংসর্গের প্রতি যত্নশীল হওয়াই ইহার বড় কারণ ছিল। আজকাল শিক্ষার প্রতি অবশ্য অল্পবিস্তর দৃষ্টি আছে। হাজার হাজার টাকা এই খাতে ব্যয় করা হয় এবং এজন্য যথেষ্ট সময়ও দেওয়া হয়। কিন্তু সংসর্গের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একটি মাসও কেহ ব্যয় করে না। খোদার কসম, সংসর্গের প্রতি সামান্যও মনোযোগ নিবিষ্ট করিলে মুসলমানগণ যাবতীয় ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যাইত। এ বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিলে সে পরীক্ষা করিয়া দেখুক। সে নিজে এবং সন্তান-সন্ততিকেই বুযুর্গদের সংসর্গে রাখুক।

ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমি পাঁচ বৎসর পরই বিরাট পরিবর্তন দেখাইয়া দিতে পারিব। সকলেরই কথাবার্তা ও কাজকর্ম অভাবনীয়রূপে সংশোধিত হইয়া যাইবে। এইভাবে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার ব্যাপক হইয়া গেলে অবস্থা এইরূপ পরিগ্রহ করিবে :

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد + کسے را باکسے کارے نباشد

(বেহেশ্‌ত আঁজা কেহ্‌ আযারে নাবাশাদ + কাসেরা বাকাসে কারে নাবাশাদ)

'যেখানে দুঃখ-কষ্ট নাই এবং কেহ অপরকে কষ্ট দেয় না তাহাই বেহেশ্‌ত। এইভাবে দুনিয়া জান্নাত সদৃশ হইয়া যাইবে। কারণ, এল্‌ম দ্বারা নেক বিষয়াদি জানা যাইবে এবং সংসর্গ দ্বারা চরিত্র কলুষমুক্ত হইবে। বলিতে কি, এই অজ্ঞানতা ও অসচ্চরিত্রতাই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উদাহরণতঃ, কাহারও মধ্যে অহঙ্কার থাকিলে সে যদি ভুলও করে, তবে তাহার অহঙ্কার তাহাকে ভুল স্বীকার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করার অনুমতি দিবে না ; বরং এরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি ভুলকেই আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে আঁক্‌ড়াইয়া থাকিবে। ফলে এই ভুলের কারণে হাজার হাজার লোক গোমরাহ্‌ হইবে। পক্ষান্তরে অহঙ্কার সংশোধিত হইয়া গেলে এই অবস্থা দেখা দিবে না। তখন প্রত্যেক ভুলকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবে।

একটি শোনা ঘটনা। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ) একবার মীরাট শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এশার সময় সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়া দিলেন। প্রশ্নকারী চলিয়া গেলে জনৈক শাগরেদ আসিয়া আরয করিল, এই মাসআলাটি আমার এইরূপ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিতেছ। এরপর তিনি অস্থির হইয়া প্রশ্নকারীকে খুঁজিতে লাগিলেন। সকলেই বলিল, এখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সকাল হইলে আমরা প্রশ্নকারীকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিব। কিন্তু হযরত মাওলানা ইহাতে রাযী হইলেন না। তিনি প্রশ্নকারীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, তখন আমি তোমাকে ভুল মাসআলা বলিয়াছিলাম। তোমার চলিয়া আসার পর এক ব্যক্তি আমাকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিয়াছে। তাহা এইরূপ। এই পর্যন্ত বলার পর হযরত মাওলানা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, এই অস্থিরতা কি শুধু শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ছিল ? কখনই নহে। ইহা হালের প্রতিক্রিয়া ছিল এবং হাল সৎসংসর্গের বদৌলতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাই কবি বলেন :

قال را بگزار مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو

(ক্বালরা বগ্‌যার মর্‌দে হাল শো + পেশে মর্‌দে কামেলে পামাল শো)

'কথার বাহাদুরী ত্যাগ কর এবং হাল অর্জন কর। কোন কামেল পুরুষের সম্মুখে নিজকে বিলীন করিয়া দাও।' দীক্ষা ব্যতীতই যাহারা অনুসৃত হইয়া যায়, তাহাদের চরিত্র যারপরনাই খারাপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ছোট হওয়ার পূর্বেই বড় হইয়া যায়। কেহ চমৎকার বলিয়াছে ঃ

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی + تا راہ بیں نباشی کہ راہبر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق + ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

(আয় বেখবর বকুশ কেহ্ ছাহেবে খবর শভী + তা রাহ্‌বী না বাশী কেহ্ রাহবর শভী
দর মক্তবে হাকায়েক পেশেআদীবে এশক + হাঁ আয় পেসার বকুশ কেহ্ রোযে পেদারশভী)

'হে বেখবর, চেষ্টা কর—অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। যে পর্যন্ত নিজে রাস্তা সম্বন্ধে পরিচয় লাভ না কর, সেই পর্যন্ত অপরকে রাস্তা দেখাইবে কিরূপে? হকীকতের পাঠশালায় এশ্‌কবিদের সম্মুখে অধ্যয়ন কর। বৎস, চেষ্টা কর যাহাতে এক দিন পিতা হইতে পার।'

পুত্র হওয়ার পূর্বেই পিতা হইয়া যাওয়া বহুবিধ অনিষ্টের কারণ বটে। এই কারণে প্রথমে ছোট হইয়া চরিত্র সংশোধন করা নেহায়েৎ জরুরী। ইহাতে আমল সংশোধিত হইবে। এখন ইহার উপায় বলিতেছি। খোদা তা'আলা যাহাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করিরাছেন, তাহাদিগকে কোন বুযুর্গের খেদমতে কমপক্ষে ছয় মাস থাকিতে হইবে। এই সময়ে নিজের সমস্ত আভ্যন্তরীণ দোষ-গুণ তাঁহার সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আ'মল করিতে হইবে। তিনি যিকির করিতে বলিলে যিকিরে মশ্‌গুল হইতে হইবে। যদি যিকির করিতে নিষেধ করেন এবং অন্য কোন কাজ করিতে বলেন, তবে উহাই করিতে হইবে। তাঁহার প্রতি মহব্বত বাড়াইতে হইবে। তাঁহার প্রত্যেকটি উঠা-বসা লক্ষ্য করিবে। কোন জিনিস দেওয়া বা লওয়ার সময় তিনি কি করেন, তাহাও লক্ষ্য রাখিবে। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া যাইবে। এরপর তাহার দ্বারা মানুষের উপকারই হইবে—অপকার হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাহারা মাঝে মাঝে দুই-চারি দিনের অবসর পাইলেই কোন বুযুর্গের নিকট থাকিয়া আসিবে।

॥ সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব ॥

প্রত্যেক কাজের জন্য যেমন সময় তালিকা থাকে, তেমনি আপন সন্তান-সন্ততির জন্য প্রত্যহ একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দাও। আর বলিয়া দাও যে, প্রত্যহ এই সময়ে অমুক মসজিদের অমুক বুযুর্গের নিকট যাইয়া কিছুক্ষণ বসিবে। বন্ধুগণ, পরিতাপের বিষয় যে, ফুটবল খেলার জন্য সময় পাওয়া যায়; কিন্তু চরিত্র সংশোধনের জন্য সময়ে

কুলাইয়া উঠে না। এই শহরে এমন কোন বুযুর্গ না থাকিলে ছুটির দিনে ছেলেদিগকে কোন বুযুর্গের খেদমতে পাঠাইয়া দাও। আজকাল ছেলেদের যিম্মায় কোন কাজ-কর্মও থাকে না। হতভাগারা রাত-দিন কেবল টোঁটোঁ করিয়া ফিরে। নামায-রোযার ধারে কাছেও যায় না। পিতামাতারা নিজেরা নামায পড়ে ভাবিয়াই আনন্দে বিভোর। অথচ তাহারা জানে না যে, কিয়ামতের দিন সন্তান-সন্ততির কারণে তাহাদিগকে জাহান্নামে যাইতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমারা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।'

কসাই যেমন গরু লালন-পালন করে, আজকাল মানুষ সন্তান-সন্ততিরও তেমনি লালন-পালন করে। কসাই গরুকে খুব খাওয়ায় দাওয়ায়। ফলে গরু খুব মোটাতাজা হয়। কিন্তু পরিণামে তাহার গলায় ছুরি চালাইয়া দেওয়া হয়। তেমনি মানুষ সন্তান-সন্ততিকে খুব সাজগোজ ও আরাম-আয়েশে লালন পালন করে ; কিন্তু পরিণামে ইহারা জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হয়। শুধু ইহা নহে ; বরং এদের কারণে মুরব্বীদেরও খুব খবর লওয়া হয়। কারণ, মুরব্বীদের প্রদত্ত আরাম-আয়েশে পড়িয়া সন্তানরা নামায-রোযা হইতে একেবারেই গাফেল হইয়া যায়। কোন কোন অর্বাচীন এত সীমা ছাড়াইয়া যায় যে, ইসলামের কোন বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের কোন জ্ঞান থাকে না।

আমি জনৈক যুবকের একটি ঘটনা শুনিয়াছি। সে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছিল। তাহার পিতা জনৈক বন্ধুর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিল যে, আমার ছেলে লণ্ডন হইতে দেশে ফিরিতেছে। তোমাদের শহর হইয়া সে আসিবে। ষ্টেশনে তাহার সহিত দেখা করিও—যাহাতে তাহার কোনরূপ কষ্ট না হয়। বন্ধুর পত্র পাইয়া এই ব্যক্তি ষ্টেশনে গেল এবং ব্যারিষ্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যারিষ্টার সাহেব তখন খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন। তখন রমযান মাস ছিল। এই জন্য সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তো রমযানের দিন, আপনি রোযা রাখেন নাই কি ? ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, রমযান কি বস্তু ? সে উত্তরে বলিল, রমযান একটি মাসের নাম। ব্যারিষ্টার বলিলেন, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী —কই এগুলির মধ্যে রমযান নামে কোন মাস নাই তো ? ব্যারিষ্টারের এই অজ্ঞতা দেখিয়া লোকটি মনে মনে খুবই দুঃখিত হইল এবং ভাবিল, এতো আসল কুফরের উৎস হইতেই বিকৃত, এর পরিবর্তন আশা করা যায় না। এরপর সে 'ইন্না লিল্লাহ্' পাঠ করিয়া চলিয়া আসিল।

এখন চিন্তা করুন—এরা মুসলমানের বাচ্চা। মুসলমান মহিলাদের কোলে ইহাদিগকে লালন-পালন করিয়া এখন জাহান্নামের কোলে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বন্ধুগণ! এই ধারা অপরিবর্তিত থাকিলে পঞ্চাশ বৎসর পর হয়তো এরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেই লজ্জাবোধ করিবে। এখনও ইহার কিছু প্রতিক্রিয়া যে দেখা দেয় নাই; তাহা নহে। এখন তাহারা ইসলামী নাম পছন্দ করে না। ছেলেকে বি, এ পাশ করাইয়াছেন, এম, এ পাশ করাইয়াছেন—এই ভাবিয়া আপনি আনন্দিত। প্রকৃত পক্ষে আপনি ছেলেকে জাহান্নামের সরু পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার চোখের উপর এমন চোখবন্ধ পরাইয়াছেন যে, জান্নাতের রাজপথ তাহার দৃষ্টিতেই পড়িতে পারে না।

বন্ধুগণ, আপনারা বলেন যে, মৌলবীরা ইংরেজী পড়িতে নিষেধ করে। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা নিষেধ করি না; তবে আমরা ছেলেদের ধর্ম নষ্ট করিতে নিষেধ করি। ধর্ম নষ্ট না করার উপায় হইল, তাহাদিগকে বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করার সুযোগ দেওয়া। এইভাবে তাহারা ছয় মাস দোযখে যাওয়ার কাজ করিলে ছয় মাস জান্নাতে যাওয়ার কাজও করিতে পারিবে। মনে রাখা দরকার, বুযুর্গদের সংসর্গ এমন অব্যর্থ মহৌষধ যে,

گر تو سنگ خارہ و مر مر شوی + چوں بصاحب دل رسی گوهر شوی

(গর তূ সঙ্গে খারা ও মরমর শভী + চুঁ বছাহেব দিল রসী গাওহার শভী)

‘তুমি মর্মরের ন্যায় কঠিন পাথর হইলেও যদি বুযুর্গের খেদমতে পৌঁছ, তবে মুল্যবান রত্ন হইয়া যাইতে পারিবে।’ কবি আরও বলেন ঃ

یک زمانہ صحبت با اولیاء + بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

صحبت نیکاں اگر یک ساعت است + بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

(এক জমানা ছোহ্‌বতে বা আওলিয়া + বেহ্‌তর আয ছদ সালা ত্বাআত বেরীয়া ছোহ্‌বতে নেকাঁ আগর এক ছাআতাস্ত + বেহ্‌তর আয ছদসালা যোহ্‌দ ও ত্বাআতাস্ত)

“ওলীদের সংসর্গে কিছুক্ষণ থাকা একশত বৎসরের রিয়াহীন এবাদত হইতেও উত্তম। নেক লোকদের সংসর্গে অল্পক্ষণ থাকাও এক শত বৎসরের দরবেশী ও এবাদত হইতে উত্তম।”

॥ দ্বীনের রূহ ॥

বন্ধুগণ, সংসর্গের বদৌলতে ইসলাম অন্তরে ঘর করিয়া লইবে। বলিতে কি, ধর্মের মাহাত্ম্য অন্তরে ঘর করিয়া লওয়াই দ্বীনের রূহ্, যদিও কোন সময় নামায রোযার ত্রুটি হইয়া যায়। এই কথাটি অবশ্য আমার মুখে বলিবার নহে। কারণ, ইহাতে কেহ নামায রোযাকে হাল্‌কা মনে করিতে পারে। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য

গোপন নহে। মোট কথা, অন্তরে ধর্মের ঘর করিয়া লওয়া জরুরী। অন্তরের অবস্থা এরূপ না হইলে বাহ্যিক নামায রোযায় কোন কাজ হইবে না ; বরং ইহা তোতা পাখীকে সূরা শিখাইয়া দেওয়ার ন্যায় হইবে। সূরা শুধু তোতা পাখীর মুখেই থাকিবে। জনৈক কবি তোতা পাখীর মৃত্যু-তারিখ লিখিতে যাইয়া বলেন :

میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے + رات دن ذکر حق رٹا کرتے
گربہ موت نے جو آدابا + کچھ نہ بولے سوائے ٹے ٹے

'খোদার যিকিরকারী আদরের তোতা রাত দিন কেবল যিকিরই করিত। মৃত্যুর বিড়াল যখন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, তখন টে, টে, টে ছাড়া আর কিছুই বলিল না।' এই কবিতা হইতে ১২৩০ হিঃ মৃত্যুর তারিখ বাহির হয়। এই তারিখটি যদিও রসিকতার পর্যায়ভুক্ত ; কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝা যায়, কবি ইহাতে একটি জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ, কবি বলিয়াছেন যে, যে শিক্ষার ফলে অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, বিপদের সময় তাহা কোন কাজে আসে না। অতএব, অন্তরে ধর্মের মহব্বত ঘর করিতে না পারিলে কোরআনের হাফেয হইলেও মৃত্যুর সময় মনে আটা ও ডাইলের দর লইয়াই মরিবে। আজকাল মানুষের অন্তর হইতে ইসলামের প্রতিক্রিয়া হ্রাস পাইতেছে। আজকাল অবস্থাটিই প্রবল। বন্ধুগণ, এই অবস্থাটি দেখিয়া আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, মুসলমানদের নিকট হইতে ইসলাম বিদায় লইয়া যাইতেছে। খোদার দোহাই, আপন সন্তানদের প্রতি রহম করুন এবং তাহাদিগকে ইসলামের সোজা পথে চালান।

॥ কামেল বুযুর্গের লক্ষণ ॥

এখন একটি জরুরী বিষয় বর্ণনা করিয়া আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। তাহা এই যে, সংসর্গের জন্য কিরূপ ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইবে এবং তিনি যে বুযুর্গ, ইহার লক্ষণ কি কি ? বুযুর্গ ব্যক্তির লক্ষণ নিম্নরূপ—প্রথমতঃ, তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌মে-দ্বীন সম্পর্কে অবগত থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, শরীয়তের নির্দেশ পুরাপুরি পালন করিবেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মধ্যে অজানা বিষয় আলেমদের নিকট জানিয়া লওয়ার গুণ থাকিবে। চতুর্থতঃ, তিনি আলেমদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন না। পঞ্চমতঃ, তিনি মুরীদ ও ভক্তদিগকে নিজ নিজ অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিবেন না ; বরং শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা-নিষেধের অভ্যাসও তাঁহার মধ্যে থাকিবে। ষষ্ঠতঃ, তাঁহার সংসর্গে বরকত থাকিবে। অর্থাৎ, তাঁহার নিকটে বসিলে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাইবে। সপ্তমতঃ, তাঁহার প্রতি নেক ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকগণ বেশী আকৃষ্ট হইবেন।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি যাহার মধ্যে পাওয়া যায়, তিনি মকবূল ও কামেল। তাঁহার নিকট যান এবং তাঁহার সংসর্গে উপকৃত হউন। তাঁহার কাছে মুরীদ হওয়ার

কোন প্রয়োজন নাই। কারণ পীরী-মুরীদীর বাহ্যিকরূপ উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার আসল স্বরূপই উদ্দেশ্য। উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আসল স্বরূপ। আজকাল পীরী-মুরীদী শুধু একটি প্রথা হিসাবে প্রচলিত আছে। যেমন পুরুষত্বহীন হইলেও মানুষ প্রথা হিসাবে বিবাহ করে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মুরীদও হইয়া থাকে। তবে অন্তরে খুব বেশী আগ্রহ দেখা দিলে মুরীদ হওয়ায় ক্ষতি নাই। হাঁ, মুরীদ হওয়ার জন্য খুব ভালরূপে যাচাই করিয়া লওয়া জরুরী—যে কোন ব্যক্তির হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে। এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত সাতটি লক্ষণও অবশ্যই দেখিয়া লওয়া দরকার। মাওলানা রূমী এগুলিকে দুইটি মাত্র শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

کار مرداں روشنی وگرمی ست + کار دوناں حیله وبے شرمی ست

(কারে মরদাঁ রৌশনী ও গরমী আস্ত+কারে দুনাঁ হীলা ও বেশরমী আস্ত)

"আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করা কামেল ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভব এবং চাতুরী ও নির্লজ্জতা করা নিচাশয় লোকের কাজ।" তিনি অন্যত্র বলেন:

اے بسا ابلیس آدم روئے هست + پس بهر دستے نبايد داد دست

(আয় বসা ইব্‌লীস আদম রুয়ে হাস্ত + পস বহার দস্তে নাবায়াদ দাদ দস্ত)

'মানুষের আকৃতিধারী অনেক ইব্‌লীস শয়তান রহিয়াছে। কাজেই যে কোন ব্যক্তির হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।'

॥ সৎসংসর্গের আদব ॥

অবশ্য সংসর্গের কয়েকটি আদব আছে। এগুলি ছাড়া সংসর্গ উপকারী নহে। তন্মধ্যে একটি এই যে, বুযুর্গের খেদমতে যাইয়া দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবেন না। অধিকাংশ লোক বুযুর্গের দরবারে পৌঁছিয়াও সারা দুনিয়ার কেচ্ছা-কাহিনী, পত্র পত্রিকার ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে।

তাছাড়া বুযুর্গদিগকে তাবিযাদির ব্যাপারেও সাধ্যমত বিরক্ত না করা উচিত। তাঁহাদের নিকট হইতে তাবিয লওয়া স্বর্ণকারের নিকট নিড়ানি ও কুঠার বানাইবার অর্ডার দেওয়ার ন্যায়। কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা এই যে, যাহার হাতে হাত দেওয়া হয়, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলার আত্মীয় হইয়া যান। তাঁহাকে যাহাই বলা যায়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করিয়া তাহাই করাইয়া লইতে পারেন। অথচ বুযুর্গদিগকে এরূপ ক্ষমতাশালী জ্ঞান করা তৌহীদের পরিপন্থী। আসলে খোদার দরবারে নিবেদন করা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কিছুর বিন্দুমাত্রও সাধ্য নাই।

মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেবের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমার একটি মোকদ্দমা আছে। মাওলানা বলিলেন, আচ্ছা দোআ করিব। আগন্তুক বলিল,

আমি দোআ করাইতে আসি নাই। দোআ আমিও করিতে পারি। আপনি বলিয়া দিন যে, তোমার এ কাজ পুরা করিয়া দিলাম। ইহাতে মাওলানা খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন।

পেলীভিতের জনৈক বুযুর্গের নিকট এক বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া কিছু আরয করিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করুন। বৃদ্ধা এই কথা শুনিতে পাইল না। অপর এক ব্যক্তি বৃদ্ধার কানের কাছে যাইয়া বলিল, হুযুর বলিতেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিবেন। ইহা শুনা মাত্রই বুযুর্গ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ মেহেরবানী করিবেন কি না, তাহা আমি কি জানি? তুমি নিজের তরফ হইতে 'বেন' বাড়াইয়া দিলে কিরূপে? তদ্রূপ তাবিযের ফরমায়েশও বুযুর্গদের রুচি-বিরুদ্ধ। যিনি সারাজীবন ছাত্র রহিয়াছেন এবং আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়াছেন, তিনি তাবিয ও তাবিয লিখার বিষয় কি জানিতে পারেন? তদুপরি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাবিযও অদ্ভুত অদ্ভুত কাজের জন্য চাওয়া হয়।

বোম্বাই হইতে জনৈক কুস্তিগীরের চিঠি আসিয়াছে: সে লিখিয়াছে, আমাকে কুস্তি লড়িতে হইবে। একটি তাবিয লিখিয়া দিন যাহাতে আমি জয়লাভ করিতে পারি। আমি উত্তরে লিখিলাম, তোমার প্রতিপক্ষও যদি কাহারও নিকট হইতে তাবিয লিখাইয়া লয়, তবে কি হইবে? তাবিযে তাবিযে কুস্তি হইবে? কিছু দিনের মধ্যে মানুষ হয় তো পুরুষের গর্ভ হইতে সন্তান হওয়ার জন্যও তাবিয লিখাইতে চাহিবে। ইহাতে বিবাহ করারই দরকার হইবে না। কেননা, তাবিয যখন প্রত্যেক কাজেই লাগে, তখন পুরুষের সন্তান হওয়ার মধ্যেও লাগিবে। বন্ধুগণ, বুযুর্গদের নিকট শুধু আল্লাহ্‌র নাম জিজ্ঞাসা করার জন্য যাইবেন। এই বক্তব্যের সারকথা এই যে, আপন সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌ওয়ালাদের দীর্ঘ সংসর্গ লাভের ব্যবস্থা করুন। এই উপায়টি পুরুষ ও সুস্থ লোকদের জন্য বলা হইল।

॥ সৎসংসর্গের বিকল্প পন্থা ॥

মহিলা কিংবা বিকলাঙ্গ পুরুষদের জন্য সংসর্গের বিকল্প পন্থা এই যে, তাহারা বুযুর্গদের অমিয় বাণীসমূহ পাঠ করিবে কিংবা শুনিবে। বুযুর্গদের তাওয়াক্কুল, ছবর ও শোকর এবং তাক্‌ওয়ার গল্প শুনিলেই তাহারা সংসর্গের উপকার লাভ করিতে পারিবে। সংসর্গ সম্বন্ধে কোন একজন কবি বলিয়াছেন।

مقام امن و مے بیغش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زہے توفیق

(মাকামে আমন ও মায় বেগাশ ও রফীকে শফীক
গারাত মুদাম মায়াস্‌সার শাওয়াদ যেহে তাওফীক)

'শান্তির আবাস, খাঁটি শরাব এবং দয়ালু সঙ্গী যদি তুমি সর্বদাই লাভ করিতে পার, তবে ইহার তওফীকই তোমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।' বুযুর্গদের গল্প ও বাণী সম্বন্ধে অপর একজন কবি বলিয়াছেন :

در یں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل ست + صراحی مے ناب و سفینۂ غزل ست

(দরীঈ যমানা রফীকে কেহ্ খালী আয খলল আস্ত
ছুরাহী মায় নাব ও ছফীনায়ে গযল আস্ত)

'আজকালকার যুগে পান-পাত্র (অর্থাৎ খোদা-প্রেম) ও গযলের দফতর (অর্থাৎ, বুযুর্গদের কাহিনী পাঠ) ত্রুটিহীন ও নির্ভেজাল সঙ্গী।'

তৎসঙ্গে এই উপদেশও দিতেছি যে, মসনভী, দেওয়ানে হাফিয অর্থাৎ কাশফ সম্বলিত এল্‌ম এবং হালবিশিষ্ট বুযুর্গদের বাণী পাঠ করা উচিত নহে। কেননা, অধিকাংশ সময় এইগুলি পাঠ করায় মানুষ ধ্বংস হয়। মাওলানা রূমী বলেন :

نکتہا چوں تیغ فولادست تیز + چوں نداری تو سپر واپس گریز
پیش ایں الماس بے سپر میا + کز بریدان تیغ را نبود حیا

(নুক্তাহা চুঁ তেগে ফাওলাদাস্ত তেয + চুঁ নাদারী তু সুপর ওয়াপেস গুরীয
পেশে ঈঁ আলমাস বেসুপর ময়া + কয বুরীদান তেগ রা নাবুয়াদ হায়া)

'গূঢ়তত্ত্বসমূহ তলোয়ারের ন্যায় ধারাল। তোমার নিকট ঢাল অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে তুমি ফিরিয়া যাও। ঢাল ব্যতীত এই তরবারির সম্মুখে আসিও না। কেননা, তলোয়ার তোমাকে কাটিয়া ফেলিতে লজ্জা করিবে না।'

সত্য হালবিশিষ্ট বুযুর্গের বাণী দ্বারাই যখন এত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা, তখন মূর্খ, শরীয়ত বিরোধী, বল্গাহীন লোকদের কথা কি পরিমাণ ক্ষতিকর হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এদের সম্বন্ধে মওলানা বলেন :

ظالم آں قومے کہ چشماں دوختند + از سخنہا عالمے را سوختند

(যালেম আঁ কওমে কেহ্ চশমাঁ দুখ্‌তান্দ + আয সখনহা আলমে রা সুখতান্দ)

'অর্থাৎ, তাহারাই যালেম যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া দুনিয়াকে কথা দ্বারা পোড়াইয়া ফেলে।'

তেমনি যাহারা না বুঝিয়াই বুযুর্গদের বাণীর উদ্ধৃতি দেয়, তাহাদের কথায় এবং লেখায়ও বিশেষ উপকার হয় না। কারণ সেগুলি আসল বাণী নহে ; আসলের বিকৃত রূপ। এদের সম্বন্ধে কবি বলেন :

حرف درویشاں بدزدد مرد دوں + تا بہ پیش جاہلاں خواند فسوں

(হরফে দরবেশাঁ বদুযদাদ মরদে দুঁ + তা বপেশে জাহেলাঁ খানাদ ফুসুঁ)

'অর্থাৎ, নীচ ব্যক্তিরা দরবেশদের উক্তি চুরি করে—যাহাতে মূর্খদের সম্মুখে কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করিতে পারে।'

হাঁ, এহ্ইয়াউল উলুম ও আরবাঈনের অনুবাদ পাঠ করিতে পার। ইন্‌শা-আল্লাহ্ ইহাতে, সর্বপ্রকার উপকার লাভ হইবে। এ পর্যন্ত আমার বক্তব্য শেষ হইল। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি তদ্‌বীর বলিয়া দিয়াছেন—যাহাতে জীবিকার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা বা ক্ষতিকর সম্মুখীন হইতে হয় না। ইহা পালন করা মুসলমানদের পক্ষে নেহায়েৎ জরুরী।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে এই তদ্‌বীরটি বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতে উল্লিখিত نسمع শব্দে "অনুসরণ" এবং نعقل শব্দে তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, জানা গেল যে, জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার পথ দুইটি। একটি অনুসরণ করা ও অপরটি সৎপথ অনুসন্ধান করিয়া চলা।

এখন দোয়া করুন—যেন খোদা তা'আলা আমাদিগকে আমল করার তৌফীক দান করেন। এই দোআও করুন, যেন এখানে একটি মাদ্রাসা হইয়া যায়, যাহাতে উহার ওছিলায় আবার এখানে আসার সুযোগ হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

—সমাপ্ত—